বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটদের পথের পাঁচালী



ছোটদের পথের পাঁচালী





বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটদের পথের পাঁচালী



এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং
প্রাইভেট লিমিটেড
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

একাদশ সংস্করণ : আশ্বিন, ১৩৯২
দ্বাদশ সংস্করণ ঃ মাঘ, ১৩৯৩

প্রকাশক
রাজীব নিয়োগী
এ· মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

দিল্লী অফিস :
৫৩৩, শেখ সারাই ফেজ-১
নিউ দিল্লী-১১০০১৭

ফটোটাইপ সেটিং
প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
৭ জওহরলাল নেহরু রোড
কলকাতা-৭০০০১৩

প্রচ্ছদের ছবি
সামনে : কিংশুক কড়োরি
পিছনে : সুকন্যা ব্যানার্জী

গ্রন্থ পরিকল্পনা
পূর্ণেন্দু পত্রী
অঙ্গসজ্জা
পূণ্যব্রত পত্রী

মুদ্রাকর
এস· আন্টুল এ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ
৯১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলকাতা-৭০০০০৯

বারো টাকা

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

'বিচিত্রা' মাসিকপত্রে ধারাবাহিক ভাবে 'পথের পাঁচালী' যখন বাহির হয় তখনই ইহা বাংলার সাহিত্যিক এবং সাহিত্য-রসিক সমাজে চমকের সৃষ্টি করিয়াছিল। পরে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর (১৬ আশ্বিন, ১৩৩৬,—মহালয়ার দিন) যখন ইহা পুস্তকাকারে বাহির হইল, তখন সেই প্রথম চমক স্থায়ী বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় রূপান্তরিত হইল। 'পথের পাঁচালী' এক সম্পূর্ণ নূতনের, অভিনবের আস্বাদ দিল। মধ্য-বাংলার ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট, অরণ্য-নদী-সমাকুল পল্লীর শান্ত পরিবেশে একটি শিশু-কবিচিত্ত রামায়ণ-মহাভারত-কাহিনী ও যাত্রাগানের মধ্য দিয়া কেমন করিয়া ধীরে ধীরে উন্মেষ লাভ করিয়া বিকশিত হইতেছে 'পথের পাঁচালী'তে সেই কাহিনী চমৎকার করিয়া বলা হইয়াছে। সেই বন্য ও গ্রাম্য বালককে বিপুল উদার পৃথিবী, নদী-সরোবর-পাহাড়-পর্বত-সাগর-মহাসাগর-শোভিত ধরাপ্রকৃতি আহ্বান ও আকর্ষণ করিতেছে এবং সে ধীরে ধীরে সেই আহ্বানে সাড়া দিতেছে ; 'পথের পাঁচালী' ও তাহার পরবর্তী অংশ 'অপরাজিত' তাহারই ইতিহাস। একটি বালক-মনকে কেন্দ্র করিয়া এমন উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে ইহার পূর্বে আর রচিত হয় নাই। লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সব মিলাইয়া প্রায় পঞ্চাশটি পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার এই সর্বপ্রথম-প্রকাশিত 'পথের পাঁচালী'ই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। 'ছোটদের পথের পাঁচালী' সেই বৃহৎ উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর, বুধবার, বেলা সাড়ে দশটায় (২৮ ভাদ্র, ১৩০১) কাঁচড়াপাড়া-হালিসহরের সন্নিকটে মুরাতিপুর গ্রামে মাতুলালয়ে বিভূতিভূষণের জন্ম হয়। পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় পৌরোহিত্য ও কথকতা করিয়া সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিতেন। তাঁহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের জন্য দূরদূরান্ত হইতে তাঁহার ডাক আসিত। বালক বিভূতিভূষণ পিতার সহিত নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া ফিরিতেন। ইহা হইতেই তাঁহার ধর্মে মতি ও ভ্রমণে আসক্তি জন্মিয়াছিল। মহানন্দের পিতামহ আদি নিবাস চব্বিশ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার পানিতর গ্রাম ত্যাগ করিয়া কবিরাজি ব্যবসায় করিবার জন্য যশোহর জেলার বনগ্রাম মহকুমার বারাকপুর গ্রামে বসবাস আরম্ভ করেন। সেই হইতে তাঁহারা বারাকপুরের অধিবাসী। বিভূতিভূষণের মাতা মৃণালিনী দেবীর পিত্রালয় ঘোষপাড়া-মুরাতিপুর। বিভূতিভূষণ পিতামাতার প্রথম সন্তান। অতিশয় দারিদ্র্য ও অনটনের মধ্যে তাঁহার শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল। সংসারের প্রতি মহানন্দের উদাসীনতা হেতু মৃণালিনীকে বহু কষ্টে ও কৌশলে সংসার চালাইতে হইত। দুমুঠা অন্ন কোনও প্রকারে জুটিত, কিন্তু পাল-পার্বণে ভালমন্দ খাবার তিনি ছেলেমেয়েদের মুখে তুলিয়া দিতে পারিতেন না। 'পথের পাঁচালী'র সর্বজয়া-চরিত্রে তাঁহার দুঃখ-বেদনার ইতিহাস আছে। তাঁহার চিরবঞ্চিত সন্তানদের সুখাদ্য-লোলুপতার কথা অপুর কাহিনীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মহানন্দের জ্ঞাতি-ভগিনী বিধবা মেনকা দেবী ভ্রাতার সংসারেই জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনিই 'পথের পাঁচালী'র ইন্দির ঠাক্রুণ।

গ্রামের পাঠশালায় পাঠ সাঙ্গ করিয়া বিভূতিভূষণ বনগ্রামে পরের আশ্রয়ে থাকিয়া বহুকষ্টে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেন (১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ) ও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরে রিপণ কলেজ হইতে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে আই-এ ও ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ পাস করিয়া শিক্ষা-জীবন শেষ করেন। এই সময়েই তিনি বিবাহ করেন। অত্যল্পকাল মধ্যেই তিনি বিপত্নীক হন।

বিভূতিভূষণের চাকুরি-জীবন অতি বিচিত্র—ইস্কুলমাস্টারি দিয়া আরম্ভ করিয়া গোরক্ষিণী সভার ভ্রাম্যমাণ

প্রচারক, ভাগলপুর জমিদারী এস্টেটে নায়েব-তহশিলদার ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মের শেষে তিনি শেষবয়সে আবার ইস্কুলমাস্টারিই করিতে থাকেন ।চাকুরি-জীবনের নানা দেশ-ভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁহার সাহিত্য-জীবনের বিবিধ উপকরণ জোগাইয়াছিল ।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর ফরিদপুরের শ্রীযোড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা রমা দেবীর সহিত তাঁহার দ্বিতীয় বিবাহ হয় । বিধবা রমা দেবী ও একটিমাত্র পুত্রসন্তান বাবলুকে রাখিয়া বিভূতিভূষণ ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর রাত্রি ৮টা ১৫ মিনিটের সময় ইহলোক ত্যাগ করেন । মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৬ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল ।

দরিদ্র ও অস্থির জীবনের মধ্যেই বিভূতিভূষণ নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সহিত সাহিত্য-সাধনা করিয়াছিলেন এবং জীবনে চরম সিদ্ধিলাভও করিয়া গিয়াছেন । হরিনাভি স্কুলের শিক্ষকতা করিবার কালে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত একটি গল্প 'উপেক্ষিতা' ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে 'প্রবাসী' পত্রিকায় (মাঘ, ১৩২৮) প্রকাশিত হয়, সেইদিন হইতে তাঁহার প্রকাশ্য সাহিত্য-জীবন আরম্ভ । মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্তও তিনি সাহিত্য-সেবা করিয়া গিয়াছেন ।

তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে কয়েকটি উপন্যাস—পথের পাঁচালী, অপরাজিত, দৃষ্টি-প্রদীপ, আরণ্যক, অনুবর্তন, দেবযান ও ইছামতী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । মেঘ-মল্লার, মৌরীফুল, জন্ম ও মৃত্যু প্রভৃতি গল্পসংগ্রহের পুস্তকও রসিকজনের প্রশংসা লাভ করিয়াছে । শিশুসাহিত্যেও তাঁহার দান সামান্য নহে ।

শ্রীসজনীকান্ত দাস





পথের পাঁচালীর স্রষ্টা বিভূতিভূষণ ও তাঁর অনুজ নুটু বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের বিবাহের পরেও বহুদিন অপুত্রক ছিলেন। সে সময়ে অনেকেই বলতেন, তোমাদের বংশের এ অবস্থা, (অর্থাৎ দু'ভাই-ই সন্তানহীন) এ কেমন হল ?

আমাদের দু'জায়ের মনও খুব ভারাক্রান্ত হত এ কথা শুনে। সত্যিই কি এরপর কেউ থাকবে না বাঁড়ুজ্জে গোষ্ঠীতে ? ঠাকুরপো নানারকম রসিকতা করত আমাদের দু'বউকে নিয়ে। বলত—এরপর তোমাদের দেখলেও কিন্তু অযাত্রা হবে বউদি।

এসব কথা বলার এখানে প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু পথের পাঁচালীর ওপর ওঁর কেমন গভীর ভালবাসা ছিল তা বলবার জন্যই এ কথাকটির অবতারণা।

আমি মাঝে মাঝে আমাদের বংশের সন্তানহীনতার কথা ওঁর কাছে ব্যক্ত করলেই উনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন—কেন, পথের পাঁচালীই তো তোমার ছেলে। সে এখন উপযুক্ত, তোমার তৈরী সন্তান। এসব কথা আমাদের পুত্র তারাদাসের জন্মের সাত বছর আগেকার ঘটনা।

সত্যি, পথের পাঁচালী আমাদের বুক জুড়ে রয়েছে। শুধুই আমার নয়, আমাদের বংশের সকলেরই। বৌমা, বাবলু, আমার দুই নাতি, আমার পরম বান্ধবী সমা, আমার জা যমুনা, আমরা সকলেই জানি আমাদের সুখে, আমাদের দুঃখে, আমাদের বিপদে, আপদে, সম্পদে, পথের পাঁচালী আমাদের সব।

মনে পড়ে, পথের পাঁচালীর স্রষ্টার কথা। এমন শান্ত, ব্রহ্মজ্ঞ, ন্যায়পরায়ণ, নির্লোভ, ত্যাগী, বিনীত, অসমসাহসী, সবই গুণান্বিত লোক আমি খুব কমই দেখেছি। তাঁর প্রকৃতিকে ভালবাসার কথা তো প্রায় প্রবাদবাক্যের মতই হয়ে গেছে।

এখানে দু'একটি ঘটনা বলি। প্রতিবারই ঘাটশীলা থেকে দেশে এসে দেখতাম, আগাছায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে ঘরদোর, উঠোন, বাগান। যথারীতি লোক লাগানো হত বন কাটানোর জন্য। আমি ও পাশের রান্নাঘর থেকে শুনতাম উনি বলছেন—ওরে ও গাছটা কাটিসনে। আরে, ওগুলো রাখ। সবই যে সাফ করে দিলি।

একটু পরেই আবার শুনি উনি হাঁ-হাঁ করে উঠছেন—আরে—আরে! সর্ব্বনাশ করিসনে! এখুনি দিয়েছিলি সেরে! ওতো সোঁদালী গাছ! ও কি কাটতে আছে? তামাকের আগুন চাইতে এসে পুরে (গ্রামের কৃষাণ) বল্ল— কি কাটব কাকীমা, কাকা শুধুই বলছেন এ কাটিসনে, ও কাটিসনে।

আমি বল্লাম—ওই অমনি, ওপর ওপর যা হয় কর। ওঁর মনে ব্যথা দিসনে—

একবার দেশে এসে দেখি, কি এক লতায় রান্নাঘরের জানালাটা ছেয়ে ফেলেছে। আমি ওঁকে বল্লাম—দেখ, লতাটা কাটিয়ে দাও। পোকা মাকড় আসতে পারে। তাছাড়া, লতাটা মনে হচ্ছে বিছুটীর। হাত চুলকুচ্ছে খুব। উনি লতাটার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বল্লেন—একটু সাবধানে কাজ করাতে পারবে না তুমি?

দেখ, কি সুন্দর লতাবিতান তৈরী হয়েছে। রাখতে পারবে না কল্যাণী?

রয়ে গিয়েছিল সেই গাছ। নদীতে স্নান করতে গিয়ে জলের ওপর নুয়ে পড়া বাবলা গাছের ডাল বেয়ে ওঠা লতাবিতানের তলায় বসে উনি ভগবানের গভীর সান্নিধ্য উপলব্ধি করতেন। নদীর ওপারের মাঠ, পুবের চরে নলখাগড়ার ঝোপে পড়ত অস্ত সূর্যের গোলাপী আলো, পড়ত সাঁই বাবলা গাছেও। সাঁই বাবলার শুভ্র কাণ্ড রঙীন হয়ে উঠত গোধূলীর আলোর আভায়।

প্রতি সন্ধ্যায় স্নানান্তে জলে দাঁড়িয়ে ওই নল খাগড়ার বন ও সাঁই-বাবলা গাছটির দিকে তাকিয়ে সন্ধ্যা-বন্দনা করতেন উনি। পৈতে জড়ান হাতে থাকত অঞ্জলিভরা জল।

এমন মুহূর্তে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তিনি যে একাত্মতা অনুভব করতেন, তাই তাঁর সাহিত্যে বিধৃত হয়ে আছে।

পথের পাঁচালী-র পথ পরিক্রমা আবার নতুন দিক পরিবর্তন করেছে। সেই নতুন পথের দুপাশের ফল, ফুল পুষ্পের শোভায় আবার সকলেই পুলকিত হবেন আশা করি।

বর্তমান সংস্করণের প্রকাশকেরা নতুন উদ্যম নিয়েছেন, আবার শুভ প্রচেষ্টায় হাত দিয়েছেন। আমি এঁদেরই একজন, আমার পরিবারের সকলেও এঁদের প্রচেষ্টার সঙ্গে একাত্ম। হৃদয়ের অকৃত্রিম শুভেচ্ছা সহ

বিনীত

রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

সচিত্র বিদ্যালয় সংস্করণের ভূমিকা

'ছোটদের পথের পাঁচালী' যে বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কিশোর গ্রন্থ, এ বিষয়ে দ্বিধার অবকাশ নেই। এ কারণে তাদের মনের মত করে তাদের জগতের ছবি দিয়ে গ্রন্থটিকে সাজাবার পরিকল্পনা করেছিলাম। আমাদের সে বাসনা পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের অগ্রসর বেশ কিছু বিদ্যালয় গ্রন্থটিকে বিদ্যালয়-উপপাঠ্য হিসাবে বরণ করে নেন। তাঁদের মতে শ্রেষ্ঠ কিশোর উপন্যাসের রসোপলব্ধি যদি শিক্ষক-শিক্ষিকার হাত ধরে হয়, তাতে ছাত্রের রসবোধের সমুন্নতি ঘটে। শিক্ষাবিদ্‌দের এই মন্তব্য আমাদের এই বিদ্যালয়-সংস্করণ তৈরী করতে অনুপ্রাণিত করেছে।

এ জন্য আমরা মূল সচিত্র সংস্করণকে অঙ্গসজ্জার দিক থেকে বিন্দুমাত্র ঊণ করি নি। বিদ্যালয় পাঠ্য বই-এ যে কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়, তা থেকে আমরা কিশোরদের মুক্ত রাখতে চাই। এজন্যই এই অ-পরিবর্ত্তন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, এই গ্রন্থে আমরা বিভূতিভূষণের নিজের ব্যবহৃত বানান রীতিই বজায় রেখেছি যেমন 'বাড়ী', 'উঠোন' ইত্যাদি। এ রীতি নিশ্চয়ই লেখকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে সাহায্য করবে।

কিন্তু বিদ্যালয় পাঠ্যগ্রন্থ হিসাবে এই গ্রন্থটির সচিত্র সংস্করণের মধ্যে একটা বড় অভাব, তাদের বোধ-পরীক্ষার সহায়ক অনুশীলনী। এজন্য আমরা গ্রন্থের শেষে নতুন পাওয়া শব্দের একটি অভিধানিকা ও প্রশ্নাবলী সংযুক্ত করলাম। এ দুটি অংশ রচনা করেছেন ডঃ নীরদবরণ হাজরা। আশা করব আমাদের এই বিদ্যালয়-সংস্করণও সমান সমাদর লাভ করবে। ইতি।

প্রকাশক

যাদের ছবিতে বইটি সাজানো

কেয়া চট্টোপাধ্যায়, রাজসী সোম, দেবব্রত দত্ত, অত্রী বর্মন, সোমা মুখোপাধ্যায়, অতনু নন্দী, অনুপা দাস, জয়তী বিশ্বাস, দীপা চট্টোপাধ্যায়, এনা বিশ্বাস, দেবমাল্য দে, দীপাঞ্জন দেব, পিনাকী মজুমদার, দোলা চক্রবর্তী, তাপস পাল, মহুয়া রায়, শৌভিক হালদার, শোভনা দাঁ, তন্ময় মান্না, অনির্বাণ বিশ্বাস, সায়নী চট্টোপাধ্যায় তন্ময় সামন্ত, সুজাতা চক্রবর্তী, সুদীপ্ত রায়, কিংশুক কড়োরি, অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়, সায়ন্তনী সেনগুপ্ত, বিপ্লব দেব, সম্পূর্ণা সাত্তার, সূর্যব্রত চট্টোপাধ্যায়, তিলক রায়চৌধুরী, ভাস্করমণি সাহা, মধুমতি বসু, সুমন সেন, দেবমালা যশ, সুলক্ষণা নন্দী, রমা তা, প্রীতম রায়, সুমা সাধুখাঁ, ভাস্কর চক্রবর্তী, লোপামুদ্রা চট্টোপাধ্যায়, পৌষালী বসু, সুচেতা মল্লিক, অমিত মণ্ডল, বাপ্পাদিত্য সিংহ, শতশ্রী রায়চৌধুরী, কল্লোল রায়, তপতী চৌধুরী, সুতপা চট্টোপাধ্যায়, সৌমিক রায়চৌধুরী, মহুয়া দে, দেবমালা মধুছন্দা দেব, সুমিত ঘোষ, কৌশিক গুহঠাকুরতা, বিশ্বজিৎ পাল, সুরজিৎ গাঙ্গুলী, কাজরী হাজরা, রূপশ্রী দত্ত, সুলক্ষণা নন্দী, অঞ্জন বিশ্বাস, মালিনী ধর এবং সর্বাণী দাস।





১

নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের একেবারে উত্তরপ্রান্তে হরিহর রায়ের ক্ষুদ্র কোঠাবাড়ী। হরিহর সাধারণ অবস্থার গৃহস্থ, পৈতৃক আমলের সামান্য জমিজমার আয় ও দু'চারি ঘর শিষ্য-সেবকের বার্ষিক প্রণামীর বন্দোবস্ত হইতে সাদাসিধাভাবে সংসার চালাইয়া থাকে।

পূর্ব দিন ছিল একাদশী। হরিহরের দূরসম্পর্কীয়া দিদি ইন্দির ঠাক্‌রুণ সকালবেলায় ঘরের দাওয়ায় বসিয়া চালভাজার গুঁড়া জলখাবার খাইতেছে। হরিহরের ছয় বছরের মেয়েটি চুপ করিয়া পাশে বসিয়া আছে ও পাত্র হইতে তুলিবার পর মুখে পুরিবার পূর্ব পর্যন্ত প্রতি মুঠা ভাজার গুঁড়ার গতি অত্যন্ত করুণভাবে লক্ষ্য করিতেছে, এবং মাঝে মাঝে ক্রমশূন্যায়মান কাঁসার জামবাটীর দিকে হতাশভাবে চাহিতেছে। দু'একবার কি বলি বলি করিয়াও যেন বলিতে পারিল না। ইন্দির ঠাক্‌রুণ মুঠার পর মুঠা উঠাইয়া পাত্র নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়া খুকীর দিকে চাহিয়া বলিল, ও মা, তোর জন্যে দুটো রেখে দেলাম না ?—ওই দ্যাখো।

মেয়েটি করুণ চোখে বলিল, তা হোক্ পিতি, তুই খা—

দুটো পাকা বড় বীচে কলার একটা হইতে আধখানা ভাঙিয়া ইন্দির ঠাক্‌রুণ তাহার হাতে দিল। এবার খুকীর চোখ মুখ উজ্জ্বল দেখাইল—সে পিসিমার হাত হইতে উপহার লইয়া মনোযোগের সহিত ধীরে ধীরে চুষিতে লাগিল।

ও-ঘর হইতে তাহার মা সর্বজয়া ডাকিল, আবার ওখানে গিয়ে ধন্না দিয়ে বসে আছে! উঠে আয় ইদিকে।

ইন্দির ঠাক্‌রুণ বলিল, থাক্ বৌ—আমার কাছে বসে আছে, ও কিছু করচে না। থাক্ বসে—

তবুও তাহার মা শাসনের সুরে বলিল, না, কেনই বা খাবার সময় ওরকম বসে থাকবে ? ওসব আমি পছন্দ করিনে, চলে আয় বল্‌চি উঠে—

খুকী ভয়ে ভয়ে উঠিয়া গেল।

ইন্দির ঠাক্‌রুণের সঙ্গে হরিহরের সম্পর্কটা বড় দূরের। মামার বাড়ীর সম্পর্কে কি রকমের বোন।

শোনা যায়, পূর্বদেশীয় এক নামজাদা কুলীনের সঙ্গে ইন্দির ঠাক্‌রুণের বিবাহ হইয়াছিল। স্বামী বিবাহের পর কালেভদ্রে এ-গ্রামে পদার্পণ করিতেন। কাজেই স্বামীকে ইন্দির ঠাক্‌রুণ ভাল মনে করিতেই পারে না। বাপমায়ের মৃত্যুর পর ভাইয়ের আশ্রয়ে সে দু'মুঠা অন্ন পাইয়া আসিতেছিল, কপালক্রমে সেই ভাইও অল্প বয়সে মারা গেল। হরিহরের পিতা রামচাঁদ অল্প পরেই এ ভিটাতে বাড়ী তুলিলেন এবং সেই সময় হইতেই ইন্দির ঠাক্‌রুণের এ সংসারে প্রথম প্রবেশ। সে-সব আজিকার কথা নহে।

তাহার পর অনেকদিন হইয়া গিয়াছে। ইন্দির ঠাক্‌রুণ এখন পঁচাত্তর বৎসরের বৃদ্ধা : গাল

তোব্‌ড়াইয়া গিয়াছে, মাজা ঈষৎ ভাঙিয়া শরীর সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, দূরের জিনিস আগের মত চোখে ঠাহর হয় না, হাত তুলিয়া যেন রৌদ্রের ঝাঁঝ হইতে বাঁচাইবার ভঙ্গিতে চোখ ঢাকিয়া বলে, কে আসে ? নবীন ? বেহারী ? না, ও তুমি রাজু···

এই ভিটারই কি কম পরিবর্তনটা ইন্দির ঠাক্‌রুণের চোখের উপর ঘটিয়া গেল ! হরিহর তো হইল সেদিন ! ঘাটের পথে লাফাইয়া লাফাইয়া খেলিয়া বেড়াইত, মুখুয্যেদের তেঁতুলগাছে ডাঁশা তেঁতুল খাইতে গিয়া পড়িয়া হাত ভাঙিয়া দুই তিন মাস শয্যাগত ছিল ! তারপর এই তো সেদিনের কথা—ধুমধাম করিয়া অল্প বয়সে তাহার বিবাহ হইল—কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর দশ বৎসরের নববিবাহিতাপত্নীকে বাপের বাড়ী ফেলিয়া রাখিয়া সে দেশছাড়া হইয়া গেল । আট দশ বছর প্রায় কোনো খোঁজখবর ছিল না—কালেভদ্রে এক-আধখানা চিঠি দিত, কখনো কখনো দু-পাঁচ টাকা বুড়ীর নামে মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইত । এই বাড়ী আগুলিয়া কত কষ্টে, কত দিন না খাইয়া, প্রতিবেশীর দুয়ারে চাহিয়া চিন্তিয়া তাহার দিন গিয়াছে ।

অনেক দিন পরে হরিহর আজ ছয় সাত বৎসর আসিয়া ঘরসংসার পাতিয়াছে, তাহার একটি মেয়ে হইয়াছে—সেও প্রায় ছয় বৎসরেরটি হইতে চলিল । বুড়ী ভাবিয়াছিল, এতদিনে সেই ছেলেবেলার ঘরসংসার আবার বজায় হইল ।

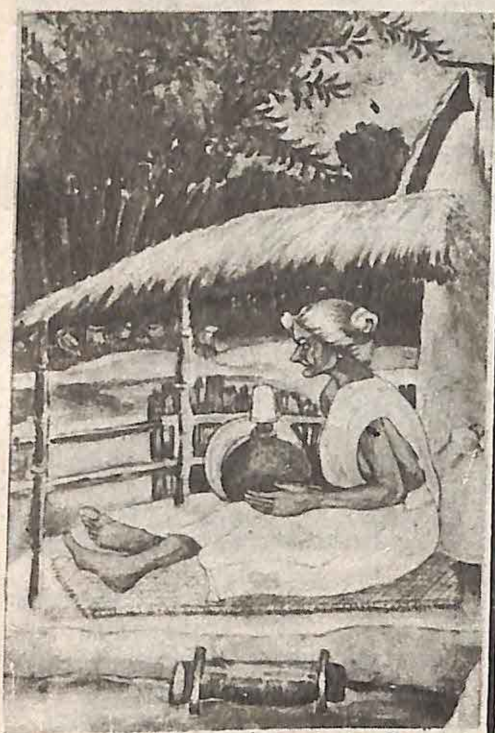
কিন্তু যাহা সে ভাবিয়াছিল তাহা হয় নাই । হরিহরের বৌ ভারী ঝগড়াটে, তাহাকে তো দুই চক্ষু পাড়িয়া দেখিতে পারে না, প্রায়ই বলে—কোথাকার কে তার ঠিকানা নাই, কি তাহার সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজিয়া মেলে না, বসিয়া বসিয়া অন্নধ্বংস করিতেছে !

সে খুঁটিনাটি লইয়া বুড়ীর সঙ্গে দুবেলা ঝগড়া বাধায় । অনেকটা ঝগড়া চলিবার পর বুড়ী নিজস্ব একটি পিতলের ঘটি কাঁখে ও ডান হাতে একটা কাপড়ের পুঁটুলি ঝুলাইয়া বলিত—চল্লাম নতুন 'বৌ, আর যদি কখনো এ বাড়ীর মাটি মাড়াই, তবে আমার···

বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়া বুড়ী মনের দুঃখে বাঁশবাগানে সারাদিন বসিয়া কাটাইত । বৈকালের দিকে সন্ধান পাইয়া হরিহরের ছোট্ট মেয়েটা তাহার কাছে গিয়া তাহার আঁচল ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিত—ওঠ্‌ পিতিমা, মাকে বল্‌বো আল্‌ তোকে বক্‌বে না, আয় প্তিতিমা । তাহার হাত ধরিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে বুড়ী বাড়ী ফিরিত । এ-রকম উহারা বাড়ী আসার বৎসর খানেকের মধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে—বহুবার হইয়া গিয়াছে এবং মাঝে মাঝে প্রায়ই হয় ।

হরিহরের পূবের ভিটায় একটা খড়ের ঘর অনেক দিন বে-মেরামতি অবস্থায় পড়িয়া আছে । এই ঘরটাতে বুড়ী থাকে । একটা বাঁশের আলনায় খান দুই ময়লা ছেঁড়া থান । ছেঁড়া জায়গাটার দু'প্রান্ত একসঙ্গে করিয়া গেরো বাঁধা । বুড়ী নিজে আজকাল ছুঁচে সূতা পরাইতে পারে না বলিয়া কাপড় সেলাই করিবার সুবিধা নাই, বেশী ছিঁড়িয়া গেলে গেরো বাঁধে । একপাশে একখানা ছেঁড়া মাদুর ও কতকগুলি ছেঁড়া কাঁথা । একটা পুঁটুলিতে রাজ্যের ছেঁড়া কাপড় বাঁধা । মনে হয় কাঁথা বুনিবার উপকরণ স্বরূপ সেগুলি বহুদিন হইতে সযত্নে সঞ্চিত আছে ; কখনও দরকার হয় নাই, বর্তমানে দরকার হইলে কাঁথা বুনিবার মত চোখের তেজ আর তাহার নাই । তবুও সেগুলি পরম যত্নে তোলা থাকে, ভাদ্র মাসে বর্ষার পর রৌদ্র ফুটিলে বুড়ী সেগুলি খুলিয়া মাঝে মাঝে উঠানে রৌদ্রে দেয় । বেতের পেঁট্‌রাটার মধ্যে একটা পুঁটুলি-বাঁধা কতকগুলো ছেঁড়া লালপাড় শাড়ী—সেগুলি তাহার বহুকাল আগে মরা মেয়ে বিশ্বেশ্বরীর । একটা পিতলের চাদরের ঘটি, একটা মাটির ছোবা, গোটা দুই মাটির ভাঁড় । পিতলের ঘটিতে চালভাজা ভরা থাকে, রাত্রে হামানদিস্তা দিয়া গুঁড়া করিয়া তাই মাঝে মাঝে খায় । মাটির ভাঁড়গুলার কোনোটাতে একটু তেল, কোনোটাতে একটু নুন, কোনোটাতে সামান্য একটু খেজুরের গুড় । সর্বজয়ার কাছে চাহিলে সব সময় মেলে না বলিয়া বুড়ী সংসার হইতে লুকাইয়া আনিয়া সেগুলি বিবাহের বেতের পেঁট্‌রার মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া দেয় ।

সর্বজয়া এ-ঘরে আসে কৃচিৎ কালেভদ্রে কখনো । কিন্তু সন্ধ্যার সময় তার মেয়ে ঘরের দাওয়ায় ছেঁড়া-কাঁথা-পাতা বিছানায় বসিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত একমনে পিসিমার মুখে রূপকথা শোনে । খানিকক্ষণ এ-গল্প ও-গল্প শুনিবার পর খুকী বলে, পিতি, সেই ডাকাতের গল্পটা বল্‌তো !··· গ্রামের একঘর গৃহস্থের



বাড়ীতে পঞ্চাশ বছর আগে ডাকাতি হইয়াছিল, সেই গল্প ইতিপূর্বে বহুবার বলা হইয়া গেলেও কয়েক দিনের ব্যবধানে উহার পুনরাবৃত্তি করিতে হয়, খুকী ছাড়ে না। তাহার পর সে পিসিমার মুখে ছড়া শোনে। সেকালের অনেক ছড়া ইন্দির ঠাক্‌রুণের মুখস্থ ছিল। অল্প বয়সে ঘাটে পথে সমবয়সী সঙ্গিনীদের কাছে ছড়া মুখস্থ বলিয়া তখনকার দিনে ইন্দির ঠাক্‌রুণ কত প্রশংসা আদায় করিয়াছে! তাহার পর অনেক দিন সে এরকম ধৈর্যশীল শ্রোতা পায় নাই, পাছে মরিচা পড়িয়া যায় এইজন্য তাহার জানা সব ছড়াগুলিই আজকাল প্রতি সন্ধ্যায় একবার করিয়া ক্ষুদ্র ভাইঝিটির কাছে আবৃত্তি করিয়া ধার শানাইয়া রাখে। টানিয়া টানিয়া আবৃত্তি করে—

ও ললিতে চাঁপকলিতে একটা কথা শুনসে:
বাধার ঘরে চোর ঢুকেছে—

এই পর্যন্ত বলিয়া সে হাসি হাসি মুখে প্রতীক্ষার দৃষ্টিতে ভাইঝির দিকে চাহিয়া থাকে। খুকী উৎসাহের সঙ্গে বলে—চূড়োবাঁধা এক মিন্‌সে—'মি' শব্দটার উপর অকারণ জোর দিয়া ছোট্ট মাথাটি সামনে তাল রাখিবার ভাবে ঝুঁকাইয়া পদটার উচ্চারণ শেষ করে। ভারী আমোদ লাগে খুকীর।

তাহার পিসি ভাইঝিকে ঠকাইবার চেষ্টায় এমন সব ছড়া আবৃত্তি করে ও পাদপূরণের জন্য ছাড়িয়া দেয়, যাহা হয়তো দশ পনেরো দিন বলা হয় নাই—কিন্তু খুকী ঠিক মনে রাখে, তাহাকে ঠকানো কঠিন।

খানিক রাত্রে তাহার মা খাইতে ডাকিলে সে উঠিয়া যায়।



২

দিন কয়েক পরে।

খুকী সন্ধ্যার পরই শুইয়া পড়িয়াছিল। বাড়ীতে তাহার পিসিমা নাই, অদ্য দুই মাসের উপর হইল একদিন কি লইয়া তাহার মায়ের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি হওয়ার পরে রাগ করিয়া দূর গ্রামে কোন এক আত্মীয়বাড়ীতে গিয়া আছে। মায়েরও শরীর এতদিন অপটু ছিল বলিয়া তাহাকে দেখিবারও কোন লোক নাই—মা কাল হইতে আঁতুড় ঘরে ঢোকা পর্যন্ত সে কখন খায়, কখন শোয়, তাহা কেহ বড় দেখে না। খুকী শুইয়া শুইয়া যতক্ষণ পর্যন্ত ঘুম না আসিল, ততক্ষণ পিসিমার জন্য কাঁদিল।

পরদিন উঠিয়া সে চোখ মুছিতেছে, কুড়ুনীর মা দাই বলিল, "ও খুকী, কাল রাত্তিরে তোমার একটা ভাই হয়েচে, দেখবে না ? ওমা, কাল রাত্তিরে এত চেঁচামেচি, এত কাণ্ড হয়ে গেল, কোথায় ছিলে তুমি ?" খুকী একদৌড়ে ছুটিয়া আঁতুড় ঘরের দুয়ারে গিয়া উঁকি মারিল। তাহার মা আঁতুড়ের খেজুর পাতার বেড়ার গা ঘেঁষিয়া শুইয়া ঘুমাইতেছে। একটি টুকটুকে অসম্ভব রকমের ছোট্ট, প্রায় একটা কাঁচের বড় পুতুলের চেয়ে কিছু বড় জীব কাঁথার মধ্যে শুইয়া—সেটিও ঘুমাইতেছে। গুলের আগুনের মন্দ মন্দ ধোঁয়ায় ভাল দেখা যায় না। সে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতেই জীবটা চোখ মেলিয়া মিটমিট করিয়া চাহিয়া অসম্ভব রকমের ছোট্ট হাতদুটি নাড়িয়া নিতান্ত দুর্বলভাবে ঈষৎ ক্ষীণ সুরে কাঁদিয়া উঠিল। হঠাৎ অসহায়, অসম্ভব রকমের ছোট্ট, নিতান্ত ক্ষুদে ভাইটির জন্য দুঃখে, মমতায়, সহানুভূতিতে খুকীর মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু নেড়ার ঠাকুরমা ও কুড়ুনীর মা দাই বারণ করাতে, সে ইচ্ছাসত্ত্বেও আঁতুড় ঘরে ঢুকিতে পারিল না।

মা আঁতুড় হইতে বাহির হইলে খোকার ছোট্ট দোলাতে দোল দিতে দিতে খুকী কত কি ছড়া গান করে। সঙ্গে সঙ্গে কত সন্ধ্যাদিনের কথা, পিসিমার কথা মনে আসিয়া তাহার চোখ জলে ভিজিয়া যায়। এই রকম কত ছড়া যে পিসিমা বলিত ! খোকা দেখিতে পাড়ার লোক ভাঙিয়া আসে। সকলে দেখিয়া বলে, ঘর-আলো-করা খোকা হয়েছে, কি মাথার চুল, কি রঙ ! বলাবলি করিতে করিতে যায়—কি, হাসি, দেখেচ ন'দি' ?

খুকী কেবল ভাবে তাহার পিসিমা একবার যদি আসিয়া দেখিত ! সবাই দেখিতেছে, আর তাহার পিসিমাই কোথায় গেল চলিয়া—আর কি কখনো ফিরিয়া আসিবে না ? সে ছেলেমানুষ হইলেও এটুকু বুঝিয়াছে যে, এ বাড়ীতে বাবা কি মা কেহই পিসিমাকে ভালবাসে না ; তাহাকে আনিবার জন্য কেহ গা করিবে না। দিনমানে পিসির ঘরের দিকে চাহিলে মন কেমন করে, ঘরের কপাটটা এক-একদিন খোলাই পড়িয়া থাকে। দাওয়ায় চামচিকার নাদি

জমিয়াছে। উঠানে সে-রকম আর ঝাঁট পড়ে না, এখানে শেওড়ার চারা ওখানে কচু গাছ—পিসিমা বুঝি হইতে দিত ? খুকীর বড় বড় চোখ জলে ভরিয়া যায়—সেই ছড়া, সেই সব গল্প খুকী কি করিয়া ভোলে ?

সেদিন হরি পালিতের মেয়ে আসিয়া তাহার মাকে বলিল, তোমাদের বুড়ী ঘাটের পথে দেখি মাঠের দিক থেকে একটা ঘটি আর পুঁটুলি হাতে করে আসছে—এসে চক্কত্তি মশায়দের বাড়ীতে ঢুকে বসে আছে, দাও দুগ্‌গাকে পাঠিয়ে দাও, হাত ধরে ডেকে আনুক, তাহলে রাগ পড়বে এখন—

হরি পালিতের বাড়ী আসিয়া বুড়ী পাড়ার মেয়েদের মুখে হরিহরের ছেলে হওয়ার গল্প শুনিতেছিল।

ও পিতি !

বুড়ী চমকিয়া চাহিয়া দেখিল দুর্গা হাঁপাইতেছে, যেন অত্যন্ত ছুটিয়া আসিয়াছে। বুড়ী ব্যগ্রভাবে দুর্গাকে হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেল,—সঙ্গে সঙ্গে দুর্গা ঝাঁপাইয়া বুড়ীর কোলে পড়িল—তাহার মুখে হাসি অথচ চোখে জল...উঠানে ঝি-বউ যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, অনেকের চোখে জল আসিল। প্রবীণা হরি পালিতের স্ত্রী বলিলেন—নেও ঠাকুরঝি, ও তোমার আর-জন্মে মেয়ে ছিল, সেই মেয়ে তোমার আবার ফিরে এসেচে—

বুড়ী আসিলে খোকাকে দেখিয়া তো বুড়ী হাসিয়া কাঁদিয়া সারা হইল। কতদিন পরে ভিটায় আবার চাঁদ উঠিয়াছে !

বুড়ী সকালে উঠিয়া মহা খুসিতে ভিতর-উঠান ঝাঁট দেয়, আগাছার জঙ্গল পরিষ্কার করে। দুর্গার মনে হয় এতদিনে আবার সংসারটা যেন ঠিকমত চলিতেছে, এতদিন যেন কেমন ঠিক ছিল না।

* * *

খোকা প্রায় দশ মাসের হইল। দেখিতে রোগা গড়ন, অসম্ভব রকমের ছোট্ট মুখখানি। নীচের মাড়িতে মাত্র দু'খানি দাঁত উঠিয়াছে। কারণে অকারণে যখন তখন সেই দু'খানি মাত্র দুধে-দাঁতওয়ালা মাড়ি বাহির করিয়া হাসে। লোকে বলে—বৌমা, তোমার খোকার হাসিটি বায়না করা। খোকাকে একটুখানি ধরাইয়া দিলে আর রক্ষা নাই, আপনা হইতে পাগলের মত এত হাসি সুরু করিবে যে তাহার মা বলে—আচ্ছা খোকন, আজ থামো, বড্ড হেসেচো, আজ বড্ড হেসেচো—আবার কালকের জন্য একটুখানি রেখে দাও। মাত্র দুইটি কথা সে বলিতে শিখিয়াছে। মনে সুখ থাকিলে মুখে বলে, জে—জে—জে—জে—, এবং দুধে-দাঁত বাহির করিয়া হাসে। মনে দুঃখ হইলে বলে, না—না—না—না—না, ও বিশ্রী রকমের চীৎকার করিয়া কাঁদিতে সুরু করে। যাহা সামনে পায়, তাহারই উপর ঐ নূতন দাঁত দু'খানির জোর পরখ করিয়া দেখে—মাটির ডেলা, এক টুকরা কাঠ, মায়ের আঁচল, দুধ খাওয়াইবার সময় এক এক সময় সে হঠাৎ কাঁসার ঝিনুকখানাকে মহা আনন্দে নূতন দাঁত দু'খানি দিয়া জোরে কামড়াইয়া ধরে। তাহার মা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলে—ওকি, হ্যাঁরে ও খোকা, ঝিনুকখানাকে কামড়ে ধরলি কেন ?—ছাড়্—ছাড়্—ওরে করিস্ কি—দু'খানা দাঁত তোর মোটে সম্বল—ভেঙে গেলে তখন হাস্‌বি কি করে শুনি ? খোকা তবুও ছাড়ে না। তাহার মা মুখের ভিতর আঙুল দিয়া অতিকষ্টে ঝিনুকখানাকে ছাড়াইয়া লয়।

খুকীর উপর সব সময় নির্ভর করিয়া থাকা যায় না বলিয়া রান্নাঘরের দাওয়া খানিকটা উঁচু করিয়া বাঁশের বাখারি দিয়া ঘিরিয়া তাহার মধ্যে খোকাকে বসাইয়া রাখিয়া তাহার মা নিজের কাজ করে। খোকা কাটরার মধ্যে শুনানি-হওয়া ফৌজদারী মামলার আসামীর মত আটক থাকিয়া কখনো আপন মনে হাসে, অদৃশ্য শ্রোতাগণের নিকট দুর্বোধ্য ভাষায় কি বকে, কখনো বাখারির বেড়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বাঁশবনের দিকে চাহিয়া থাকে। তাহার মা ঘাট হইতে স্নান করিয়া আসিলে—মায়ের ভিজা কাপড়ের শব্দ পাইতেই খোকা খেলা হইতে মুখ তুলিয়া এদিক-ওদিক চাহিতে থাকে ও মাকে দেখিতে পাইয়া এক মুখ হাসিয়া বাখারির বেড়া ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। তাহার মা বলে—একি, ওমা, এই কাজল পরিয়ে মুখ মুছিয়ে দিয়ে গেলাম, একেবারে হাঁড়িচাঁচা পাখী সেজে বসে আছো ? দেখি, এদিকে আয়। জোর করিয়া নাক মুখ রগড়াইয়া কাজল উঠাইতে গিয়া খোকার রাঙা মুখ একেবারে সিঁদুর হইয়া যায়—মহা আপত্তি করিয়া রাগের সহিত বলে, না—না—না—না—না, তাহার মা শোনে না।

ইহার পর মায়ের হাতে গামছা দেখিলেই খোকা খল্‌বল্ করিয়া হামাগুড়ি দিয়া একদিকে ছুটিয়া পালাইতে যায়। এক-একদিন ঘাট হইতে আসিয়া সর্বজয়া বলে—খোকন দোলে—খোকা অমনি বসিয়া পড়িয়া সামনে পিছনে বেজায় দুলিতে থাকে ও মনের সুখে ছোট্ট দু'টি হাত নাড়িয়া গান ধরে—

তার মা বলে—আচ্ছা থামো, আর দুলো না খোকা, হয়েচে হয়েচে, খুব হয়েচে। কখনো কখনো কাজ করিতে করিতে সর্বজয়া কান পাতিয়া শুনিত, খোকার বেড়ার ভিতর হইতে কোনো শব্দ আসিতেছে না—যেন সব চুপ হইয়া গিয়াছে ! তাহার বুক ধড়াস করিয়া উঠিত—শেয়ালে নিয়ে গেল না তো ? সে ছুটিয়া আসিয়া দেখিত খোকা সাজি-উপুড়-করা একরাশ চাঁপা ফুলের মত মাটির উপর বে-কায়দায় ছোট্ট হাতখানি রাখিয়া কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে চারিদিক হইতে লালসে পিঁপড়ে মাছি ও সুড়সুড়ি পিঁপড়ের দল মহালোভে ছুটিয়া আসিতেছে। খোকার পাতলা পাতলা রাঙা ঠোঁট দু'টা ঘুমের ঘোরে যেন একটু একটু কাঁপিতেছে, ঘুমের ঘোরে সে যেন মাঝে মাঝে ঢোক গিলিয়া জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলিতেছে—যেন জাগিয়া উঠিল ; আবার তখনই এমন ঘুমাইয়া পড়িতেছে যে নিঃশ্বাসের শব্দটিও পাওয়া যাইতেছে না।

সকাল হইতে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যা হইতে অনেক রাত্রি পর্যন্ত তাহাদের বাঁশবাগানের ধারের নির্জন বাড়ীখানি দশ মাসের শিশুর অর্থহীন আনন্দ-গীতি ও অবোধ কলহাস্যে মুখরিত থাকে।

মা ছেলেকে স্নেহ দিয়া মানুষ করিয়া তোলে, যুগে যুগে মায়ের গৌরব-গাথা তাই সকল জন-মনের বার্তায় ব্যক্ত। কিন্তু শিশু যা মাকে দেয়, তাই কি কম ? সে নিঃস্ব আসে বটে, কিন্তু তার মন-কাড়িয়া-লওয়া হাসি, শৈশব-তারল্য, চাঁদ ছানিয়া-গড়া মুখ, আধ আধ আবোল-তাবোল বকুনির দাম কে দেয় ? ওই তার ঐশ্বর্য, ওরই বদলে সে সেবা নেয়, রিক্ত হাতে ভিক্ষুকের মত নেয় না।

এক-একদিন হরিহর হয়তো বাজারের হিসাব কি নিজের লেখা লইয়া ব্যস্ত আছে—সর্বজয়া ছেলেকে লইয়া গিয়া বলে, ওগো ছেলেটাকে একটু ধরো না। মেয়েটা কোথায় বেরিয়েচে—ঠাকুরঝি গিয়েচে ঘাটে—ধর দিকি একটু।—আমি নাইবো, না, ছেলে ঘাড়ে করে বসে থাক্‌লেই হবে ? হরিহর বলে—উঁহু, ওসব গোলমাল এখন এখানে নিয়ে এসো না, বড় ব্যস্ত। সর্বজয়া রাগিয়া ছেলেকে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যায়। হরিহর হিসাবপত্র লিখিতে লিখিতে হঠাৎ দেখে ছেলে তাহার চটিজুতার পাটিটা মুখে দিয়া চিবাইতেছে। হরিহর জুতাখানা কাড়িয়া লইয়া বলে—আঃ, দ্যাখো, বাধিয়ে গেল এক কাণ্ড,—আছি একটা কাজ নিয়ে।

হঠাৎ একটা চড়ুই পাখী আসিয়া রোয়াকের ধারে বসে। খোকা বাবার মুখের দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া সেদিকে দেখাইয়া হাত নাড়িয়া বলে—জে—জে—জে——জে—

হরিহরের বিরক্তি দূর হইয়া গিয়া ভারী মমতা হয়।





৩

ও-পাড়ার দাসীঠাকরুণ আসিয়া হাসিমুখে বলিল—পয়সা দু'টোর জন্যি এসেছিলাম বৌ, ইন্দিরা পিসি কাল আমার কাছ থেকে একটা নোনা নিয়ে এল, বল্লে কাল গিয়ে দাম চেয়ে নিয়ে এস—

সর্বজয়া ঘরের কাজকর্ম করিতেছিল, অবাক হইয়া বলিল—নোনা কিনে এনেছে তোমার কাছ থেকে?

দাসীঠাকরুণ ঘোর ব্যবসাদার মানুষ—সামান্য তেঁতুল আমড়া হইতে একগাছি শাক পর্যন্ত পয়সা না লইয়া কাহাকেও দেয় না। দাসীর অমায়িক ভাব অন্তর্হিত হইয়া গেল। বলিল—এনেচে কিনা জিজ্ঞেস করো না তোমার ননদকে? সকালবেলা কি মিথ্যে বলতে এলাম দু'টো পয়সার জন্যি? চার পয়সার কমে আমি দেবো না—বললে বুড়োমানুষ খাবার ইচ্ছে হয়েচে—তা যাক্ দু' পয়সাতেই—

রাগে সর্বজয়ার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। নোনার মত ফল যাহা কিনা বনে জঙ্গলে এত অপর্যাপ্ত ফলে যে গরু বাছুরের পর্যন্ত খাইয়া অরুচি ধরিয়া যায়, তাহা আবার পয়সা দিয়া কিনিয়া খাইবার লোক যে পাড়াগাঁয়ে আছে তাহা সর্বজয়ার ধারণায় আসে না।

ঠিক এই সময় ইন্দির বুড়ী কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সর্বজয়া তাহার উপর যেন ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল—বলি হ্যাঁগা, তিনকাল গিয়ে এককালে তো ঠেকেচে, যার ঘাড়ে বসে খাও তার পয়সার তো একটু দুখ-দরদ করে চলতে হয়? নোনা গিয়েচ কিন্‌তে? কোথা থেকে তোমায় বসিয়ে আজ নোনা, কাল দানা খাওয়াবো? সখের পয়সা নিজে থেকে নিয়ে দাওগে যাও, পরের উপর দিয়ে সখ করতে লজ্জা হয় না? বুড়ীর মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, তবুও একটুখানি হাসি আনিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—তা দে বৌ—পাকা নোনাডা, তা ভাবলাম নিই খেয়ে, কডা দিনই বা বাঁচবো, তা দিয়ে দে দু'টো পয়সা—

সর্বজয়া চতুর্গুণ চীৎকার করিয়া বলিল—বড় পয়সা সস্তা দেখেচ কিনা? নিজের ঘটি বাটি আছে বিক্রী করে দিয়ে দাও গিয়ে পয়সা—পরে সে ঘড়া লইয়া খিড়কীদুয়ার দিয়া ঘাটের পথে বাহির হইয়া গেল।

দুপুরের কিছু পূর্বে ইন্দির বুড়ী বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। বাঁ হাতে ছোট একটা ময়লা কাপড়ের পুঁটুলি, ডান হাতে পিতলের চাদরের ঘটিটা ঝুলানো, বগলে একটা পুরানো মাদুর, মাদুরের পাড় ছিড়িয়া কাঠিগুলি ঝুলিতেছে।

খুকী বলিল, ও পিসি যাসনে—ও পিসি, কোথায় যাবি? পরে সে ছুটিয়া আসিয়া মাদুরের পিছনটা টানিয়া ধরিল।… তুই চলে গেলে আমি কাঁদবো পিসি—ঠিক—

সর্বজয়া ঘরের দাওয়া হইতে বলিল, তা যাবে যাও, কিন্তু গেরস্তর অকল্যাণ করে যাওয়া কেন?

ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি, এতকাল যার খেলে, তার একটা মঙ্গল তো দেখতে হয়, অনথ সময়ে না খেয়ে চলে গিয়ে তারপর গেরস্তর একটা অকল্যেণ বাধুক, এই তোমার ইচ্ছে তো ?…ঐ রকম কুচক্কুরে মন না হলে কি আর এই দশা হয়…

তবুও বুড়ী ফিরিল না। খুকী কাঁদিতে কাঁদিতে অনেক দূর পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে গেল।

একদিন বৈকালে ও-পাড়া হইতে কে আসিয়া সর্বজয়াকে বলিল—ও মা ঠাক্‌রুণ, তোমাদের বুড়ী বোধ হয় মরে যাচ্ছে, পালিতদের গোলার কাছে দুপুর থেকে শুয়ে আছে, রদ্দুরে ফিরে যাচ্ছিল, আর যেতে পারেনি—একবার গিয়ে দেখে এস। দাদাঠাকুর বাড়ী নেই ? একবার পাঠিয়ে দেও না।

পালিতদের বড় মাচার তলায় গোলার পাশে ইন্দির ঠাক্‌রুণ মরিতেছিল একথা সত্য। পালিতেরা চণ্ডীমণ্ডপে তুলিয়া রাখিয়াছিল। বুকে পিঠে তেল মালিশ, পাখার বাতাস, সব করিবার পরে বেশী বেলায় অবস্থা খারাপ বুঝিয়া নামাইয়া রাখিয়াছে। পালিত-পাড়ার অনেকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কেহ বলিতেছে—তা রোদ্দুরে বেরুলেই বা কেন ? সোজা রোদ্দুরটা পড়েছে আজ ? কেহ বলিতেছে—এখুনি সাম্‌লে উঠবে এখন, ভির্‌মি লেগেছে বোধ হয়—

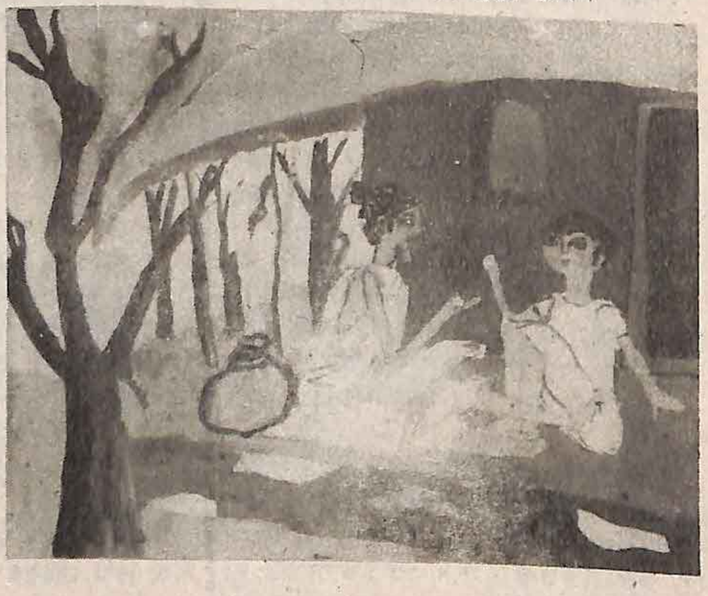
বিশু পালিত বলিল—ভির্‌মি নয়, বুড়ী আর বাঁচবে না। হরি জেঠা বোধ হয় বাড়ী নেই, খবর তো দেওয়া হয়েছে; কিন্তু এত দূর আসে কে ?

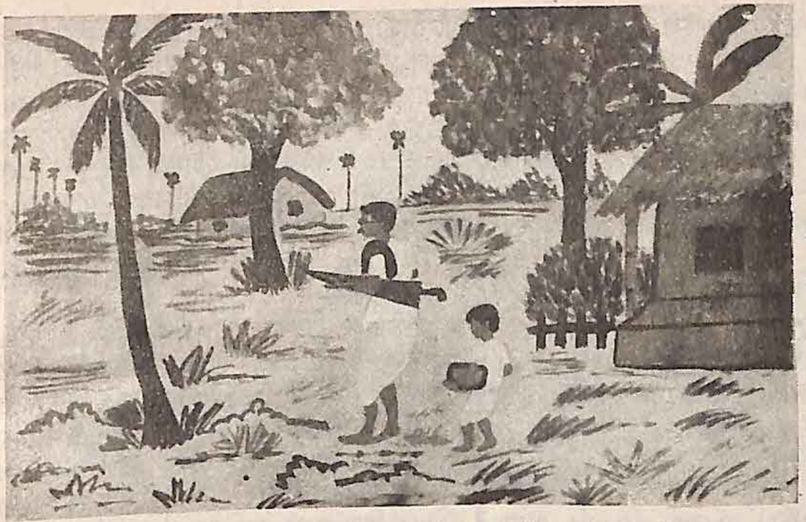
শুনিতে পাইয়া দীনু চক্রবর্তীর বড় ছেলে ফণি ব্যাপার কি দেখিতে আসিল। সকলে বলিল—দাও দাদাঠাকুর, ভাগ্যিস এসে পড়েচ, একটুখানি গঙ্গাজল মুখে দাও দিকি। দ্যাখো তো কাণ্ড—বামুনপাড়া না, কিছুই না, কে একটু মুখে জল দেয় ? ফণি হাতের বৈঁচিকাঠের লাঠিটা বিশু পালিতের হাতে দিয়া বুড়ীর মুখের কাছে বসিল। কুশী করিয়া গঙ্গাজল লইয়া ডাক দিল—ও পিসিমা !

বুড়ী চোখ মেলিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার মুখে কোনো উত্তর শুনা গেল না। ফণি আবার ডাকিল—কেমন আছেন—পিসিমা ? শরীর কি অসুস্থ মনে হচ্ছে ? পরে সে গঙ্গাজলটুকু মুখে ঢালিয়া দিল। জল কিন্তু মুখের মধ্যে গেল না, বিশু পালিত বলিল—আর একবার দাও দাদাঠাকুর—

আর খানিকক্ষণ পরে ফণি বুড়ীর চোখের পাতা বুজাইয়া দিতেই কোটরগত অনেকখানি জল শীর্ণ গাল দু'টা বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।…

ইন্দির ঠাক্‌রুণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে সেকালের অবসান হইয়া গেল।





৪

ইন্দির ঠাক্‌রুণের মৃত্যুর পর কয়েক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মাঘ মাসের শেষ, শীত বেশ আছে। দুই পাশে ঝোপে-ঝাপে ঘেরা সরু মাটির পথ বাহিয়া নিশ্চিন্দিপুরের কয়েকজন লোক সরস্বতীপূজার বৈকালে গ্রামের বাহিরের কুঠির মাঠে নীলকণ্ঠ পাখী দেখিতে যাইতেছিল।

দলের একজন বলিল, ওহে হরি, ভূষ্‌ণো গোয়ালার দরুন কলাবাগানটা তোমরা কি ফের্ জমা দিয়েচো নাকি ?

যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কথা বলা হইল তাহাকে দেখিলে দশ বৎসর পূর্ব্বের সেই হরিহর রায় বলিয়া মনে হয় না। এখন সে মধ্যবয়সী, পুরাদস্তুর সংসারী, ছেলেমেয়ের বাপ। হরিহর এখন খাজনা সাধিয়া গ্রামে গ্রামে ঘোরে, পৈতৃক আমলের শিষ্যসেবকের ঘরগুলি সন্ধান করিয়া বসিয়া গুরুগিরি চালায়, হাটে মাঠে জমির ঘরামির সঙ্গে ঝিঙ্গে পটলের দরদস্তুর করিয়া ঘোরে; তাহার সঙ্গে আগেকার সেই অবাধগতি, মুক্তপ্রাণ, ভবঘুরে যুবক হরিহরের কোন মিল নাই।

হরিহর সায়সূচক কিছু বলিতে গিয়া পিছন ফিরিয়া বলিল, ছেলেটা আবার কোথায় গেল, ও খোকা, খোকা—আ—আ—

পথের বাঁকের আড়াল হইতে একটি ছয় সাত বছরের ফুট-ফুটে সুন্দর ছিপছিপে চেহারার ছেলে ছুটিয়া আসিয়া দলের নাগাল ধরিল। হরিহর বলিল—আবার পিছিয়ে পড়লে এরি মধ্যে ? নাও এগিয়ে চলো—

ছেলেটি বলিল—বনের মধ্যে কি গেল বাবা ? বড় বড় কান ?

হরিহর প্রশ্নের দিকে কোনো মনোযোগ না দিয়া নবীন পালিতের সঙ্গে মৎস্যশিকারের পরামর্শ আঁটিতে লাগিল।

হরিহরের ছেলে পুনরায় আগ্রহের সুরে বলিল—কি দৌড়ে গেল বাবা বনের মধ্যে ? বড় বড় কান ?—

হরিহর বলিল,—কি জানি বাবা, তোমার কথার উত্তর দিতে আমি আর পারিনে। সেই বেরিয়ে অবধি সুরু করেচো এটা কি, ওটা কি,—কি গেল বনের মধ্যে তা কি আমি দেখেছি ?... নাও, এগিয়ে চলো দিকি—

বালক বাবার কথায় আগে আগে চলিল।

নবীন পালিত বলিল, বরং এক কাজ করো হরি, মাছ যদি ধরতে হয়, তবে বঁয়শার বিলে একদিন চল যাওয়া যাক্—পূবপাড়ার নেপাল পাড়ুই বাচ দিচ্চে, রোজ দেড়মণ দু'মণ এই রকম পড়চে—পাঁচ সেরের নীচে মাছ নেই। শুনলাম, একদিন শেষরাত্তিরে নাকি বিলের একেবারে মধ্যিখানে অথৈ জলে সাঁ সাঁ করে ঠিক যেন বক্‌না বাছুরের ডাক—বুঝলে ?

সকলে একসঙ্গে আগাইয়া আসিয়া নবীন পালিতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—অনেক কেলে পুরোনো বিল, গহিন্ জল, দেখেচো তো মধ্যিখানে জল যেন কালো কালি গোলা, পদ্মগাছের জঙ্গল, কেউ বলে রাঘব বোয়াল, কেউ বলে যক্ষী—যতক্ষণ ফর্সা না হোল ততক্ষণ তো মশাই নৌকোর ওপর সকলে বসে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো—

বেশ জমিয়া আসিয়াছে, হঠাৎ হরিহরের ছেলেটি মহা উৎসাহে পাশের এক উলুখড়ের ঝোপের দিকে আঙুল তুলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া গেল···ঐ যাচ্চে বাবা, দেখো বাবা, ঐ গেল বাবা, বড় কান, ঐ—

তাহার বাবা পিছন হইতে ডাক দিয়া বলিল,—উহু উহু উহু—কাঁটা কাঁটা কাঁটা—পরে তাড়াতাড়ি আসিয়া খপ্ করিয়া ছেলের হাতখানি ধরিয়া বলিল—আঃ বড্ড বিরক্ত কল্লে দেখ্‌চি তুমি, একশ'বার বারণ কচ্ছি তা তুমি কিছুতেই শুনবে না, ঐ জন্যেই তো আনতে চাচ্ছিলাম না।

বালক উৎসাহে ও আগ্রহে উজ্জ্বল মুখ উঁচু করিয়া বাবার মুখের দিকে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি বাবা? হরিহর বলিল, কি তা কি আমি দেখেচি?—শূওর-টুওর হবে—নাও চলো, ঠিক রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটো—

শূওর নয় বাবা, ছোট্ট যে!—পরে সে নীচু হইয়া দৃষ্ট বস্তুর মাটি হইতে উচ্চতা দেখাইতে গেল।

চলো চলো—হ্যাঁ আমি বুঝতে পেরেছি, আর দেখাতে হবে না চলো দিকি—

নবীন পালিত বলিল,—ও হোলো খরগোস, খোকা, খরগোস। এখানে খড়ের ঝোপে খরগোস থাকে, তাই। বালক বর্ণ-পরিচয়ে 'খ'-এ খরগোসের ছবি দেখিয়াছে, কিন্তু তাহা যে জীবন্ত অবস্থায় এ-রকম লাফাইয়া পালায় বা তাহা আবার সাধারণ চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায়, এ-কথা সে কখনো ভাবে নাই।

সকলে বনে-ঘেরা সরু পথ ছাড়াইয়া মাঠে পড়িল। মাঠের ঝোপঝাড়গুলা উলুখড়, বনকলমী, সোঁদাল ও কুলগাছে ভরা। কলমীলতা সারা ঝোপগুলার মাথা বড় বড় সবুজপাতা বিছাইয়া ঢাকিয়া দিয়াছে—ভিতরে স্নিগ্ধছায়া—ছোটগোয়ালে, নাটাকাঁটা ও নীল বন-অপরাজিতার ফুল সূর্যের আলোর দিকে মুখ উঁচু করিয়া ফুটিয়া আছে, পড়ন্ত বেলার ছায়ায় স্নিগ্ধ বনভূমির শ্যামলতা, পাখীর ডাক, চারিধারে প্রকৃতির মুক্তহাতে-ছড়ানো ঐশ্বর্য, রাজার মত ভাণ্ডার বিলাইয়া দান, কোথাও এতটুকু দরিদ্রের আশ্রয় খুঁজিবার চেষ্টা নাই, মধ্যবিত্তের কার্পণ্য নাই। বেলাশেষের ইন্দ্রজালে মাঠ, নদী, বন মায়াময়।

হরিহরের ছেলে বলিল—নীলকণ্ঠ পাখী কই বাবা?

দেখো এখন, বাবলাগাছে এখুনি এসে বস্‌বে—

বালক মুখ উঁচু করিয়া নিকটবর্তী সমুদয় বাবলাগাছের মাথার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল; মাঠের ইতস্ততঃ নীচু নীচু কুলগাছে অনেক কুল পাকিয়া আছে, বালক অবাক হইয়া লুব্ধদৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। কয়েকবার কুল পাড়িতে গিয়া বাবার বকুনিতে তাহাকে নিবৃত্ত হইতে হইল।···এত ছোট গাছে কুল হয়!···তাহাদের পাড়ায় যে কুলগাছ আছে, তাহা খুব উঁচু বলিয়া, ইচ্ছা থাকিলেও সে সুবিধা করিতে পারে না। ভারী আঁকশীটা দুই হাতে আঁকড়াইয়া ধরিয়াও তুলিতে পারে না, কুপথ্যের জিনিস লুকাইয়া খাওয়া কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে—এ সে টের পায়। খবর পাইয়া মা আসিয়া বাড়ী ধরিয়া লইয়া যায়, বলে—ওমা, আমার কি হবে! এমন দুষ্টু ছেলে হয়েচ তুমি? এই সেদিন উঠ্‌লে জ্বর থেকে, আজ অমনি কুলতলায় ঘুরে বেড়াচ্চ! একটুখানি পিছন ফিরেচি, আর অমনি এসে দেখি বাড়ী নেই! কটা কুল খেয়েছিস্? দেখি, মুখ দেখি। সে বলে, কুল খাইনি তো মা, তলায় একটাও কুল পড়ে নেই, আমি বুঝি পাড়তে পারি?

পরে সে টুকটুকে মুখটি মায়ের মুখের অত্যন্ত নিকটে লইয়া গিয়া হাঁ করে। তাহার মা ভাল করিয়া দেখিয়া পুত্রের ননীর-মত-গন্ধ-বাহির-হওয়া সুন্দর মুখে চুমা খাইয়া বলে—কখ্‌খনো খেও না যেন খোকা!·····তোমার শরীর সেরে উঠুক, আমি কুল কুড়িয়ে আচার করে হাঁড়িতে তুলে রেখে দেবো—তাই বোশেক জষ্টি মাসে খেও; লুকিয়ে কখ্‌খনো আর খেও না—কেমন তো?···

বালক অবাক হইয়া চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। তাহার ছয় বৎসরের জীবনে এই প্রথম সে বাড়ী হইতে এতদূরে আসিয়াছে। এতদিন



নেড়াদের বাড়ী, নিজেদের বাড়ীর সামনেটা, বড় জোর রাণুদিদিদের বাড়ী,—ইহাই ছিল তাহার জগতের সীমা।...ঐ মাঠের পরে ওদিকে বুঝি মায়ের মুখের সেই রূপকথার রাজ্য?—শ্যাম-লঙ্কার দেশ, বেংগমা-বেংগমীর গাছের নীচে নির্বাসিত রাজপুত্র যেখানে তলোয়ার পাশে রাখিয়া একা শুইয়া রাত কাটায়? ও-ধারে বুঝি আর মানুষের বাস নাই, জগতের শেষ সীমাটাই বুঝি এই? ইহার পর হইতেই বুঝি অসম্ভবের দেশ, অজানার দেশ সুরু হইয়াছে?...

বাড়ী ফিরিবার পথে সে পথের ধারের একটা নীচু ঝোপ হইতে একটা উজ্জ্বল রঙের ফলের থোলো ছিঁড়িতে হাত বাড়াইল। তাহার বাবা বলিল, হাঁ হাঁ, হাত দিও না—আল্‌কুশী, আল্‌কুশী। কি যে তুমি করো বাবা? বড্ড জ্বালালে দেখছি। আর কোনোদিন কোথাও নিয়ে বেরুচ্চিনে বলে দিলাম—এক্ষুনি হাত চুল্‌কে হাতে ফোস্‌কা হবে!—পথের মাঝখান দিয়ে এত করে বল্‌চি হাঁটতে—তা তুমি কিছুতেই শুনবে না—

হাত চুল্‌কুবে কেন বাবা?

হাত চুল্‌কুবে, বিষ বিষ—আল্‌কুশীতে কি হাত দেয় বাবা? শুঁয়ো ফুটে রি রি করে জ্বলবে এক্ষুনি—তখন তুমি চীৎকার সুরু করবে।

গ্রামের মধ্যে গিয়া হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া খিড়কীর দোর দিয়া বাড়ী ঢুকিল। সর্ব্বজয়া খিড়কীর দোর খোলার শব্দে বাহিরে আসিয়া বলিল—এত রাত হোল! তা ওকে নিয়ে গিয়েচ, না একটা দোলাই গায়ে, না কিছু!

হরিহর বলিল, আঃ নিয়ে গিয়ে যা বিরক্ত! এদিকে যায়, ওদিকে যায়, সামলে রাখতে পারিনে—আল্‌কুশীর ফল ধরে টানতে যায়। পরে ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল, কুঠীর মাঠ দেখবো, কুঠীর মাঠ দেখবো—কেমন হোল তো কুঠীর মাঠ দেখা?

* * *

কয়েক দিন পরে। সকাল আটটা কি ন'টা। হরিহরের পুত্র আপন মনে রোয়াকে বসিয়া খেলা করিতেছে। তাহার একটা ছোটো টিনের বাক্স আছে, সেটার ডালা ভাঙা। বাক্সের সমুদয় সম্পত্তি সে উপুড় করিয়া মেঝেতে ঢালিয়াছে,—একটা রঙ-ওঠা কাঠের ঘোড়া, চার পয়সা দামের একটা টোল-খাওয়া টিনের ভেঁপু বাঁশী, গোটাকতক কড়ি—এগুলি সে মায়ের অজ্ঞাতসারে লক্ষ্মীপূজার কড়ির চুপড়ী হইতে খুলিয়া লইয়াছিল ও পাছে কেহ টের পায় এই ভয়ে সর্বদাই লুকাইয়া রাখে—একটা দু'পয়সা দামের পিস্তল, কতকগুলো শুক্‌নো নাটা ফল—দেখিতে ভাল বলিয়া তাহার দিদি কোথা হইতে অনেকগুলি কুড়াইয়া আনিয়াছিল, কিছু তাহাকে দিয়াছে, কিছু সে

নিজের পুতুলের বাক্সে রাখিয়া দিয়াছে—খানকতক খাপরার কুচি—গঙ্গা-যমুনা খেলিতে এই খাপরাগুলির লক্ষ্য অব্যর্থ বলিয়া বিশ্বাস হওয়ায় সে এগুলি সযত্নে বাক্সে রাখিয়া দিয়াছে,—এইগুলিই তাহার মহা মূল্যবান্ সম্পত্তি। এতগুলি জিনিসের মধ্যে সবে সে টিনের বাঁশীটা কয়েকবার বাজাইয়া সেটির সম্বন্ধে বিগতকৌতূহল হইয়া তাহাকে এক পাশে রাখিয়া দিয়াছে। কাঠের ঘোড়া নাড়াচাড়া করা হইয়া গিয়াছে। সেটিও এক পাশে পিজরাপোলের আসামীর ন্যায় পড়িয়া আছে। বর্তমানে সে গঙ্গা-যমুনা খেলিবার খাপরাগুলিকে হাতে লইয়া মনে মনে দাওয়ার উপর গঙ্গা-যমুনার ঘর আঁকা কল্পনা করিয়া চোখ বুজিয়া খাপরা ছুঁড়িয়া দেখিতেছে, তাক্ ঠিক হইতেছে কিনা।

এমন সময়ে তাহার দিদি দুর্গা উঠানের কাঁঠালতলা হইতে ডাকিল, অপু—ও অপু—সে এতক্ষণ বাড়ী ছিল না, কোথা হইতে এই মাত্র আসিল। তাহার স্বর একটু সতর্কতামিশ্রিত। মানুষের গলার আওয়াজ পাইয়া অপু কলের পুতুলের মত লক্ষ্মীর চুপড়ীর কড়িগুলি তাড়াতাড়ি লুকাইয়া ফেলিল। পরে বলিল—কি রে দিদি ?

দুর্গা হাত নাড়িয়া ডাকিল—আয় এদিকে, শোন—

দুর্গার বয়স দশ এগার বৎসর হইবে। গড়ন পাত্‌লা পাত্‌লা, রঙ অপুর মত ফর্সা নয়, একটু চাপা। হাতে কাঁচের চুড়ি, পরণে ময়লা কাপড়, চুল রুক্ষ—বাতাসে উড়িতেছে, মুখের গড়ন মন্দ নয়, অপুর মত চোখগুলি বেশ ডাগর ডাগর। অপু রোয়াক হইতে নামিয়া কাছে গেল, বলিল—কি রে ?

দুর্গার হাতে একটি নারিকেলের মালা। সেটা সে নীচু করিয়া দেখাইল—কতকগুলি কচি আম কাটা। সুর নীচু করিয়া বলিল—মা ঘাট থেকে আসে নি তো ?

অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—উঁহু—

দুর্গা চুপি চুপি বলিল—একটু তেল আর একটু নুন নিয়ে আসতে পারিস্ ? আমের কুসী জরাবো—

অপু আহ্লাদের সহিত বলিয়া উঠিল—কোথায় পেলি রে দিদি ?—

দুর্গা বলিল—পট্‌লিদের বাগানে সিঁদুরকোটোর তলায় পড়ে ছিল—আন্ দিকি একটু নুন আর তেল।

অপু দিদির দিকে চাহিয়া বলিল—তেলের ভাঁড় ছুঁলে মা মার্‌বে যে ! আমার কাপড় যে বাসি !

তুই যা শিগ্‌গির করে, মা'র আসতে এখন ঢের দেরী—ক্ষার কাচ্‌তে গিয়েছে—শিগ্‌গির যা—

অপু বলিল, নারকোলের মালাটা আমায় দে। ওতে ঢেলে নিয়ে আস্‌বো—তুই খিড়কীর দোরে গিয়ে দ্যাখ্, মা আসচে কি না—

দুর্গা নিম্নস্বরে বলিল, তেল টেল যেন মেঝেতে ঢালিস্‌নে, সাবধানে নিবি, নইলে মা টের পাবে—তুই তো একটা হাবা ছেলে—

অপু বাড়ীর মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিলে দুর্গা তাহার হাত হইতে মালা লইয়া আমগুলি বেশ করিয়া মাখিল, বলিল,—নে, হাত পাত।

—তুই অতগুলো খাবি দিদি ?

অতগুলো বুঝি হোল ? এই তো—ভারি বেশী—যা, আচ্ছা নে আর দু'খানা—বাঃ দেখতে বেশ হয়েছে রে—একটা লঙ্কা আন্‌তে পারিস্ ? আর একখানা দেবো তা'হলে—

—লঙ্কা কি করে পাড়‌বো দিদি ? মা যে তক্তার ওপর রেখে দ্যায়—আমি যে নাগাল পাইনে—

তবে থাক্‌গে যাক্—আবার ওবেলা আন্‌বো এখন—পট্‌লিদের ডোবার ধারের আমগাছটায় গুটি যা ধরেছে—দুপুরের রোদে তলায় ঝরে পড়ে—

দুর্গাদের বাড়ীর চারিদিকেই জঙ্গল। হরিহর রায়ের জ্ঞাতি-ভ্রাতা নীলমণি রায় সম্প্রতি গত বৎসর মারা গিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী পুত্রকন্যা লইয়া নিজ পিত্রালয়ে বাস করিতেছেন। কাজেই পাশের এ ভিটাও জঙ্গলাবৃত হইয়া পড়িয়া আছে। নিকটে আর কোন লোকের বাড়ী নাই। পাঁচ মিনিটের পথ গেলে তবে ভুবন মুখুজ্যের বাড়ী।

হরিহরের বাড়ীটা অনেক দিন হইয়া গেল মেরামত হয় নাই, সামনের দিকের রোয়াক ভাঙা, ফাটলে বন-বিছুটির ও কালমেঘ-গাছের বন গজাইয়াছে—ঘরের দোর-জানালার কপাট সব ভাঙা, নারিকেলের দড়ি দিয়া গরাদের সঙ্গে বাঁধা আছে। খিড়কী-দোর ঝনাৎ করিয়া খুলিবার শব্দ হইল, একটু পরেই সর্বজয়ার গলা শুনা গেল—দুগ্‌গা, ও দুগ্‌গা—

দুর্গা বলিল—মা ডাক্‌চে, যা দেখে আয়—ওখানা খেয়ে যা—মুখে যে নুনের গুঁড়ো লেগে আছে, মুছে

ফ্যাল্—

মায়ের ডাক আর একবার কানে গেলেও দুর্গার এখন উত্তর দিবার সুযোগ নাই, মুখ ভর্তি। সে তাড়াতাড়ি জরানো আমের চাক্‌লাগুলি খাইতে লাগিল। পরে এখনও অনেক অবশিষ্ট আছে দেখিয়া কাঁঠালগাছটার কাছে সরিয়া গিয়া গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়াইয়া সেগুলি গোগ্রাসে গিলিতে লাগিল! অপু তাহার পাশে দাঁড়াইয়া নিজের অংশ প্রাণপণে গিলিতেছিল, কারণ চিবাইয়া খাওয়ার আর সময় নাই। খাইতে খাইতে দিদির দিকে চাহিয়া সে দোষ সম্বন্ধে সচেতনতাসূচক হাসি হাসিল। দুর্গা খালি মালাটা এক টান্ মারিয়া ভেরেণ্ডাকচার বেড়া পার করিয়া নীলমণি রায়ের ভিটার দিকে জঙ্গলের মধ্যে ছুঁড়িয়া দিল। ভাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিল—মুখটা মুছে ফ্যালো না বাঁদর—নুন লেগে রয়েচে যে—

পরে দুর্গা নিরীহমুখে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া বলিল—কি মা?

কোথায় বেরুনো হয়েছিল শুনি? একলা নিজে কতদিকে যাবো? সকাল থেকে ক্ষার কেচে গা-গতর ব্যথা হয়ে গেল, একটুখানি যদি কোনো দিক থেকে আসান আছে তোমাদের দিয়ে!—এত বড় মেয়ে, সংসারের কুটোগাছটা ভেঙে দু'খানা করা নেই, কেবল পাড়ায় পাড়ায় টো টো করে টোক্‌লা সেধে বেড়াচ্ছেন—সে বাঁদর কোথায় গেল?

একটু পরেই অপু আসিয়া বলিল, মা খিদে পেয়েচে।

রসো রসো, একটুখানি দাঁড়াও বাপু—একটুখানি হাঁপ জিরোতে দ্যাও। তোমাদের রাতদিন খিদে, আর রাতদিন ফাই-ফরমাজ। ও দুগ্‌গা, দ্যাখ্ তো বাছুরটা হাঁক পাড়চে কেন।

খানিকটা পরে সর্বজয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় বঁটি পাতিয়া শসা কাটিতে বসিল। অপু কাছে বসিয়া পড়িল, বলিল—আর এট্টু আঠা বের করো না মা, মুখে বড্ড লাগে।

দুর্গা নিজের ভাগ হাত পাতিয়া লইয়া সঙ্কুচিত সুরে বলিল—চালভাজা আর নেই মা?

অপু খাইতে খাইতে বলিল.—উঃ, চিবোনো যায় না, আম খেয়ে যা দাঁত টকে—

দুর্গার ভ্রূকুটিমিশ্রিত চোখ-টেপায় বাধা পাইয়া তাহার কথা অর্ধপথেই বন্ধ হইয়া গেল। তাহার মা জিজ্ঞাসা করিল—আম কোথায় পেলি? সত্য কথা প্রকাশ করিতে সাহসী না হইয়া অপু দিদির দিকে জিজ্ঞাসাসূচক দৃষ্টিতে চাহিল। সর্বজয়া মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিল—তুই ফের এখন বেরিয়েছিলি বুঝি?

দুর্গা বিপন্নমুখে বলিল—ওকে জিজ্ঞেস করো না? আমি—এই তো কাঁঠালতলায় দাঁড়িয়ে—তুমি যখন ডাকলে তখন তো—স্বর্ণ গোয়ালিনী গাই দুহিতে আসায় কথাটা চাপা পড়িয়া গেল। তাহার মা বলিল—যা, বাছুরটা ধর্‌গে যা—ডেকে ডেকে সারা



হোল—কমলে বাছুর, ও সন্ন, এত বেলা করে এলে কি বাঁচে ? একটু সকাল করে না এলে এই তেতপ্পর পজ্জন্ত বাছুর বাঁধা—

দিদির পিছনে পিছনে অপুও দুধ দোয়া দেখিতে গেল। সে বাহির উঠানে পা দিতেই দুর্গা তাহার পিঠে দুম করিয়া নির্ঘাত এক কিল বসাইয়া দিয়া কহিল—লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর—পরে মুখ ভ্যাঙাইয়া কহিল—আম খেয়ে দাঁত টকে গিয়েচে—আবার কোনো দিন আম দেবো। খেও—ছাই দেবো—এই ওবেলাই পটলিদের কাঁকুড়তলির আম কুড়িয়ে এনে জরাবো, এই এত বড় বড় গুটি হয়েছে, মিষ্টি যেন গুড়—দেবো তোমায় ! খেও এখন ! হাবা একটা কোথাকার—যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে !

দুপুরের কিছু পরে হরিহর কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিল। সে আজকাল গ্রামের অন্নদা রায়ের বাড়ীতে গোমস্তার কাজ করে। জিজ্ঞাসা করিল—অপুকে দেখচিনে ? সর্বজয়া বলিল—অপু তো ঘরে ঘুমুচ্ছে।

দুগ্‌গা বুঝি—

সে সেই খেয়ে বেরিয়েচে—সে বাড়ী থাকে কখন ? দু'টো খাওয়ার সঙ্গে যা সম্পর্ক ! আবার সেই খিদে পেলে তবে আসবে—কোথায় কার বাগানে, কার আমতলায় জামতলায় ঘুরচে—এই চত্তির মাসের রদ্দুর ! ফের দ্যাখো না এই জ্বরে পড়লো বলে—এত বড় মেয়ে, বলে বোঝাব কত ? কথা শোনে, না কানে নেয় ?—

একটু পরে হরিহর খাইতে বসিয়া বলিল—আজ দশঘরায় তাগাদার জন্যে গেছ্‌লাম, বুঝলে ? একজন লোক, বেশ মাতব্বর, পাঁচ ছ'টা গোলা বাড়ীতে, বেশ পয়সাওয়ালা লোক—আমায় দেখে দণ্ডবৎ করে বল্লে—দাদা ঠাকুর, আমায় চিনতে পাচ্চেন ? আমি বল্লুম—না বাপু, আমি তো কৈ—সে বল্লে—আপনার কর্তা থাকতে তখন পূজো আচ্চায় সব সময়েই তিনি আস্‌তেন, পায়ের ধূলো দিতেন। আপনারা আমাদের গুরুতুল্য লোক, এবার আমরা বাড়ীশুদ্ধ মন্তর নেবো নেবো ভাবচি—তা আপনি যদি আজ্ঞে করেন, তবে ভরসা করে বলি—আপনিই কেন মন্তরটা দেন্ না ? তা আমি তাদের বলেচি—আজ আর কোনো কথা বল্‌বো না, ঘুরে এসে দু'এক দিনে—বুঝলে ?

সর্বজয়া ডালের বাটি হাতে দাঁড়াইয়া ছিল, বাটি মেঝেতে নামাইয়া সামনে বসিয়া পড়িল। বলিল—হ্যাঁগা, তা মন্দ কি ? দাও না ওদের মন্তর ? এত কষ্ট যাচ্ছে—ঐ রায়বাড়ীর আটটা টাকা ভরসা, তাও দু'তিন মাস অন্তর তবে দ্যায়—আর এদিকে রাজ্যির দেনা। কাল ঘাটের পথে সেজ ঠাক্‌রুণ বল্লে—বৌমা, আমি বন্দক ছাড়া টাকা ধার দিই নে—তবে তুমি অনেক করে বল্লে বলে দিলাম—আজ পাঁচ পাঁচ মাস হয়ে গেল, টাকা আর রাখতে পারবো না।—এদিকে রাধা বোষ্টমের বৌ তো ছিড়ে খাচ্ছে, দু'বেলা তাগাদা আরম্ভ করেছে। ছেলেটার কাপড় নেই—দু'তিন জায়গায় সেলাই, বাছা আমার তাই পরে হাসিমুখে নেচে নেচে বেড়ায়—আমার এমন হয়েছে যে একদিকে বেরিয়ে যাই—

আর একটা কথা ওরা বল্‌ছিল, বুঝলে ? বল্‌ছিল, এ গাঁয়ে তো বামুন নেই, আপনি যদি এ গাঁয়ে উঠে আসেন, তবে জায়গা জমি দিয়ে বাস করাই—গাঁয়ে এক ঘর বামুন বাস করানো আমাদের বড্ড ইচ্ছে। তা কিছু ধানের জমি-টমি দিতেও রাজী—পয়সার তো অভাব নেই ! আজকাল চাষীদের ঘরেই লক্ষ্মী বাঁধা—ভদ্দর লোকেরই হয়ে পড়েচে হা ভাত যো ভাত—

আগ্রহে সর্বজয়ার কথা বন্ধ হইবার উপক্রম হইল।—এখ্‌খুনি। তা তুমি রাজী হলে না কেন ? বল্লেই হ'ত যে আচ্ছা আমরা আস্‌বো ! ওরকম একটা বড় মানুষের আশ্রয়—এ গাঁয়ে তোমার আছে কি ? শুধু ভিটে কামড়ে পড়ে থাকা—

হরিহর হাসিয়া বলিল—পাগল ! তখুনি কি রাজী হতে আছে ? ওতে খেলো হয়ে যেতে হয়—তা নয়, দেখি একবার চুপি চুপি মজুমদার মশায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে—আর এখন ওঠ বল্লেই কি ওঠা চলে ? সব ব্যাটা এসে বল্‌বে—টাকা দাও, নৈলে যেতে দেবো না—দেখি পরামর্শ করে কি রকম দাঁড়ায়—

এই সময়ে মেয়ে দুর্গা কোথা হইতে পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া বাহিরের দুয়ারের আড়াল হইতে সতর্কতার সহিত একবার উঁকি মারিল এবং অপর পক্ষ সম্পূর্ণ সজাগ দেখিয়া ও-ধারের পাঁচিলের পাশ বাহিয়া বাহির-বাড়ীর রোয়াকে উঠিল। [illegible]ানের দুয়ার আস্তে আস্তে ঠেলিয়া দেখিল উহা বন্ধ আছে। এদিকে রোয়াকে দাঁড়ানো অস[illegible] রৌদ্রের তাতে পা



পুড়িয়া যায়, কাজেই সে-স্থান হইতে নামিয়া গিয়া উঠানের কাঁঠালতলায় দাঁড়াইল। রৌদ্রে বেড়াইয়া তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, আঁচলের খুঁটে কি কতকগুলো যত্ন করিয়া বাঁধা! সে আসিয়াছিল এইজন্য যে, যদি বাহিরের দুয়ার খোলা পায় এবং মা ঘুমাইয়া থাকে, তবে ঘরের মধ্যে চুপি চুপি ঢুকিয়া একটু শুইয়া লইবে। কিন্তু বাবার, বিশেষতঃ মার সামনে সম্মুখদুয়ার দিয়া বাড়ী ঢুকিতে তাহার সাহস হইল না।

উঠানে নামিয়া সে কাঁঠালতলায় দাঁড়াইয়া কি করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া নিরুৎসাহভাবে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। পরে সেখানে বসিয়া পড়িয়া আঁচলের খুঁট খুলিয়া কতকগুলি শুক্‌নো রড়া ফলের বীচি বাহির করিল। খানিকক্ষণ থাকিয়া সে আপন মনে সেগুলি গুণিতে আরম্ভ করিল, এক—দুই—তিন—চার—ছাব্বিশ হইল। পরে দুই তিনটা করিয়া বীচি হাতের উল্টা পিঠে বসাইয়া উঁচু করিয়া ছুঁড়িয়া দিয়া পরে তাহা হাতের সোজা পিঠ পাতিয়া পাতিয়া ধরিতে লাগিল। মনে মনে বলিতে লাগিল—অপুকে এইগুলো দেবো—আর এইগুলো পুতুলের বাক্সে রেখে দেবো—কেমন বীচিগুলো তেল-চুক্‌চুক্ কচ্ছে—আজই গাছ থেকে পড়েচে, ভাগ্যিস্ আগে গেলাম, নৈলে সব গরুতে খেয়ে ফেলে দিত—ওদের রাঙী গাইটা একেবারে রাক্ষস, সব জায়গায় যাবে—সেবারে কতকগুলো এনেছিলাম, আর এইগুলো নিয়ে অনেকগুলো হ'ল।

সে খেলা বন্ধ করিয়া সমস্ত বীচি আবার সযত্নে আঁচলের খুঁটে বাঁধিল। পরে হঠাৎ কি ভাবিয়া রুক্ষ চুলগুলি বাতাসে উড়াইতে উড়াইতে মহা খুসির সহিত পুনরায় সোজা বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

অপুদের বাড়ী হইতে কিছু দূরে একটা খুব বড় অশ্বত্থ গাছ ছিল। কেবল তাহার মাথাটা উহাদের দালানের জানালা কি রোয়াক হইতে দেখা যায়। অপু মাঝে মাঝে সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিত। যতবার সে চাহিয়া দেখে, ততবার তাহার যেন অনেক—অনেক—অনেক—দূরের কোন দেশের কথা মনে হয়—কোন্ দেশ তাহা ঠিক ধারণা হইত না—কোথায় যেন কোথাকার দেশ—মা'র মুখে ঐ সব দেশের রাজপুত্তুরদের কথাই সে শোনে।

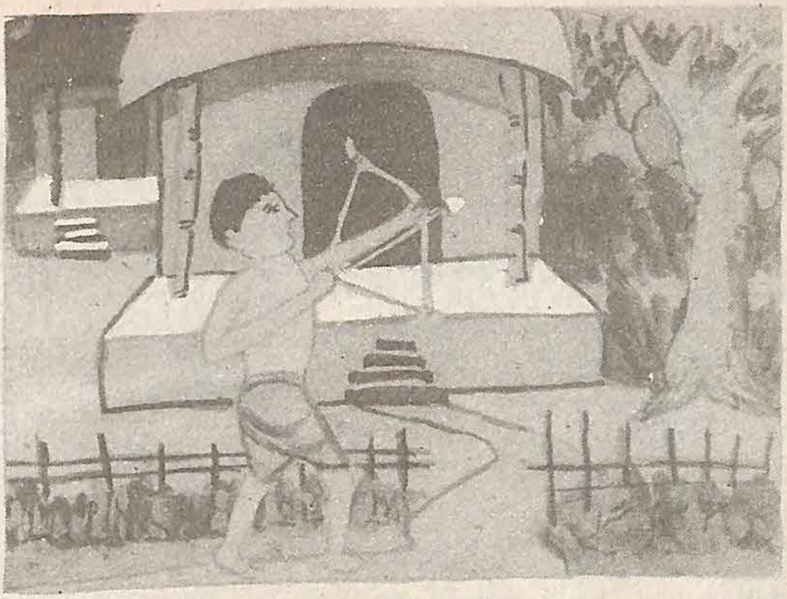
একদিন তাহাদের বাড়ীর রান্নাঘর সারিতে ঘরামি আসিল। তাহারই মধ্যে একজন মজুরের অনেক খোসামোদ করিয়া এবং গাছ হইতে লুকাইয়া পাতিনেবু ছিঁড়িয়া তাহাকে ঘুস্ দিয়া অপু একখানি ছোট ধনুক তৈয়ারী করাইল। পাঁকাটির মাথায় কঞ্চির খোল পরাইয়া সে বাণও তৈয়ারী করিয়া দিল। অপুর কাজ হইল মহা উৎসাহে দিনরাত ধনুক-বাণ ছোঁড়া!—এক এক সময়ে সে ধনুক উঁচু করিয়া আকাশের দিকে বাণ ছাড়িত—পরে সে ফুলের মত

মুখখানি উঁচু করিয়া একদৃষ্টে বাণের দিক হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত—সট্ করিয়া পাঁকাটির তীরটা মাথা সোজা করিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে ক্রমে অনেক দূরে চলিয়া যাইত—উঠানের কাঁঠালগাছটার মাথা ছাড়িয়া ঠেলিয়া উঠিত—পিছনের বাঁশঝাড়টার মাথা ছাড়াইয়া আরও অনেক—অনেক দূর উঠিত—এমন কি অপুর মনে হইত বাণটা বুঝি আর নামিয়া আসিবে না—চলিতে চলিতে নীল আকাশের গায়ে গিয়াই বিঁধিয়া যাইবে বুঝি ! শুধু বাণের পিছনের দিক্‌টা তাহার চোখে পড়িত, কিন্তু আগার দিকের কঞ্চির কোণটা আর চোখেই পড়ে না !

অপু অবাক হইয়া সেদিকে চাহিয়া থাকিত—ওঃ, বাণটা একেবারে কোথায় উঠিয়াছে ! আচ্ছা, যদি আর ফিরিয়া না আসে ! তাও কি হয় না ? চাহিয়া থাকিতে থাকিতে বাণটা যেন একটুখানি থামিয়া পরে হঠাৎ মাথা ভারী হইয়া ঘুরিয়া কঞ্চির খোলটা মাটির দিকে ফিরাইয়া সন্ সন্ করিয়া নামিয়া আসে ও ঠক্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। অপু ছুটিয়া যাইয়া বাণটাকে সযত্নে মাটি হইতে তোলে—বাণটা কোথায় উঠিয়াছিল—একেবারে ওই ওই বাঁশগাছটা ছাড়াইয়া—সেই কোথায় ! এত কাছে এবং হাতের মুঠোর মধ্যে থাকিয়াও যে জিনিসটা হঠাৎ এত উঁচুতে উঠিয়া কোথায় মিলাইয়া যাইতে পারে—যেখান দিয়া শুধু পাখীর দলের সন্ধ্যাবেলা বাসায় ফিরিবার পথ, দুপুর রোদে চিল উড়িয়া যাইবার পথ,—সেই অতদূরে, ইহা মনে হওয়ায় বাণগুলি তাহার কাছে মহা রহস্যময় হইয়া দাঁড়াইল

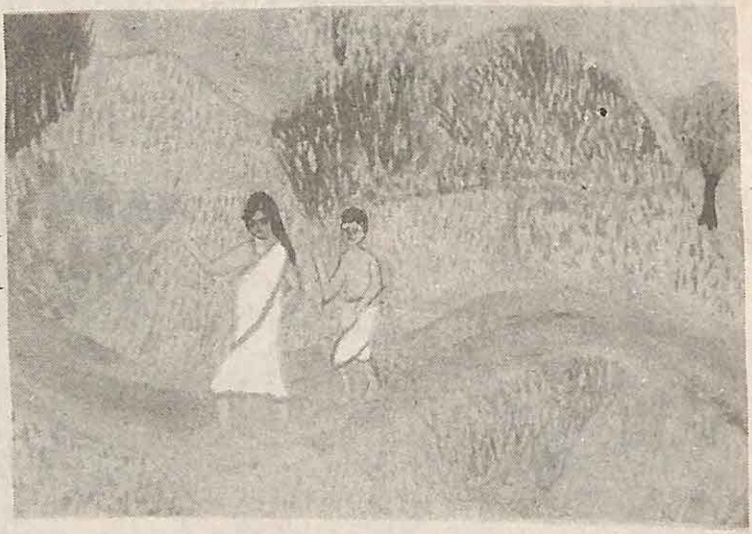
এই অনেক দূরের কথায় তাহার শিশুমনে একটা বিস্ময়-মাখানো আনন্দের ভাবের সৃষ্টি করিত। নীল রঙের আকাশটা অনেক দূর,—ঘুড়িটা—কুঠীর মাঠটা অনেক দূর—সে বুঝাইতে পারিত না, বলিতে পারিত না কাহাকেও, কিন্তু এ-সব কথায় তাহার মন যেন কোথায় উড়িয়া চলিয়া যাইত—এবং সর্বাপেক্ষা কৌতুকের বিষয় এই যে, অনেক দূরের এই কল্পনা যখন তাহার মনকে অত্যন্ত চাপিয়া তাহাকে যেন কোথায় লইয়া ফেলিয়াছে ঠিক সেই সময়েই মায়ের জন্য তাহার বড় মন কেমন করিয়া উঠিত, হঠাৎ তাহার মনে হইত যেখানে সে যাইতেছে সেখানে তাহার মা নাই, অমনি মায়ের কাছে যাইবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া পড়িত। কতবার যে এরকম হইয়াছে ! আকাশের গায়ে অনেক দূরে একটা চিল উড়িয়া যাইতেছে—ক্রমে ছোট্ট—ছোট্ট—ছোট্ট হইয়া নীলুদের তালগাছের উঁচু মাথাটা পিছনে ফেলিয়া দূর আকাশে ক্রমে মিলাইয়া যাইতেছে—চাহিয়া দেখিতে দেখিতে যেমন উড়ন্ত চিলটা দৃষ্টিপথের বাহির হইয়া যাইত, অমনি সে চোখ নামাইয়া লইয়া বাহির বাড়ী হইতে একদৌড়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠিয়া গৃহকার্যরত মাকে জড়াইয়া ধরিত। মা বলিত—দ্যাখো দ্যাখো, ছেলের কাণ্ড দ্যাখো—ছাড় ছাড়—দেখছিস্ সক্‌ড়ী হাত ?—ছাড়ো মাণিক আমার, সোনা আমার, তোমার জন্যে এই দ্যাখো চিংড়ি মাছ ভাজছি—তুমি যে চিংড়ি মাছ ভাজা ভালোবাসো ! হ্যাঁ—দুষ্টুমি করে না—ছাড়ো—

আহারাদির পর দুপুরবেলা তাহার মা কখনো কখনো জানালার ধারে আঁচল পাতিয়া শুইয়া ছেঁড়া কাশীদাসী মহাভারতখানা সুর করিয়া পড়িত। বাড়ীর ধারে নারিকেল গাছটাতে শঙ্খচিল ডাকিত, অপু নিকটে বসিয়া হাতের লেখা ক খ লিখিতে লিখিতে একমনে মায়ের মুখে মহাভারত শুনিত। জানালার বাহিরে বাঁশবনের, দুপুরের রৌদ্র-মাখানো শেওড়া ও ঘেঁটু বনের দিকে চাহিয়া চাহিয়া মহাভারতের বিশেষতঃ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা শুনিতে শুনিতে সে তন্ময় হইয়া যায়। মহাভারতের সমস্ত চরিত্রের মধ্যে কর্ণের চরিত্র বড় ভাল লাগে তাহার কাছে। ইহার কারণ কর্ণের উপর তাহার কেমন একটা মমতা হয়। রথের চাকা মাটিতে পুতিয়া গিয়াছে—কর্ণ দুই হাতে প্রাণপণে সেই চাকা মাটি হইতে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন—সেই নিরস্ত্র, অসহায়, বিপন্ন কর্ণের অনুরোধ মিনতি উপেক্ষা করিয়া অর্জুন তীর ছুঁড়িয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিলেন। মায়ের মুখে এই অংশ শুনিতে শুনিতে দুঃখে অপুর শিশুহৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিত—চোখের জল বাগ মানিত না, চোখ ছাপাইয়া তাহার নরম তুলতুলে গাল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িত—সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দুঃখে চোখের জল পড়ার যে আনন্দ, তাহা তাহার মনোরাজ্যে নব-অনুভূতির সজীবত্ব লইয়া পরিচিত হইতে লাগিল। জীবন-পথের যে দিক মানুষের চোখের জলে, দীনতায়, মৃত্যুতে, আশাহত ব্যর্থতায়, বেদনায় করুণ—পুরানো বইখানার ছেঁড়া পাতার ভরপুর গন্ধে, মায়ের মুখের মিষ্ট সুরে, রৌদ্রভরা দুপুরের



মায়া-অঙ্গুলি নির্দেশে, তাহার শিশুদৃষ্টি অস্পষ্টভাবে সে-পথের সন্ধান পাইত। বেলা পড়িলে মা গৃহকার্যে উঠিয়া গেলে, সে বাহিরে আসিয়া রোয়াকে দাঁড়াইয়া দূরের সেই অশথ্ গাছটার দিকে এক-একদিন চাহিয়া দেখে—হয়তো কড়া চৈত্র-বৈশাখের রৌদ্রে গাছটার মাথা ধোঁয়া ধোঁয়া অস্পষ্ট, নয় তো বৈকালের অবসন্ন রাঙা রোদ অলসভাবে গাছটার মাথায় জড়াইয়া আছে··· সকলের চেয়ে এই বৈকালের রাঙা-রোদ-মাখানো গাছটার দিকে চাহিয়াই তাহার মন কেমন করিত। কর্ণ যেন ঐ অশথ্ গাছটার ওপারে, আকাশের তলে অনেক দূরে কোথায় এখনও মাটি হইতে রথের চাকা দুই হাতে প্রাণপণে টানিয়া তুলিতেছেন—রোজই তোলেন—রোজই তোলেন—মহাবীর, কিন্তু চিরদিনই কৃপার পাত্র কর্ণ!···বিজয়ী বীর অর্জুন নহেন—যিনি রাজ্য পাইলেন, মান পাইলেন, রথের উপর হইতে বাণ ছুঁড়িয়া বিপন্ন শত্রুকে নাশ করিলেন; বিজয়ী কর্ণ—মানুষের চিরকালের চোখের জলে যিনি জাগিয়া রহিলেন, মানুষের বেদনার অনুভূতিতে যিনি সহচর হইয়া বিরাজ করিলেন, তিনি।

এক-একদিন মহাভারতের যুদ্ধের কাহিনী শুনিতে শুনিতে তাহার মনে হয়, যুদ্ধ জিনিসটা মহাভারতে বড় কম লেখা আছে। ইহার অভাব পূর্ণ করিবার জন্য এবং আশ মিটাইয়া যুদ্ধ জিনিসটা উপভোগ করিবার জন্য সে এক উপায় বাহির করিয়াছে। একটা বাখারি কিংবা হালকা কোনো গাছের ডালকে অস্ত্রস্বরূপ হাতে লইয়া সে বাড়ীর পিছনে বাঁশবাগানের পথে অথবা বাহিরের উঠানে ঘুরিয়া বেড়ায় ও আপন মনে বলে—তারপর দ্রোণ তো একেবারে দশ বাণ ছুঁড়লেন, অর্জুন করলেন কি, না, একেবারে দু'শোটা বাণ দিলেন মেরে! তারপর, ও সে কি যুদ্ধ! কি যুদ্ধ! বাণের চোটে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল। তারপর অর্জুন করলেন কি, না ঢাল আর তলোয়ার নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে পড়লেন—পড়ে এই যুদ্ধ!··· দুর্যোধন এলেন—ভীম এলেন—বাণে বাণে আকাশ অন্ধকার করে ফেলেচে—আর কিছু দেখা গেল না!—মহাভারতের রথিগণ মাত্র অষ্টাদশ দিবস যুদ্ধ করিয়া নাম কিনিয়া গিয়াছেন, কিন্তু রক্ত-মাংসের দেহে জীবন্ত থাকিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন যশোলাভের পথ ক্রমশঃই কিরূপ দুর্গম হইয়া পড়িতেছে। বালকের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করিতে তাঁহারা মাসের পর মাস সমানভাবে অস্ত্রচালনা করিতে পারিতেন কি?



৫

কয়েকমাস কাটিয়া গিয়াছে।

সর্বজয়া ভুবন মুখুজ্যের বাড়ির কূয়া হইতে জল তুলিয়া আনিল। পিছনে পিছনে অপু মায়ের আঁচল মুঠা পাকাইয়া ধরিয়া ও-বাড়ী হইতে আসিল। সর্বজয়া ঘড়া নামাইয়া রাখিয়া বলিল—তা তুই পেছনে পেছনে অমন করে ঘুরতে লাগলি কেন বল্ দিকি ? ঘরকন্নার কাজকর্ম সারবো তবে তো ঘাটে যাবো ?—কাজ কর্তে দিবি, না—না ? অপু বলিল—তা হোক্—কাজ তুমি ও-বেলা করো এখন মা, এখন তুমি ঘাটে যাও। পরে মায়ের সহানুভূতি আকর্ষণের আশায় অতীব করুণসুরে কহিল—আচ্ছা, আমার খিদে কি পায় না ? আজ চারদিন যে খাইনি ?

খাওনি তো করবো কি ? রোদ্দুরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে জ্বর বাধিয়ে বসবে, বল্লে কি কথা কানে নাও নাকি তোমরা ? ছিষ্টি'র কাজ করবো তবে তো ঘাটে যাবো ! বসে তো নেই ! যা, ও-রকম দুষ্টুমি করিস্ নে—তোদের ফরমাজ মত কাজ করবার সাধ্যি আমার নেই, যা—

অপু মায়ের আঁচল আরও জোর করিয়া মুঠা পাকাইয়া ধরিয়া বলিল—কক্ষনো তোমায় কাজ করতে দেবো না। রোজই তো কাজ করো, একদিন বুঝি বাদ যাবে না—এক্ষুনি ঘাটে যাও—না, আমি শুনবো না—করো দিকি, কেমন কাজ করবে ?

সর্বজয়া পুত্রের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—ওরকম দুষ্টুমি করে না, ছিঃ—এই হয়ে গ্যালো বলে, আর একটুখানি সবুর করো—ঘাটে যাবো, ছুটে এসে তোমার ভাত চড়িয়ে দোব—দুষ্টুমি করে কি ? ছাড় আঁচল, ক'খানা পল্‌তার বড়া ভাজা খাবি বল্ দিকি ?

ঘণ্টাখানেক পরে অপু মহা উৎসাহের সহিত খাইতে বসিল। গ্লাস তুলিয়া সে ঢক্ ঢক্ করিয়া অর্ধেকখানি খালি করিয়া ফেলিয়া পরে আরও দু'এক গ্রাস খাইয়া কিছু ভাত পাতের নীচে ছড়াইয়া বাকী জলটুকু শেষ করিয়া হাত তুলিয়া বসিল।

কৈ, খাচ্ছিস্ কৈ ? এতক্ষণ তো ভাত ভাত করে হাঁপাচ্ছিলি—পল্‌তার বড়া—পল্‌তার বড়া—ঐ তো সবই ফেলে রাখলি, খেলি কি তবে ?

সর্বজয়া একবাটি দুধে কিছু ভাত মাখিয়া পুত্রকে খাওয়াইতে বসিল—দেখি হাঁ কর্—তোমার কপালখানা—মণ্ডা না মেঠাই না, দুটো ভাত আর ভাত—তা ছেলের দশা দেখলে হয়ে আসে—রোজ ভাত খেতে বসে মুখ কাঁচু-মাচু—বাঁচবে কি খেয়ে ? বাঁচতে কি এসেছ ? আমায় জ্বালাতে এসেচ বৈ তো নয়—ওরকম মুখ ঘুরিও না, ছিঃ—হাঁ করো—লক্ষ্মী—দেখি এই দলাটা হলেই হয়ে গেল—আবার ওবেলা টুনুদের বাড়ী মনসার ভাসান হবে। তুই জানিস্ নে বুঝি ? শিগ্‌গির শিগ্‌গির খেয়ে নিয়ে চলো। আমরা সব—



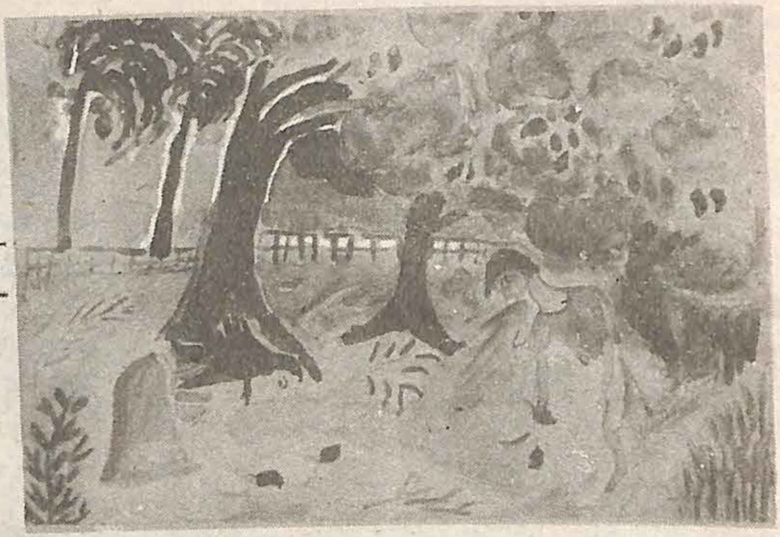
দুর্গা বাড়ী ঢুকিল! কোথা হইতে ঘুরিয়া আসিতেছে। এক পা ধূলা, কপালের সামনে এক গোছা চুল সোজা হইয়া প্রায় চার আঙুল উঁচু হইয়া আছে। সে সব-সময় আপন মনে ঘুরিতেছে—পাড়ার সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাহার বড় একটা খেলাধূলা নাই—কোথায় কোন্ ঝোপে বৈঁচি পাকিল, কাদের বাগানে কোন্ গাছটায় আমের গুটি বাঁধিয়াছে, কোন্ বাঁশতলায় শেয়াকুল খাইতে মিষ্ট—এ সব তার নখদর্পণে। পথে চলিতে চলিতে সে সর্বদা পথের দুই পাশে সতর্ক দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে চলিয়াছে—কোথাও কাঁচপোকা বসিয়া আছে কি না! যদি কোথাও কন্টিকারী গাছের পাকা ফল দেখিতে পাইল, তৎক্ষণাৎ খেলাঘরের বেগুন করিবার জন্য তা তুলিতে বসিয়া যাইবে। হয়তো পথে কোথাও বসিয়া সে নানারকমের খাপরা লইয়া ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে, গঙ্গা-যমুনা খেলায় কোন্‌খানায় ভাল তাক্ হয়—পরীক্ষায় যেখানা ভাল বলিয়া প্রমাণিত হইবে, সেখানা সে সযত্নে আঁচলে বাঁধিয়া লইবে। সবদাই সে পুতুলের বাক্স ও খেলাঘরের সরঞ্জাম লইয়া মহাব্যস্ত।

বাড়ী ঢুকিয়া সে অপরাধীর দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাহিল। সর্বজয়া বলিল—এলে? এসো, ভাত তৈরী। খেয়ে আমায় উদ্ধার করো—তারপর আবার কোন্‌দিকে বেরুতে হবে বেরোও। বোশেখ মাসের দিন, সকলের মেয়ে দ্যাখো গে যাও সেঁজুতি করচে, শিবপূজো করচে—আর অতবড় ধাড়ী মেয়ে—দিন রাত কেবল টো টো! সেই সকাল হতে না হতেই বেরিয়েচো, আর এখন এই বেলা দুপুর ঘুরে গিয়েছে, এখন এলে বাড়ী—মাথাটার ছিরি দ্যাখ না? না একটু তেল দেওয়া, না একটু চিরুণী ছোঁয়ানো—কে বল্‌বে বামুনের মেয়ে—আঁচলে এগুলো কি ধনদৌলত বাঁধা—খোল্—

দুর্গা ভয়ে ভয়ে আঁচলের খুঁট খুলিতে খুলিতে বলিল—ওই রায়কাকাদের বাড়ীর সামনে কালকাসুন্দে গাছে—পরে ঢোক্ গিলিয়া বলিল—এই অনেক বেনে-বউ, তাই—

বেনে-বউয়ের কথায় হৃদয় গলে না এমন পাষাণ জীবও জগতে অনেক আছে। সর্বজয়া তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া কহিল—তোর বেনে-বউয়ের নিকুচি করেচে! যত ছাই আর ভস্‌সো রাতদিন বেঁধে নিয়ে ঘুরচেন!—আজ টান্ মেরে তোমার পুতুলের ঐ বাক্স বাঁশতলার ডোবায় যদি না ফেলি তবে—

৬



বৈকালের দিকটা হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার করিয়া কাল-বৈশাখীর ঝড় উঠিল। অনেকক্ষণ হইতে মেঘ মেঘ করিতেছিল, তবু ঝড়টা যেন খুব শীঘ্র আসিয়া পড়িল। অপুদের বাড়ীর সামনে বাঁশঝাড়ের বাঁশগুলো পাঁচিলের উপর হইতে ঝড়ের বেগে উঠিয়া ওধারে পড়াতে বাড়ীটা যেন ফাঁকা ফাঁকা দেখাইতে লাগিল—ধূলা, বাঁশপাতা, কাঁঠালপাতা, খড়, চারিধার হইতে উড়িয়া তাহাদের উঠান ভরিয়া ফেলিল। দুর্গা বাড়ীর বাহির হইয়া আম কুড়াইবার জন্য দৌড়িল—অপুও দিদির পিছু পিছু ছুটিল—দুর্গা ছুটিতে ছুটিতে বলিল—শিগ্‌গির ছোট্—তুই বরং সিঁদুরকোটো-তলায় থাক, আমি যাই সোনামুখী-তলায়—দৌড়ো—দৌড়ো। ধূলায় চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে—বড় বড় গাছের ডাল ঝড়ে বাঁকিয়া গাছ নেড়া নেড়া দেখাইতেছে। গাছে গাছে সোঁ সোঁ, বোঁ বোঁ শব্দে বাতাস বাধিতেছে—বাগানে শুক্‌না ডাল, কুটা, বাঁশের খোলা উড়িয়া পড়িতেছে—শুক্‌না বাঁশপাতা ছুঁচালো আগাটা উঁচুদিকে তুলিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আকাশে উঠিতেছে—কুক্‌শিমা গাছের শুঁয়ার মত পালকওয়ালা সাদা সাদা ফুল ঝড়ের মুখে কোথা হইতে অজস্র উড়িয়া আসিতেছে—বাতাসের শব্দে কান পাতা যায় না।

সোনামুখী-তলায় পৌছিয়াই অপু মহা উৎসাহে চীৎকার করিতে করিতে লাফাইয়া এদিক ওদিক ছুটিতে লাগিল—এই যে দিদি, ওই একটা পড়লো রে দিদি—ঐ আর একটা রে দিদি। চীৎকার যতটা করিতে লাগিল তাহার অনুপাতে সে আম কুড়াইতে পারিল না। ঝড় ঘোর রবে বাড়িয়া চলিয়াছে। ঝড়ের শব্দে আম পড়ার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না, যদি বা শোনা যায় ঠিক কোন্ জায়গা বরাবর শব্দটা হইল—তাহা ধরিতে পারা যায় না। দুর্গা আট-নয়টা আম কুড়াইয়া ফেলিল, অপু এতক্ষণের ছুটাছুটিতে মোটে পাইল দু'টা। তাহাই সে খুসির সহিত দেখাইয়া বলিতে লাগিল—এই দ্যাখ্ দিদি, কত বড় দ্যাখ্—ঐ একটা পড়লো···ওই ওদিকে···

এমন সময়ে হৈ-হাই শব্দে ভুবন মুখুয্যের বাড়ীর ছেলেমেয়েরা সব আম কুড়াইতে আসিতেছে শোনা গেল। সতু চেঁচাইয়া বলিল—ও ভাই, দুগ্‌গাদি আর অপু আম কুড়ুচ্ছে—

দল আসিয়া সোনামুখী-তলায় পৌছিল। সতু বলিল—আমাদের বাগানে কেন এসেচ আম কুড়ুতে? সেদিন মা বারণ করে দিয়েছে না? দেখি কতগুলো আম কুড়িয়েচো? পরে দলের দিকে চাহিয়া বলিল—সোনামুখীর কতগুলো আম কুড়িয়েচে দেখেছিস্ টুনু?—যাও আমাদের বাগান থেকে দুগ্‌গাদি—মাকে গিয়ে নইলে বলে দেবো। রাণু বলিল—কেন তাড়িয়ে দিচ্ছিস্ সতু? ওরাও

কুড়ুক—আমরাও কুড়ুই।

কুড়ুবে বই কি? ও এখানে থাকলে সব আম ওই নেবে। আমাদের বাগানে কেন আসবে ও? না, যাও দুগ্‌গাদি—আমাদের আমতলায় থাকতে দেবো না।

দুর্গা একটু মনমরা ভাবে বলিল—অপু আয় রে, চল্। পরে হঠাৎ মুখে কৃত্রিম উল্লাসের ভাব আনিয়া বলিল—আমরা সেই জায়গায় যাই চল্ অপু, এখানে থাকতে না দিলে ব'য়ে গেল—বুঝলি তো?—এখানকার চেয়েও বড় বড় আম—তুই আমি মজা করে কুড়ুবো এখন—চলে আয়—এবং এখানে এতক্ষণ ছিল বলিয়া একটা বৃহত্তর লাভ হইতে বঞ্চিত ছিল, চলিয়া যাওয়ায় প্রকৃতপক্ষে শাপে বর হইল, সকলের সম্মুখে এইরূপ ভাব দেখাইয়া যেন অধিকতর উৎসাহের সহিত অপুকে পিছনে লইয়া রাংচিতার বেড়ার ফাঁক গলিয়া বাগানের বাহির হইয়া গেল। রাণু বলিল—কেন ভাই ওদের তাড়িয়ে দিলে—তুমি ভারি হিংসুক কিন্তু সতু দা'? রাণুর মনে দুর্গার চোখের ভরসাহারা চাহনি বড় ঘা দিল।

অপু অতশত বোঝে নাই, বেড়ার বাহিরের পথে আসিয়া বলিল—কোন্ জায়গায় বড় বড় আম রে দিদি, পুঁটুদের সলতেখাগী-তলায়? কোন্ তলায় দুর্গা তাহা ঠিক করে নাই, একটু ভাবিয়া বলিল—চল্ গড়ের পুকুরের ধারের বাগানে যাবি—ওদিকে সব বড় বড় গাছ আছে.—চল্। গড়ের পুকুর এখান হইতে প্রায় পনেরো মিনিট ধরিয়া সুঁড়ি পথে অনবরত বন বাগান অতিক্রম করিয়া তবে পৌছানো যায়। অনেক কালের প্রাচীন আম ও কাঁঠালের গাছ—গাছতলায় বন-চালতা, ময়না-কাঁটা, ষাঁড়া গাছের দুর্ভেদ্য জঙ্গল। দূর বলিয়া এবং জনপ্রাণীর বাসশূন্য গভীর বনের মধ্যে বলিয়া এ-সব স্থানে কেহ বড় একটা আম কুড়াইতে আসে না। কাছির মত মোটা মোটা অনেক কালের পুরানো গুলঞ্চ লতা এগাছে ওগাছে দুলিতেছে—বড় বড় প্রাচীন গাছের তলাকার কাঁটাভরা ঝোপজঙ্গল খুঁজিয়া তলায় পড়া আম বাহির করা সহজসাধ্য তো নহেই, তাহার উপর আবার ঘনায়মান নিবিড়কৃষ্ণ ঝোড়ো মেঘে ও বাগানের মধ্যের জঙ্গলে গাছের আওতায় এরূপ অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছে যে, কোথায় কি ভাল দেখা যায় না। তবুও খুঁজিতে খুঁজিতে নাছোড়বান্দা দুর্গা গোটা আট দশ আম পাইল।

হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল—ওরে অপু—বিষ্টি এল!

সঙ্গে সঙ্গে ঝড়টা যেন খানিকক্ষণ একটু নরম হইল—ভিজে মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ পাওয়া গেল—এবং একটু পরেই মোটা মোটাফোঁটায় চড়বড় করিয়া চারিদিকের গাছের পাতায় বৃষ্টি পড়িতে সুরু করিল।

—আয় আমরা এই গাছতলায় দাঁড়াই—এখানে বৃষ্টি পড়বে না—দেখিতে দেখিতে চারিদিক



ধোঁয়াকার করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি নামিল—বৃষ্টির ফোঁটা পড়িবার জোরে গাছের পাতা ছিঁড়িয়া উড়িয়া পড়িতে লাগিল—ভরপুর টাট্‌কা ভিজা মাটির গন্ধ আসিতে লাগিল ; ঝড় একটু যে নরম পড়িয়াছিল তাহাও আবার বড় বাড়িল—দুর্গা যে গাছতলায় দাঁড়াইয়া ছিল, এমনি হয়তো হঠাৎ তলায় বৃষ্টি পড়িত না, কিন্তু পূবে হাওয়ার ঝাপটা গাছতলা ভাসাইয়া লইয়া চলিল। বাড়ী হইতে তাহারা অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। অপু ভয়ের স্বরে বলিল—ও দিদি—বড্ড যে বিষ্টি এল !

তুই আমার কাছে আয়—দুর্গা তাহাকে কাছে আনিয়া আঁচল দিয়া ঢাকিয়া কহিল—এ বিষ্টি আর কতক্ষণ হবে—এই ধরে গেল বলে—বিষ্টি হোলো ভালই হোলো—আমরা আবার সোনামুখী-তলায় যাবো এখন, কেমন তো ?

দুজনে চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল—

নেবুর পাতায় করম্‌চা

হে বৃষ্টি ধ'রে যা—

কড়—কড়—কড়াৎ—প্রকাণ্ড বন-বাগানের অন্ধকার মাথাটা যেন এদিক হইতে ওদিক পর্যন্ত চিরিয়া গেল—চোখের পলকের জন্য চারিধার আলো হইয়া উঠিল—সামনের গাছের মগ্‌ডালে থোলো থোলো বনধুঁদুল ফল ঝড়ে দুলিতেছে। অপু দুর্গাকে ভয়ে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—ও দিদি !

ভয় কি রে ?—রাম রাম বল্—রাম রাম রাম রাম—নেবুর পাতায় করম্‌চা, হে বৃষ্টি ধ'রে যা—নেবুর পাতায় করম্‌চা, হে বৃষ্টি ধ'রে যা—নেবুর পাতায় করম্‌চা—

বৃষ্টির ঝাপটায় তাহাদের কাপড় চুল ভিজিয়া টস্‌টস্ করিয়া জল ঝরিতে লাগিল—গুম্-গুম্-গুম্-গু-ম-ম—চাপা গম্ভীর ধ্বনি—একটা বিশাল লোহার রুল কে যেন আকাশের ধাতব মেঝেতে এদিক হইতে ওদিকে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেছে—অপু শঙ্কিত সুরে বলিল—ঐ দিদি, আবার—

ভয় নেই, ভয় কি ?—আর একটু সরে আয়—এঃ, তোর মাথাটা ভিজে যে একেবারে জুবড়ি হয়ে গিয়চে—

চারিধারে শুধু মুষলধারে বৃষ্টিপতনের হুস্-স্-স্-স্ একটানা শব্দ, মাঝে মাঝে দমকা ঝড়ের সোঁ-ও-ও-ও, বোঁ-ও-ও-ও রব, ডালপালার ঝাপটের শব্দ, মেঘের ডাক—কানে তালা ধরিয়া যায়। এক একবার দুর্গার মনে হইতেছিল, সমস্ত বাগানখানা ঝড়ে মড় মড় করিয়া ভঙ্গিয়া উপুড় হইয়া তাহাদের চাপা দিল বুঝি !

অপু বলিল—দিদি, বিষ্টি যদি আর না থামে !

হঠাৎ ঝটিকাবিক্ষুব্ধ অন্ধকার আকাশের এ-প্রান্ত হইতে কে যেন লক্‌লকে আলোর জিহ্বা মেলিয়া বিদ্রূপের বিকট অট্টহাস্যের রোল তুলিয়া এক লহমায় ও-প্রান্তের দিকে ছুটিয়া গেল !

কড়-কড়-কড়াৎ

সঙ্গে সঙ্গে বাগানের মাথায় বৃষ্টির ধোঁয়ার রাশি চিরিয়া ফাড়িয়া উড়াইয়া, ভৈরবী প্রকৃতির উন্মত্ততার মাঝখানে ধরা পড়া দুই অসহায় বালকবালিকার চোখ ঝলসাইয়া তীক্ষ্ণ নীল বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

অপু ভয়ে চোখ বুজিল।

দুর্গা শুষ্ক গলায় উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল—বাজ পড়িতেছে না কি ?

সেই বড় লোহার রুলটাকে আকাশের ওদিক হইতে কে আবার এদিকে টানিয়া আনিতেছিল—

শীতে অপুর ঠক্ ঠক্ করিয়া দাঁতে দাঁত লাগিতেছিল—দুর্গা তাহাকে আরও কাছে টানিয়া আনিয়া শেষ আশ্রয়ের সাহসে বার বার দ্রুত আবৃত্তি করিতে লাগিল—নেবুর পাতায় করম্‌চা, হে বিষ্টি ধ'রে যা—নেবুর পাতায় করমচা, হে বিষ্টি ধ'রে যা—নেবুর পাতায় করম্‌চা—ভয়ে তাহার স্বর কাঁপিতেছিল।

সন্ধ্যা হইবার বেশী বিলম্ব নাই। ঝড় বৃষ্টি খানিকক্ষণ থামিয়া গিয়াছে। সর্বজয়া বাহিরে দরজায় দাঁড়াইয়া আছে। পথে জমিয়া যাওয়া বৃষ্টির জলের উপর ছপ্ ছপ্ শব্দ করিতে করিতে রাজকৃষ্ণ পালিতের মেয়ে আশালতা পুকুরের ঘাটে যাইতেছিল। সর্বজয়া জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ মা, দুর্গা আর অপুকে দেখেছিস ওদিকে ? আশালতা বলিল—না খুড়ীমা, দেখিনি তো। কোথায় গিয়েচে ? হাসিয়া বলিল—কি বেঙডাকানি জল হয়ে গেল খুড়ীমা !

সেই ঝড়ের আগে দু'জনে বেরিয়েচে আম কুড়োতে যাই ব'লে, আর তো ফেরেনি—এই ঝড় বিষ্টি গেল, সন্দে হ'ল, ওমা, কোথায় গেল তবে ?

সর্বজয়া উদ্বিগ্ন মনে বাড়ীর মধ্যে ফিরিয়া



আসিল। কি করিবে ভাবিতেছে এমন সময় খিড়কী-দরজা ঠেলিয়া খুলিয়া আপাদমস্তক সিক্ত অবস্থায় দুর্গা আগে আগে একটা ঝুনা নারিকেল হাতে ও পিছনে পিছনে অপু একটা নারিকেলের বাগলো টানিয়া লইয়া বাড়ী ঢুকিল। সর্বজয়া তাড়াতাড়ি ছেলেমেয়ের কাছে গিয়া বলিল—এমা, আমার কি হবে! ভিজে যে সব একেবারে পান্ত ভাত হইচিস্? কোথায় ছিলি বৃষ্টির সময়?—ছেলেকে কাছে আনিয়া মাথায় হাত দিয়া বলিল—ওমা, মাথাটা যে ভিজে একেবারে জুবড়ি! পরে আহ্লাদের সহিত বলিল—নারকোল কোথায় পেলি রে দুর্গা?

অপু ও দুর্গা দুজনেই চাপা কণ্ঠে বলিল—চুপ চুপ মা—সেজ জেঠিমা বাগানে যাচ্ছে—এই গেল—ওদের বাগানের বেড়ার ধারের দিকে যে নারকোল গাছটা, ওর তলায় পড়ে ছিল। আমরাও বেরুচ্চি, সেজ জেঠিমাও ঢুকলো—

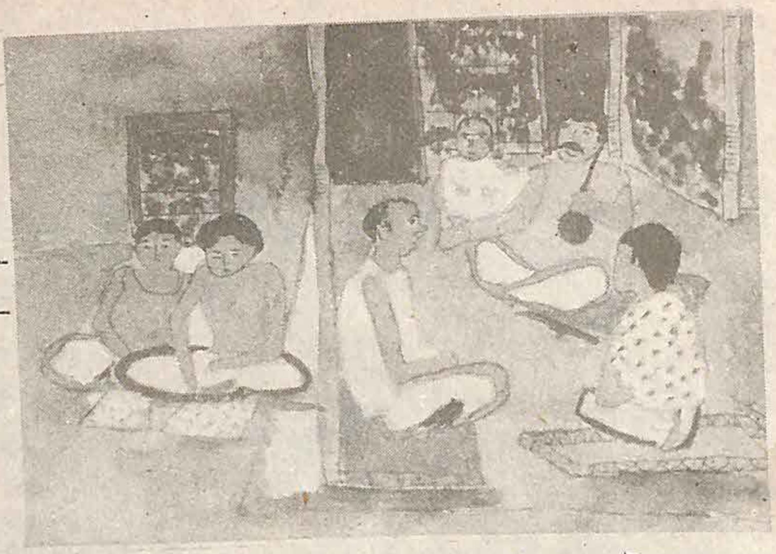
দুর্গা বলিল—অপুকে তো ঠিক দেখেচে—আমাকেও বোধ হয় দেখেচে—পরে সে উৎসাহের সঙ্গে অথচ চাপা সুরে বলিতে লাগিল—একেবারে গাছের গোড়ায় পড়ে ছিল মা, আগে আমি টের পাইনি, সোনামুখী-তলায় যদি আম পড়ে থাকে, তাই দেখতে গিয়ে দেখি বাগলোটা পড়ে রয়েচে। অপুকে বল্‌লাম—অপু বাগলোটা নে—মার ঝাঁটার কষ্ট, ঝাঁটা হবে। তারপরই দেখি—হস্তস্থিত নারিকেলটার দিকে উজ্জ্বল মুখে চাহিয়া দুর্গা বলিল—বেশ বড়, না মা?

অপু খুশির সুরে হাত নাড়িয়া বলিল—আমি অমনি বাগলোটা নিয়ে ছুট্—

সর্বজয়া বলিল—বেশ বড় দোমালা নারকোলটা। ছেঁচতলায় রেখে দে, জল দিয়ে নেবো—

অপু অনুযোগের সুরে বলিল—তুমি বলো মা নারকোল নেই, নারকোল নেই—এই তো হ'ল নারকোল। এইবার কিন্তু বড়া করে দিতে হবে। আমি ছাড়বো না—কখ্‌খনো—

বৃষ্টির জলে ছেলেমেয়েদের মুখ বৃষ্টিধোয়া জুঁই ফুলের মত সুন্দর দেখাইতেছিল; ঠাণ্ডায় তাহাদের ঠোঁট নীল হইয়া গিয়াছে, মাথার চুল ভিজিয়া কানের সঙ্গে লেপ্‌টাইয়া লাগিয়া গিয়াছে। সর্বজয়া বলিল—আয়, কাপড় ছাড়িয়ে দিই আগে পায়ে জল দিয়ে রোয়াকে ওঠ্ সব—



গ্রামের প্রসন্ন গুরুমহাশয় বাড়ীতে একখানা মুদির দোকান করিতেন এবং দোকানের পাশে তাঁহার পাঠশালা ছিল। বেত ছাড়া পাঠশালায় শিক্ষাদানের বিশেষ উপকরণ-বাহুল্য ছিল না। তবে এই বেতের উপর অভিভাবকদেরও বিশ্বাস গুরুমহাশয়ের অপেক্ষা কিছু কম নয়। তাই তাঁহারা গুরুমহাশয়কে বলিয়া দিয়াছিলেন, ছেলেদের শুধু পা খোঁড়া এবং চোখ কানা না হয়, এইটুকু মাত্র নজর রাখিয়া তিনি যত ইচ্ছা বেত চালাইতে পারেন। গুরুমহাশয়ও তাঁহার শিক্ষাদানের উপযুক্ত ক্ষমতা ও উপকরণের অভাব একমাত্র বেতের সাহায্যে পূর্ণ করিবার চেষ্টায় এরূপ বেপরোয়াভাবে বেত চালাইয়া থাকেন যে ছাত্রগণ পা খোঁড়া ও চক্ষু কানা হওয়ার দুর্ঘটনা হইতে কোনরূপে প্রাণে বাঁচিয়া যায় মাত্র।

পৌষ মাসের শেষ দিন। অপু সকালে লেপ মুড়ি দিয়া রৌদ্র উঠিবার অপেক্ষায় বিছানায় শুইয়া ছিল, মা আসিয়া ডাকিল—অপু, ওঠো শিগ্‌গির করে, আজ তুমি যে পাঠশালায় পড়তে যাবে। কেমন সব বই আনা হবে তোমার জন্যে, শেলেট্। হ্যাঁ ওঠো, মুখ ধুয়ে নাও, উনি তোমায় সঙ্গে নিয়ে পাঠশালায় দিয়ে আসবেন।

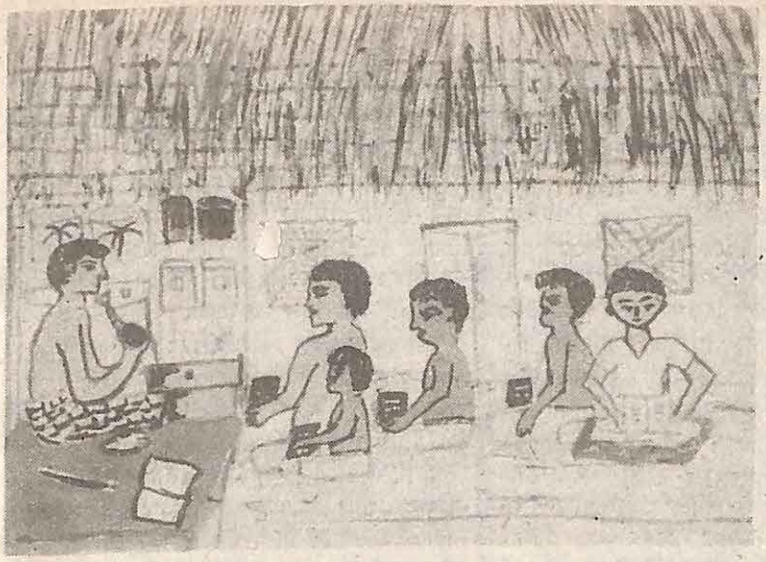
পাঠশালার নাম শুনিয়া অপু সদ্যনিদ্রোত্থিত চোখ দুটি তুলিয়া অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মা'র মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার ধারণা ছিল যে যাহারা দুষ্ট ছেলে মা'র কথা শোনে না, ভাইবোনদের সঙ্গে মারামারি করে, তাহাদেরই শুধু পাঠশালায় পাঠানো হইয়া থাকে। কিন্তু সে তো কোনদিন ওরূপ করে না, তবে সে কেন পাঠশালায় যাইবে?

খানিক পরে সর্বজয়া পুনরায় আসিয়া বলিল—ওঠো অপু, মুখ ধুয়ে নাও, তোমায় অনেক করে মুড়ি বেঁধে দেবো এখন, পাঠশালায় বসে বসে খেও এখন, ওঠো লক্ষ্মী মাণিক! মায়ের কথার উত্তরে সে অবিশ্বাসের সুরে বলিল—ইঃ! পরে সে মায়ের দিকে জিভ বাহির করিয়া চোখ বুজিয়া একপ্রকার মুখভঙ্গি করিয়া রহিল, উঠিবার কোনো লক্ষণ দেখাইল না।

কিন্তু অবশেষে বাবা আসিয়া পড়াতে অপুর বেশী জারিজুরি খাটিল না, যাইতে হইল। মা'র প্রতি অভিমানে তাহার চোখে জল আসিতেছিল, খাবার বাঁধিয়া দিবার সময় বলিল—আমি কখ্‌খনো আর বাড়ী আসচিনে দেখো।

ষাট্ ষাট্! বাড়ী আসবিনে কি! ওকথা বলতে নেই, ছিঃ—পরে তাহার চিবুকে হাত দিয়া চুমু খাইয়া বলিল—খুব বিদ্যে হোক্, ভাল করে লেখাপড়া শিখো, তখন দেখবে তুমি কত বড় চাকরী করবে, কত টাকা হবে তোমার;—কোনো ভয় নেই; ওগো, তুমি গুরুমহাশয়কে ব'লে দিও যেন ওকে কিছু না বলে।

পাঠশালায় পৌছাইয়া দিয়া হরিহর বলিল—ছুটি



হবার সময়ে আমি আবার এসে তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাবো ; এখন বসে বসে লেখো, গুরুমশায়ের কথা শুনো, দুষ্টুমি করো না যেন। খানিকটা পরে পিছন ফিরিয়া অপু চাহিয়া দেখিল বাবা ক্রমে পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল। অকূল সমুদ্র! সে অনেকক্ষণ মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। পরে ভয়ে ভয়ে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, গুরুমহাশয় দোকানের মাচায় বসিয়া দাঁড়িতে সৈন্ধব লবণ ওজন করিয়া কাহাকে দিতেছেন, কয়েকটি বড় বড় ছেলে আপন আপন চাটাইয়ে বসিয়া নানারূপ কুস্বর করিয়া কি পড়িতেছে ও ভয়ানক দুলিতেছে। তাহার অপেক্ষা আর একটু ছোট একটি ছেলে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া আপন মনে পাততাড়ির তালপাতা মুখে পুরিয়া চিবাইতেছে। আর একটি বড় ছেলে, তাহার গালে একটা বড় আঁচিল, সে দোকানের মাচার নীচে চাহিয়া কি লক্ষ্য করিতেছে। তাহার সামনে দু'জন ছেলে বসিয়া শ্লেটে একটা ঘর আঁকিয়া কি করিতেছিল। একজন চুপিচুপি বলিতেছিল, আমি এই ঢ্যারা দিলাম ; অন্য ছেলেটি বলিতেছিল, এই আমার গোল্লা ; সঙ্গে সঙ্গে তার শ্লেটে আঁক পড়িতেছিল ও মাঝে মাঝে তাহারা আড়চোখে বিক্রয়রত গুরুমহাশয়ের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। অপু নিজের শ্লেটে বড় বড় করিয়া বানান লিখিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে ঠিক জানা যায় না, গুরুমহাশয় হঠাৎ বলিলেন, এই ফণে, শ্লেটে ওসব কি হচ্ছে রে ? সম্মুখের এই ছেলে দু'টি অমনি শ্লেটখানা চাপা দিয়া ফেলিল, কিন্তু গুরুমহাশয়ের শ্যেনদৃষ্টি এড়ানো বড় শক্ত ; তিনি বলিলেন, এই সতে, ফণের শ্লেটটা নিয়ে আয় তো। তাঁহার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে বড় আঁচিলওয়ালা ছেলেটা ছোঁ মারিয়া শ্লেটখানা উঠাইয়া লইয়া গিয়া দোকানের মাচার উপরে হাজির করিল।

—হুঁ, এসব কি খেলা হচ্ছে শ্লেটে ?—সতে, ধরে নিয়ে আয় তো দু'জনকে। কান ধরে নিয়ে আয়।

যেভাবে বড় ছেলেটা ছোঁ মারিয়া শ্লেট লইয়া গেল, এবং যেভাবে বিষণ্ণমুখে সামনের ছেলে দু'টি পায়ে পায়ে গুরুমহাশয়ের কাছে যাইতেছিল, তাহাতে হঠাৎ অপুর বড় হাসি পাইল, সে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। পরে খানিকটা হাসি চাপিয়া রাখিয়া আবার ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

গুরুমহাশয় বলিলেন, হাসে কে ? হাস্‌চো কেন খোকা, এটা কি নাট্যশালা ? এ্যা ? এটা নাট্যশালা নাকি ?

নাট্যশালা কি—অপু তাহা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল।

—সতে, একখানা থান ইঁট নিয়ে এসো তো তেঁতুলতলা থেকে, বেশ বড় দেখে।

অপু ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া রহিল, তাহার গলা পর্যন্ত কাঠ হইয়া গেল, কিন্তু ইঁট আনীত হইলে সে দেখিল,

ইটের ব্যবস্থা তাহার জন্য নহে, ঐ ছেলে দু'টির জন্য। বয়স অল্প বলিয়া হউক বা নতুন ভর্তি ছাত্র বলিয়াই হউক, গুরুমহাশয় সে যাত্রা তাহাকে রেহাই দিলেন।

পাঠশালা সাধারণতঃ বসিত বৈকালে। সবশুদ্ধ আটদশটি ছেলেমেয়ে পড়িতে আসে। সকলেই বাড়ী হইতে ছোট ছোট মাদুর আনিয়া পাতিয়া বসে; অপুর মাদুর নাই, সে বাড়ী হইতে একখানা জীর্ণ কার্পেটের আসন আনে। যে-ঘরটায় পাঠশালা হয়, তার কোন দিকে বেড়া বা দেওয়াল কিছু নাই, চারিধার খোলা, ঘরের মধ্যে সারি দিয়া ছাত্রগণ বসে। পাঠশালাঘরের চারিপাশে বন, পিছন দিকে গুরুমহাশয়ের পৈতৃক আমলের বাগান। অপরাহ্নের তাজা, গরম রৌদ্র বাতাবি লেবু, গাব ও পেয়ারাফুলী আমগাছটার ফাঁক দিয়া পাঠশালাঘরের বাঁশের খুঁটির পায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। নিকটে অন্য কোনো দিকে কোনো বাড়ী নাই, শুধু বন ও বাগান, একধারে একটা সরু পথ।

আটদশটি ছেলেমেয়ের মধ্যে সকলেই বেজায় দুলিয়া ও নানারূপ সুর করিয়া পড়া মুখস্থ করে; মাঝে মাঝে গুরুমহাশয়ের গলা শোনা যায়—এই ক্যাব্‌লা, ওর শেলেটের দিকে চেয়ে কি দেখ্‌ছিস? কান মলে দেবো একেবারে! নুটু, তোমার কবার নেতি ভিজুতে হবে? ফের্ যদি দেখি নেতি ভিজুতে উঠেচে—

গুরুমহাশয় একটা খুঁটি হেলান দিয়া একখানা তালপাতার চাটাই-এর উপর বসিয়া থাকেন। মাথার তেলে বাঁশের খুঁটির হেলান দেওয়া অংশটা পাকিয়া গিয়াছে। বিকাল বেলা প্রায়ই গ্রামের দীনু পালিত কি রাজু রায় তাঁহার সহিত গল্প করিতে আসেন। পড়াশুনার চেয়ে এই গল্প শোনা অপুর অনেক বেশী ভাল লাগিত। রাজু রায় প্রথম যৌবনে বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস স্মরণ করিয়া কি করিয়া আষাড়ুর হাটে তামাকের দোকান খুলিয়াছিলেন সে গল্প করিতেন। অপু অবাক হইয়া শুনিত।—বেশ কেমন নিজের ছোট্ট দোকানের ঝাঁপটা তুলিয়া বসিয়া তামাক কাটা, তারপর রাত্রে নদীতে যাওয়া, ছোট্ট হাঁড়িতে মাছের ঝোল ভাত রাঁধিয়া খাওয়া, মাঝে মাঝে তাদের সেই ছেঁড়া মহাভারতখানা কি বাবার সেই দাশুরায়ের পাঁচালীখানা মাটির প্রদীপের সামনে খুলিয়া বসিয়া পড়া! বাহিরে অন্ধকার বর্ষারাতে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়িতেছে, কেহ কোথাও নাই, পিছনের ডোবায় ব্যাঙ ডাকিতেছে—কি সুন্দর!... বড় হইলে সে তামাকের দোকান করিবে।

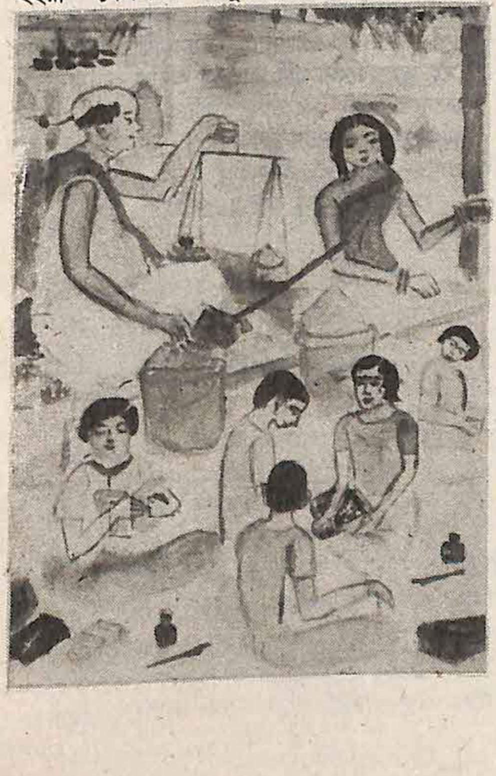
এই গল্পগুজব আবার ভাব ও কল্পনার সর্বোচ্চ স্তরে উঠিত, যে-দিন গ্রামের ও-পাড়ার রাজকৃষ্ণ সান্ন্যাল মহাশয় আসিতেন। যে কোনো গল্প হউক, যত সামান্যই হউক না কেন, সেটি সাজাইয়া বলিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল অসাধারণ। সান্ন্যাল মহাশয় দেশভ্রমণবাতিকগ্রস্ত ছিলেন। কোথায় দ্বারকা, কোথায় সাবিত্রী পাহাড়, কোথায় চন্দ্রনাথ!... তাহা আবার একা দেখিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইত না, প্রতিবারই স্ত্রীপুত্র লইয়া যাইতেন এবং খরচপত্র করিয়া সর্বস্বান্ত হইয়া ফিরিতেন।...দিব্য আরামে নিজের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া থেলো হুঁকা টানিতেছেন, মনে হইতেছে সান্ন্যাল মহাশয়ের মতন নিতান্ত ঘরোয়া, সেকেলে, পাড়াগাঁয়ের প্রচুর অবসরপ্রাপ্ত গৃহস্থ বেশী আর বুঝি নাই, পৈতৃক চণ্ডীমণ্ডপে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছেন। হঠাৎ একদিন দেখা গেল সদর দরজায় তালা বন্ধ, বাড়ীতে জনপ্রাণীর সাড়া নাই। ব্যাপার কি? না, সান্ন্যাল মশায় সপরিবারে বিন্ধ্যাচল, না চন্দ্রনাথ ভ্রমণে গিয়াছেন। অনেকদিন আর দেখা নাই, হঠাৎ একদিন দুপুর বেলা ঠুক ঠুক শব্দে লোকে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, দুই গরুর গাড়ী বোঝাই হইয়া সান্ন্যাল মশায় সপরিবারে বিদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন ও লোকজন ডাকাইয়া হাঁটু-সমান উচু জলবিছুটি ও অর্জুন গাছের জঙ্গল কাটিতে কাটিতে বাড়ী ঢুকিতেছেন।

প্রায়ই একটা মোটা লাঠি হাতে তিনি লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া পাঠশালায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন—এই যে প্রসন্ন, কি রকম আছো, বেশ জাল পেতে বসেচ যে! কটা মাছি পড়লো?

নামতা-মুখস্থরত অপু অমনি অসীম আহ্লাদে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। সান্ন্যাল মশায় যেখানে তালপাতার চাটাই টানিয়া বসিয়াছেন, সেদিকে হাতখানেক জমি উৎসাহে আগাইয়া বসিত। শ্লেট, বই মুড়িয়া একপাশে রাখিয়া দিত যেন আজ ছুটি হইয়া গিয়াছে, আর পড়াশুনার দরকার নাই, সঙ্গে সঙ্গে তাহার ডাগর ও উৎসুক চোখদু'টি গল্পের প্রত্যেকটি কথা যেন দুর্ভিক্ষের ক্ষুধার আগ্রহে গিলিত।

এক-একদিন রেলভ্রমণের গল্প উঠিত। কোথায় সাবিত্রী পাহাড় আছে, তাহাতে উঠিতে তাঁহার স্ত্রীর কি রকম কষ্ট হইয়াছিল, নাভিগয়ায় পিণ্ড দিতে গিয়া পাণ্ডার সঙ্গে হাতাহাতি হইবার উপক্রম। কোথাকার এক জায়গায় খুব একটা ভাল খাবার পাওয়া যায়, সান্যাল মশায় নাম বলিলেন—প্যাঁড়া। নামটা শুনিয়া অপুর ভারী হাসি পাইয়াছিল—বড় হইলে সে "প্যাঁড়া" কিনিয়া খাইবে।

আর একদিন সান্যাল মশায় একটা কোন্ জায়গার গল্প করিতেছিলেন। কোন্ জায়গায় নাকি আগে অনেক লোকের বাস ছিল, সন্ধ্যার সময় তেতুঁলের জঙ্গলের মধ্য দিয়া তাঁহারা সেখানে যান—সান্যাল মশায় বারবার যে জিনিসটা দেখিতে যান তাহার নাম বলিতেছিলেন—"চিকা মসজিদ"। "চিকা মসজিদ" কি জিনিস তাহা প্রথমে সে বুঝিতে পারে নাই, পরে কথাবার্তার ভাবে বুঝিয়াছিল একটা ভাঙা পুরানো বাড়ী।...অন্ধকার প্রায় হইয়া আসিয়াছিল...তাঁহারা ঢুকিতেই এক ঝাঁক চামচিকা সাঁ করিয়া উড়িয়া বাহির হইয়া গেল।... অপু বেশ কল্পনা করিতে



পারে—চারিধারে অন্ধকার তেঁতুলজঙ্গল, কেউ কোথাও নাই, ভাঙ্গা পুরানো দরজা, যেমন সে ঢুকিল অমনি সাঁ করিয়া চামচিকার দল পলাইয়া গেল—রাণুদের পশ্চিমদিকের চোরাকুঠুরীর মত অন্ধকার ঘরটা।

গল্প বলিতে বলিতে বেলা যাইত। পাঠশালার চারিপাশের বনজঙ্গলে অপরাহ্নের রাঙা রৌদ্র বাঁকা ভাবে আসিয়া পড়িত। কাঁঠালগাছের, জগডুমুরগাছের ডালে ঝোলা গুলঞ্চ লতার গায়ে টুনটুনি পাখী মুখ উঁচু করিয়া বসিয়া দোল খাইত। পাঠশালা ঘরে বনের লতাপাতার গন্ধের সঙ্গে লতাপাতার চাটাই, ছেঁড়া-খোঁড়া বই-দপ্তর, পাঠশালার মাটির মেঝে, ও কড়া দা'কাটা তামাকের ধোঁয়া, সবশুদ্ধ মিলিয়া এক জটিল গন্ধের সৃষ্টি করিত।

সেই গ্রামের ছায়া-ভরা মাটির পথে একটি মুগ্ধ গ্রাম্য বালকের ছবি আছে। বই-দপ্তর বগলে লইয়া সে তাহার দিদির পিছনে পিছনে সাজিমাটি দিয়া কাচা, সেলাই করা কাপড় পরিয়া পাঠশালা হইতে ফিরিতেছে, তাহার ছোট্ট মাথাটির অমন রেশমের মত নরম, চিক্কণ, সুখ-স্পর্শ চুলগুলি তাহার মা যত্ন করিয়া আঁচড়াইয়া দিয়াছে—তাহার ডাগর ডাগর সুন্দর চোখ দু'টিতে কেমন যেন অবাক ধরনের চাহনি—যেন তাহারা এ কোন্ অদ্ভুত জগতের নতুন চোখ মেলিয়া চাহিয়া চাহিয়া দিশাহারা হইয়া উঠিয়াছে। গাছপালায় ঘেরা এইটুকুই কেবল তার পরিচিত দেশ—এইখানে মা রোজ হাতে করিয়া খাওয়ায়, চুল আঁচড়াইয়া দেয়, দিদি কাপড় পরাইয়া দেয়, এই গণ্ডিটুকু ছাড়াইলেই তাহার চারিধার ঘিরিয়া অপরিচয়ের অকুল জলধি। তাহার শিশু মন থৈ পায় না।

একদিন পাঠশালায় এমন একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহা তাহার জীবনের একটি নতুন অভিজ্ঞতা।

সেদিন বৈকালে পাঠশালায় অন্য কেহ উপস্থিত না থাকায় কোনো গল্পগুজব হইল না, পড়াশুনা হইতেছিল—সে গিয়া বসিয়া পড়িতেছিল শিশুবোধক—এমন সময় গুরুমহাশয় বলিলেন—দেখি শেলেট নেও, শ্রুতিলিখন লেখো—

মুখে মুখে বলিয়া গেলেও অপু বুঝিয়াছিল

গুরুমহাশয় নিজের কথা বলিতেছেন না, মুখস্থ বলিতেছেন, সে যেমন দাশু রায়ের পাঁচালীর ছড়া মুখস্থ বলে তেমনি।

শুনিতে শুনিতে তাহার মনে হইল অনেকগুলো অমন সুন্দর কথা একসঙ্গে পর পর সে কখনো শোনে নাই। ও-সকল কথার অর্থ সে বুঝিতেছিল না, কিন্তু অজানা শব্দ ও ললিত পদের ধ্বনি, ঝঙ্কার-জড়ানো এই অপরিচিত শব্দ-সঙ্গীত, অনভ্যস্ত শিশুকর্ণে অপূর্ব ঠেকিল এবং সব কথার অর্থ না বোঝার দরুনই কুহেলিঘেরা অস্পষ্ট শব্দসমষ্টির পিছন হইতে একটা অপূর্ব দেশের ছবি বার বার উঁকি মারিতেছিল।

বড় হইয়া স্কুলে পড়িবার সময় সে বাহির করিয়াছিল ছেলেবেলাকার এই মুখস্থ শ্রুতিলিখন কোথায় আছে—

'এই সেই জনস্থান-মধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি। ইহার শিখরদেশ আকাশপথে সতত-সঞ্চরমাণ-জলধর-পটল-সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত—অধিত্যকা প্রদেশ ঘন-সন্নিবিষ্ট বন-পাদপসমূহে সমাচ্ছন্ন থাকাতে স্নিগ্ধ শীতল ও রমণীয়··· পাদদেশে প্রসন্ন-সলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া··'

সে ঠিক বলিতে পারে না, বুঝাইতে পারে না, কিন্তু সে জানে—তাহার মনে হয়, অনেক সময়েই মনে হয়, সেই যে বছর দুই আগে কুঠীর মাঠে সরস্বতী পূজার দিন নীলকণ্ঠ পাখী দেখিতে গিয়াছিল, সেদিন মাঠের ধার বাহিয়া একটা পথকে দূরে কোথায় যাইতে দেখিয়াছিল সে। পথটার দু'ধারে যে কত কি অচেনা পাখী, অচেনা গাছপালা, অচেনা বনঝোপ,—অনেকক্ষণ সেদিন সে পথটার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল। মাঠের ওদিকে পথটা কোথায় যে চলিয়া গিয়াছে তাহা ভাবিয়া সে কূল পায় নাই।

তাহার বাবা বলিয়াছিল—ও সোনাডাঙা মাঠের রাস্তা, মাধবপুর দশঘরা হয়ে সেই ধলচিতের খেয়াঘাটে গিয়ে মিশেচে।

ধলচিতের খেয়াঘাটে নয়,—সে জানিত, ও পথটা আরও অনেক দূরে গিয়াছে। রামায়ণ মহাভারতের দেশে। সেই অশথ গাছের সকলের চেয়ে উঁচু ডালটার দিকে চাহিয়া থাকিলে যাহার কথা মনে উঠে—সেই বহুদূরের দেশটা।

শ্রুতিলিখন শুনিতে শুনিতে সেই দুই বছর আগে দেখা পথটার কথাই তাহার মনে হইয়া গেল।

ঐ পথের ওধারে অনেক দূরে কোথায় সেই জনস্থান-মধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি! বনঝোপের স্নিগ্ধ গন্ধে, না-জানার ছায়া নামিয়া আসা ঝিকিমিকি সন্ধ্যায় সেই স্বপ্নলোকের ছবি তাহাকে অবাক করিয়া দিল। কতদূরে সে প্রস্রবণ গিরির উন্নত শিখর; আকাশ-পথে সতত সঞ্চরমাণ মেঘমালায় যাহার প্রশান্ত নীল সৌন্দর্য সর্বদা আবৃত থাকে?

সে বড় হইলে যাইয়া দেখিবে।



৮

কয়েকমাস কাটিয়া গিয়াছে। ভাদ্র মাস।

অপু বৈকাল বেলা বেড়াইতে যাইবার সঙ্কল্প করিতেছে এমন সময় তাহার মা পিছনে ডাকিয়া বলিল—কোথায় বেরুচ্ছিস রে অপু ?···চাল ভাজা আর ছোলা ভাজা ভাজছি—বেরিও না যেন ?···এক্ষুনি খাবি—

অপু শুনিয়াও শুনিল না—যদিও সে চালছোলা ভাজা খাইতে ভালবাসে বলিয়াই মা তাহার জন্য ভাজিতে বসিয়াছে ইহা সে জানে—তবুও সে কি করিতে পারে ?—এতক্ষণ কি খেলাটাই চলিতেছে নীলুদের বাড়ীতে ? সে যখন বাহির দরজায় পা দিয়াছে, মা'র ডাক আবার কানে গেল—বেরুলি বুঝি ?··· ও অপু, বা রে, দ্যাখো মজা ছেলের ! গরম গরম খাবি—আমি তাড়াতাড়ি ঘাট থেকে এসে ভাজতে লাগ্‌লাম—ও অপু-উ-উ—

অপু এক ছুট্ দিয়া নীলুদের বাড়ী গিয়া পৌছিল। অনেক ছেলে জুটিয়াছিল, অপু আসিবার আগেই খেলা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে। নীলু বলিল—চল্ অপু, দক্ষিণ মাঠে পাখীর ছানা দেখতে যাবি ? অপু রাজী হইলে দু'জনে দক্ষিণ মাঠে গেল। ধান ক্ষেতের ওপারেই নবাবগঞ্জের বাঁধা সড়কটি পূর্ব পশ্চিমে লম্বা হইয়া যেন মাঠের মাঝখান চিরিয়া চলিয়া গিয়াছে। হইবে। অপু এতদূর গ্রাম হইতে এক মাইলের উপর হইবে। অপু এতদূর কখনো বেড়াইতে আসে নাই—তাহার মনে হইল যেন সমস্ত পরিচিত জিনিসের গণ্ডি ছাড়াইয়া কোথায় কতদূরে নীলুদা তাহাকে টানিয়া আনিল। একটুখানি পরেই সে বলিল—বাড়ী চল নীলুদা, আমার মা বক্‌বে, সন্দে হয়ে যাবে, আমি একা গাবতলার পথ দিয়ে যেতে পারবো না। তুমি বাড়ী চল—

ফিরিতে গিয়া নীলু পথ হারাইয়া ফেলিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া কাহাদের একটা বড় আমবাগানের ধার দিয়া একটা পথ মিলিল। সন্ধ্যা হইবার তখনও কিছু বিলম্ব আছে, আকাশে আবার মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে—এমন সময় চলিতে চলিতে নীলু হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া অপুর কনুইয়ে টান দিয়া সম্মুখ দিকে চাহিয়া ভয়ের সুরে বলিল—ও ভাই অপু !

অপু সঙ্গীর ভয়ের কারণ বুঝিতে না পারিয়া বলিল—কি রে নীলুদা ? পরে সে চাহিয়া দেখিল যে সুঁড়ি পথটা দিয়া তাহারা চলিতেছিল, তাহা কাহাদের উঠানে গিয়া শেষ হইয়াছে—উঠানে একখানা ছোট্ট চালাঘর ও একটা বিলাতি আমড়ার গাছ। সে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বে নীলু ভয়ের সুরে বলিয়া উঠিল—আতুরী ডাইনির বাড়ী।

অপুর মুখ শুকাইয়া গেল···আতুরী ডাইনির বাড়ী ! সন্ধ্যাবেলা কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে তাহারা ! কে না জানে যে ওই উঠানের গাছে চুরি করিয়া বিলাতি আমড়া পাড়িবার অপরাধে ডাইনিটা জেলে পাড়ার কোন্ এক ছেলের প্রাণ কাড়িয়া লইয়া

কচুর পাতায় বাঁধিয়া জলে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল, পরে মাছে তাহা খাইয়া ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গে বেচারীর আমড়া খাইবার সাধ এ জন্মের মত মিটিয়া যায় ? কে না জানে, সে ইচ্ছা করিলে চোখের চাহনিতে ছোট ছেলেদের রক্ত চুষিয়া খাইয়া তাহাদের ছাড়িয়া দিতে পারে, যাহার রক্ত খাওয়া হইল, সে কিছু জানিতে পারিবে না, কিন্তু বাড়ী গিয়া খাইয়া দাইয়া সেই যে বিছানায় শুইবে আর পরদিন উঠিবে না ! কতদিন শীতের রাত্রে লেপের তলায় শুইয়া দিদির মুখে আতুরী ডাইনির গল্প শুনিতে শুনিতে সে বলিয়াছে—রাত্রিতে তুই ওসব গল্প বলিস্‌নে দিদি, আমার ভয় করে,—তুই সে কুঁচবরণ রাজকন্যার গল্পটা বল্ দিকি !···

ঝাপ্‌সা দৃষ্টিতে সে সম্মুখে চাহিয়া দেখিতে গেল বাড়ীতে কেহ আছে কিনা··· এবং চাহিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত শরীর যেন জমিয়া হিম হইয়া গেল··· বেড়ার বাঁশের আগড়ের কাছে অন্য কেহ নয়, একেবারে স্বয়ং আতুরী ডাইনিই তাহাদের, এমন কি যেন শুধু তাহারই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া !

যাহার জন্য এত ভয়, তাহাকে একেবারে সম্মুখেই এ-ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া অপুর সামনে পিছনে কোনো দিকেই পা উঠিতে চাহিল না !

আতুরী বুড়ী ভুরু কুঁচকাইয়া, তোব্‌ড়ানো গালটা যেন আরও ঝুলাইয়া ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবার ভঙ্গিতে মুখটা সামনের দিকে একটু বাড়াইয়া দিয়া পায়ে পায়ে তাহাদের দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল ! অপু দেখিল, সে ধরা পড়িয়াছে, কোন দিকেই আর পলাইবার পথ নাই—যে কারণেই হউক ডাইনির রাগটা তাহার উপরই—এখনই তাহার প্রাণটি সংগ্রহ করিয়া কচুর পাতায় পুরিবে !

মুখের খাবার ফেলিয়া, মায়ের ডাকের উপর ডাক উপেক্ষা করিয়া সে যে আজ মায়ের মনে কষ্ট দিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে তাহার ফল এই ফলিতে চলিল ! সে অসহায় ভাবে চারিদিকে চাহিয়া বলিল—আমি কিছু জানিনে—ও বুড়ী পিসি—আমি আর কিছু করবো না—আমায় ছেড়ে দাও, আমি ইদিকে আর কক্ষনো আস্‌বো না—আজ ছেড়ে দাও, ও বুড়ী পিসি—

নীলু তো ভয়ে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল, কিন্তু অপুর ভয় এত হইয়াছিল যে চোখে তাহার জল ছিল না।

বুড়ী বলিল—ভয় কি মোরে, ও বাবারা ? মোরে ভয় কি ?··· পরে খুব ঠাট্টা করা হইতেছে ভাবিয়া হাসিয়া বলিল, মুই কি ধরে নেবো খোকারা ? এস মোর বাড়িতি এস—আমচুর দোবানি এস—

আমচুর !··· ডাইনি বুড়ী ফাঁকি দিয়া ভুলাইয়া বাড়ীতে পুরিতে চাহিতেছে—গেলেই আর কি !··· ডাইনিরা রাক্ষসীরা যে এ-রকম ভুলাইয়া ফাঁদে ফেলে এ-রকম কত গল্প তো সে মা'র মুখে শুনিয়াছে।

এখন সে কি করে !··· উপায় ?

বুড়ী তাহার দিকে আরও খানিক আগাইয়া আসিতে আসিতে বলিল—ভয় কি, ও মোর বাবা ? মুই কিছু বল্‌বো না, ভয় কি মোরে ?

আর কি, সব শেষ ! মায়ের কথা না শুনিবার ফল ফলিবার আর দেরী নাই, হাত বাড়াইয়া তাহার প্রাণটা সংগ্রহ করিয়া এখনি কচুর পাতায় পুরিল ! প্রতিমুহূর্তেই তাহার আশঙ্কা হইতেছিল যে, এখনি এ বুড়ী হাসিমুখ বদ্‌লাইয়া ফেলিয়া বিকট মূর্তি ধরিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিবে—রাক্ষসী রাণীর গল্পের মত। বনের অজগর সাপের দৃষ্টির কুহকে পড়িয়া হরিণশিশু নাকি অন্যদিকে চোখ ফিরাইতে পারে না, তাহারও চোখ দু'টির কুহকমুগ্ধ দৃষ্টি সেইরূপ বুড়ীর মুখের উপর দৃঢ়নিবদ্ধ ছিল—সে আড়ষ্ট কণ্ঠে দিশাহারা ভাবে বলিয়া উঠিল, ও বুড়ী পিসি, আমার মা কাঁদ্‌বে, আমায় আজ আর কিছু বোলো না—আমি তোমার গাছে কোনো দিন আমড়া নিতে আসিনি—আমার মা কাঁদ্‌বে—

আতঙ্কে সে নীলবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে···বাড়ী, ঘর দোর, গাছপালা, নীলু, চারিধারে যেন ধোঁয়া-ধোঁয়া। কেহ কোনদিকে নাই··· কেবল একমাত্র সে আর আতুরী ডাইনির ক্রুদ্ধদৃষ্টি মাখানো একজোড়া চোখ—আর অনেকদূরে কোথায় যেন মা আর তাহার চালভাজা খাওয়ার ডাক !···

পরক্ষণেই কিন্তু অত্যধিক ভয়ে তাহার একরূপ মরিয়া সাহস যোগাইল, একটা অস্পষ্ট আর্তরব করিয়া প্রাণভয়ে দিশাহারা অবস্থায় সে সম্মুখের ভাঁট, শেওড়া, রাংচিতার জঙ্গল ভাঙিয়া ডিঙাইয়া সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে যেদিকে দুই চোখ যায় ছুটিল··· নীলুও ছুটিল তাহার পিছনে পিছনে।···

ইহাদের ভয়ের কারণ কি বুঝিতে না পারিয়া বুড়ী ভাবিল—মুই মাত্তিও যাইনি, ধত্তিও যাইনি—কাঁচা

ছেলে, কি জানি মোরে দেখে কেন ভয় পালে সন্ধেবেলা ? খোকাডা কাদের ?

অপু যখন বাড়ী আসিল, সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সর্বজয়া সবে উনুন ধরাইয়া তালের বড়া ভাজিবার আয়োজন করিতেছে, দুর্গা নিকটে বসিয়া তাল চাঁচিয়া রস বাহির করিতেছে··· ছেলেকে দেখিয়া বলিল—কোথায় ছিলি বল্ দিকি ? সেই বেরিয়েচিস বিকেলবেলা, কিছুই তো আজ খাবার খেলি নে—খিদে তেষ্টা পায় না ?

মায়ের নিকট বলিবার জিনিস অপুর মনে স্তূপাকার হইয়া সকলেই একসঙ্গে বাহিরে আসিবার জন্য এরূপভাবে চেষ্টা পাইতেছিল যে, পরস্পরের ঠেলাঠেলিতে পরস্পরের নির্গমপথ এককালীন রুদ্ধ হইয়া গিয়া অপুকে একেবারে নির্বাক করিয়া দিল, সে শুধু বলিল—আমি কি কাপড় ছাড়বো মা ? আমার এখানা ওবেলার কাপড়—

পরে সে বিস্ময়ের সহিত দেখিল যে, মা তাহাকে চাল ভাজা দিবার কোনো আগ্রহই না দেখাইয়া তালের রসটা ঘন না পাতলা হইয়াছে, তাহাই অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিতেছে। পরীক্ষা শেষ হইয়া গেলে দুর্গাকে বলিল—দু'চার খানা ভেজে দেখি, না হয়, বড় তক্তপোশের নীচেটায় চালের গুঁড়ো আছে, আর দু'টো নিয়ে আসিস্ এখন—পরে ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল—দাঁড়া অপু, তোকে গরম গরম ভেজে দিচ্ছি।

অপু বলিল—কেন মা, চাল ছোলা ভাজা কৈ ?

—তা চাল ভাজা তুই খেলি কৈ ? এতবার ডাক্‌লাম, তুই বেরিয়ে চলে গেলি—ঠাণ্ডা হয়ে গেল, দুর্গা খেয়ে ফেল্লে, তা এই বড়া তো হয়ে গেল বলে। ভাজবো আর দেবো—

অপু সেই বৈকালবেলা হইতে মনের মধ্যে যে তাসের ঘর নির্মাণ করিতেছিল, এক ফুঁয়ে কে তাহা একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া দিল। এই তাহার মা তাহাকে ভালবাসে ! সে বৈকালবেলা বাড়ীর বাহিরে যাওয়ার পর হইতে অনবরত ভাবিতেছে—মা না জানি কত দুঃখ করিতেছে তাহার জন্য ! অপু আমার এখনও কেন যে এলো না, তার জন্যে এত করে ঘাট থেকে এসে ভাজা ভাজলাম, আহা সে দুটো খেলে না !—হাঁ, দায় পড়িয়াছে, তাহার জন্য ভাবিয়া তো মায়ের ঘুম নাই—মা দিব্যি সেগুলি দিদিকে দিয়া খাওয়াইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে—সেই শুধু এতক্ষণ মিছামিছি ভাবিয়া মরিতেছিল।

দুর্গা বলিল—মা, শিগ্‌গির শিগ্‌গির ভেজে নাও। বড্ড মেঘ করে আসচে, বৃষ্টি এলে আর ভাজা হবে না—ঘরে যে জল পড়ে !··· সেদিনকার মত হবে কিন্তু—

দেখিতে দেখিতে চারিধার ঘিরিয়া ঘনাইয়া-আসা মেঘের ছায়ায় বাঁশবনের মাথা কালো হইয়া উঠিল। খুব মেঘ জমিয়া আকাশ অন্ধকার হইয়াছে, অথচ বৃষ্টি এখনও নামে নাই,—এ সময় মনে এক প্রকার আনন্দ ও কৌতূহল হয়—না জানি কি ভয়ঙ্কর বৃষ্টিই আসিতেছে,—পৃথিবী বুঝি ভাসাইয়া লইয়া যাইবে—অথচ বৃষ্টি হয় প্রতিবারই, পৃথিবী কোনবারেই ভাসায় না, তবুও এ মোহটুকু ঘোচে না দুর্গার মন সেই অজানার আনন্দে ভরিয়া উঠিল, সে মাঝে মাঝে দাওয়ার ধারে আসিয়া নীচু চালের ছাঁচ হইতে মুখ বাড়াইয়া মেঘান্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল।

সর্বজয়া খানকতক বড়া ভাজিয়া বলিল—এই বাটিটা করে ওকে দেতো দুগ্‌গা। ওর খিদে পেয়েছে, বিকেল থেকে কিছু তো খায় নি। ওই শেষ কথাই কাল হইল—এতক্ষণ অপু যা হয় এক রকম ছিল, কিন্তু মায়ের শেষের দিকে আদরের সুরে তাহার অভিমানের বাঁধ একেবারে ভাঙিয়া পড়িল, সে বড়াশুদ্ধ বাটিটা উঠানে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, আমি খাবো না তো বড়া, কখ্‌খনো খাবো না—যাও—

সর্বজয়া ছেলের কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া রহিল। গরীবের ঘরকন্না, কত কষ্টে যে কি যোগাড় করিতে হয় সেই জানে ! আর হতভাগা ছেলেটা কি না দু'দু'বার সেই কত কষ্টে সংগৃহীত মুখের জিনিস নষ্ট করিল ! ক্ষোভে, রাগে সে ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল—তোমার আজ হয়েছে কি ! তোমার অদেষ্টে আজ ছাই লেখা আছে, খেও এখন তাই গরম গরম—

এবার অপুর পালা। এরকম কথা মা'র মুখে সে কখনো শোনে নাই। কোথায় সে চাহিতেছে, মা দু'টা আদরের কথা বলিয়া সান্ত্বনা করিবে, না সন্ধ্যাবেলা এমন নিষ্ঠুর কথা ! সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—আচ্ছা মা, আমি চাল ভাজা খাইনি তাতে আমার মনে কষ্ট হয় না ? আমি বিকেল থেকে

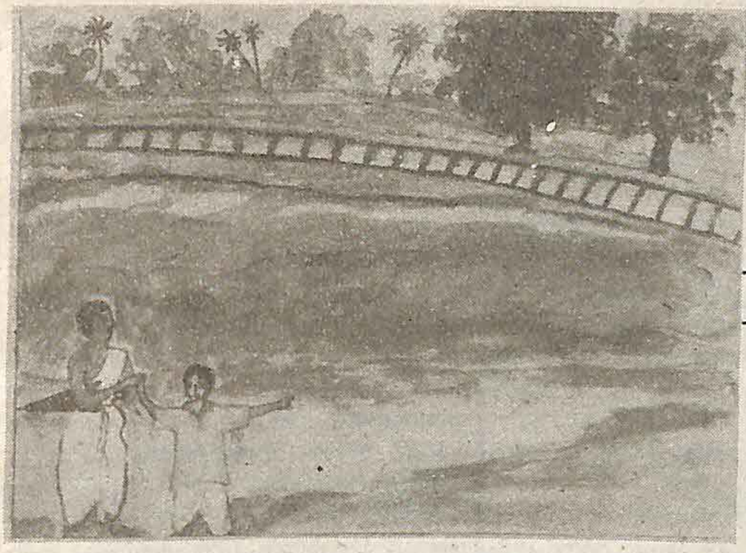
ভাবচিনে বুঝি ? আমি—কখ্খনো তোমার বাড়ী আর আসচিনে—আমি ছাই খাবো ? কেন আমি ছাই খাবো ? আর দিদি বুঝি সব ভাল জিনিস খাবে ? আমি আসবো না তোমার বাড়ী, কখ্খনো আসবো না—

পরে সে আতুড়ী বুড়ীর বাড়ী হইতে এইমাত্র যেরূপ অন্ধকার, কাঁটাবন, আমবন না মানিয়া ছুটিয়াছিল, এখনও রাগে আত্মহারা হইয়া দাওয়া হইতে নামিয়া বাহিরের উঠানের দিকে ঠিক সেইরূপ মরিয়ার মত ছুটিল। ভাইয়ের অভিমান ভরা দৃষ্টি, ফুলা ঠোঁট ও কথা বলিবার ধরন দুর্গার নিকট এরূপ হাস্যকর ঠেকিল যে, সে হাসিয়া প্রায় গড়াইয়া পড়িল।—হি হি—অপুটা একেবারে পাগ্‌লা মা, কেমন বল্লে—পরে ভাইয়ের কথা বলিবার ভঙ্গির নকল করিয়া বলিল—আমি চালভাজা খাইনি—হি হি—তাতে বুঝি আমার কষ্ট হয় না ? বোকা একেবারে—শুনে যা—ও অপু, শুনে যা—ও অপু-উ-উ—

অপু ছুটিয়া পাঁচিলের পাশের পথ দিয়া পিছনের বাঁশবাগানের দিকে ছুটিল। আকাশে মেঘ তখনও থমকিয়া আছে ; বাঁশবনের তলাটা ঝোপে ঝাড়ে নির্জন বর্ষাসন্ধ্যায় ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। সহজ অবস্থায় এরূপ স্থানে এ-সময়ে একা আসিবার কল্পনাই সে করিতে পারিত না কোনোদিনও। কিন্তু বর্তমানে চারিধারের নির্জনতা ও অন্ধকার, বাঁশঝাড়ের মধ্যে কিসের খড়মড় শব্দ, অদূরে সল্‌তেখাগী আমগাছে ভূতের প্রাসাদ প্রভৃতি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে ভাবিতে লাগিল—আমি কখ্খনো বাড়ী যাবো না তো—এ জন্মে আর বাড়ী যাবো না—

অভিমানের প্রথম বেগটা কাটিয়া গেলে তাহার একটু গা ছম ছম্ করিতে লাগিল—ভয়ে ভয়ে সে একবার দূরের সল্‌তেখাগী আমগাছটার দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার মনে হইল—এখন যদি একটা ভূতে আমায় তুলে একেবারে মগ্‌ডালে নিয়ে যায় তো বেশ হয়—মা খুঁজে খুঁজে কেঁদে মরবে—ভাববে, কেন সন্দেবেলা ছাই খাও বল্লাম, তাই তো খোকা আমার রাগ করে কোথায় অন্ধকারে মেঘ মাথায় বেরিয়ে চলে গেল, আর ফিরে এলো না। ভূতের হাতে সে মরিয়া গেলে মা'র কি রকম কষ্ট হইবে তাহা সে খানিকক্ষণ প্রতিহিংসার আনন্দে উপভোগ করিল। পরে সেখান হইতে সে গিয়া পাঁচিলের পাশের পথে দাঁড়াইল। তাহার ভয় ভয় করিতেছিল—সম্মুখের বাঁশঝাড়ে একটা যেন অস্পষ্ট শব্দ হইল, অপু একবার ভয়ে ভয়ে চোখ উঁচু করিয়া চাহিয়া দেখিল। তাহার মা ও দিদি রাণুদের বাড়ীর দিকে ডাকিতেছে—ও অপু—উ—উ ! বাঁশঝাড়ে আবার যে একটা শব্দ হইল। সে মনে মনে বড় অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু মুস্কিল এই যে তাহাকে খোসামোদ না করিলে সে নিজেই এত রাগের মাথায় বাড়ী গিয়া ঢুকিবে, সত্য সত্য এতটা আত্মসম্মানজ্ঞানশূন্য সে নয় নিশ্চয়ই। এবার তাহার দিদি বাণুদের বাড়ীর খিড়কি দিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে যেন। সে ছুটিয়া দরজার সামনে পাঁচিলের কোণটাতে দাঁড়াইল। হঠাৎ আসিতে আসিতে পাঁচিলের পাশে চোখ পড়িতেই দুর্গা চেঁচাইয়া উঠিল—ওই দাঁড়িয়ে রয়েছে মা ! এই দ্যাখো পাঁচিলের পাশে। পরে সে ছুটিয়া গিয়া ভাইয়ের হাত ধরিল—(ছুটিবার আবশ্যকতা ছিল না)—ওরে দুষ্টু, এখানে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকা হয়েচে আর আমি আর মা সমস্ত জায়গা খুঁজে বেড়াচ্চি, এই দ্যাখো মা, ছেলের কাণ্ড দ্যাখো।—

দু'জনে মিলিয়া তাহাকে বাড়ীর মধ্যে ধরিয়া লইয়া গেল।



৯

এবার বাড়ী হইতে যাইবার সময় হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। বলিল,—বাড়ী থেকে কিছু খেতে পায় না, তবুও বাইরে বেরুলে দুধটা—ঘিটা—ওর শরীরটা সারবে এখন।

অপু জন্মিয়া অবধি কোথাও কখনো যায় নাই। এ গাঁয়ের বকুলতলা, গোঁসাইবাগান, চাল্‌তেতলা, নদীর ধার, বড় জোর নবাবগঞ্জ যাইবার পাকা সড়ক—এই পর্যন্ত তাহার দৌড়। মাঝে মাঝে বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ মাসে খুব গরম পড়িলে তাহার মা বৈকালে নদীর ঘাটে দাঁড়াইয়া থাকিত। নদীর ওপারের খড়ের মাঠে বাবলা গাছে গাছে হলুদ রঙের ফুল ফুটিয়া থাকিত, গরু চরিত, মোটা গুলঞ্চলতা-দুলানো শিমূল গাছটাকে দেখিলে মনে হইত যেন কতকালের পুরানো গাছটা। রাখালেরা নদীর ধারে গরুকে জল খাওয়াইতে আসিত, ছোট্ট একখানা জেলেডিঙ্গি বাহিয়া তাহাদের গাঁয়ের অক্রূর মাঝি মাছ ধরিবার দোয়াড়ি পাতিতে যাইত, মাঠের মাঝে মাঝে ঝাড় ঝাড় সোঁদালী ফুল বৈকালের ঝিরঝিরে বাতাসে দুলিতে থাকিত—ঠিক সেই সময় হঠাৎ এক একদিন ওপারের সবুজ খড়ের জমির শেষে নীল আকাশটা যেখানে আসিয়া দূর গ্রামের সবুজ বনরেখার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে সে দিকে চাহিয়া দেখিতেই তাহার মনটা যেন কেমন হইয়া যাইত।—সে সব কথা প্রকাশ করিয়া বুঝাইয়া বলিতে জানিত না, শুধু তাহার দিদি ঘাট হইতে উঠিলে সে বলিত—দিদি—দিদি-দ্যাখ্ দ্যাখ্ ঐদিকে—পরে সে মাঠের শেষের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ঐ যে ?—ঐ গাছটার পেছনে !—কেমন অনেকদূর, না ? দুর্গা হাসিয়া বলিত—অনেকদূর—তাই দেখাচ্ছিলি ? দূর, তুই একটা পাগল।

আজ সেই অপু সর্বপ্রথম গ্রামের বাহিরে পা দিল। অনেকদিন পূর্ব হইতেই উৎসাহে তাহার রাত্রিতে ঘুম হওয়া দায় হইয়া পড়িয়াছিল, দিন গুণিতে গুণিতে অবশেষে যাইবার দিন আসিয়া গেল।

তাহাদের গ্রামের পথটি বাঁকিয়া নবাবগঞ্জের সড়ককে ডাইনে ফেলিয়া মাঠের বাহিরে আষাঢ়ু-দুর্গাপুরের কাঁচা রাস্তার সঙ্গে মিশিয়াছে। দুর্গাপুরের রাস্তায় উঠিয়াই সে বাবাকে বলিল—বাবা, যেখান দিয়ে রেল যায় সেই রেলের রাস্তা কোন্ দিকে ? তাহার বাবা বলিল—সাম্‌নেই পড়বে এখন, চলো না ! আমরা রেল লাইন পেরিয়ে যাব এখন—

কিছু দূর গিয়া সে বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া দেখিল, নবাবগঞ্জের পাকা সড়কের মত একটা উঁচুমত রাস্তা মাঠের মাঝখান চিরিয়া ডাইনে বাঁয়ে বহুদূর গিয়াছে। রাঙা রাঙা খোয়ার রাশি উঁচু হইয়া ধারের দিকে সারি দেওয়া। সাদা সাদা লোহার খুঁটির উপর যেন

একসঙ্গে অনেক দড়ির টানা বাঁধা—যতদূর দেখা যায় ঐ সাদা খুঁটি ও দড়ির টানা বাঁধা দেখা যাইতেছে।

তাহার বাবা বলিল—ঐ দ্যাখো খোকা, রেলের রাস্তা—

অপু একদৌড়ে ফটক পার হইয়া রাস্তার উপর আসিয়া উঠিল। পরে সে রেলপথের দুইদিকে বিস্ময়ের চোখে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। দুইটা লোহা বরাবর পাতা কেন? উহার উপর দিয়া রেলগাড়ি যায়? কেন? মাটির উপর দিয়া না গিয়া লোহার উপর দিয়া যায় কেন? পিছলাইয়া পড়িয়া যায় না? কেন? এগুলোকে তার বলে? তারের মধ্যে সোঁ সোঁ কিসের শব্দ? তারে খবর যাইতেছে? কাহারা খবর দিতেছে? কি করিয়া খবর দেয়? ওদিকে কি ইষ্টিশান? এদিকে কি ইষ্টিশান?

সে বলিল—বাবা, রেলগাড়ী কখন আসবে? আমি রেলগাড়ী দেখবো বাবা।

—রেলগাড়ী এখন কি করে দেখবে···সেই দুপুরের সময় রেলগাড়ী আসবে, এখনও দু'ঘণ্টা দেরী।

—তা হোক্ বাবা, আমি দেখে যাবো, আমি কখ্খনো দেখিনি—হ্যাঁ বাবা—

—ওরকম কোরো না, ঐ জন্যে তোমায় কোথাও আনতে চাইনে—এখন কি করে দেখ্বে? সেই দুপুর একটা অবধি বসে থাকতে হবে তাহলে এই ঠায় রদ্দুরে—আসবার দিন দেখাবো।

অপুকে অবশেষে জল-ভরা চোখে বাবার পিছনে পিছনে অগ্রসর হইতে হইল।

তুমি চলিয়া যাইতেছ···তুমি কিছুই জানো না, পথের ধারে তোমার চোখে কি পড়িতে পারে, তোমার ডাগর নবীন চোখ বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় চারিদিককে গিলিতে গিলিতে চলিয়াছে—নিজের আনন্দের এ হিসাবে তুমিও একজন দেশ-আবিষ্কারক। অচেনার আনন্দকে পাইতে হইলে পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে, তাহার মানে নাই। আমি যেখানে আর কখনো যাই নাই, আজ নতুন পা দিলাম, যে নদীর জলে নতুন স্নান করিলাম, যে গ্রামের হাওয়ায় শরীর জুড়াইল, আমার আগে সেখানে কেহ আসিয়াছিল কিনা, তাহাতে আমার কি আসে যায়? আমার অনুভূতিতে তাহা যে অনাবিষ্কৃত দেশ। আমি আজ সর্বপ্রথম মন, বুদ্ধি, হৃদয় দিয়া উহার নবীনতাকে আস্বাদ করিলাম যে!

আমডোব! ছোট্ট চাষীদের গাঁ-খানা—কেমন নামটি। মেয়েরা উঠানে বিচালী কাটিতেছে, ছাগল বাঁধিতেছে, মুরগীকে ভাত খাওয়াইতেছে, বড় লোকেরা পাট শুকাইতেছে, বাঁশ কাটিতেছে—দেখিতে দেখিতে গাঁ পিছনে ছাড়িয়া একেবারে বাইরের মাঠ···বিলে জল থৈথৈ করিতেছে···উড়ি ধানের ক্ষেতে বক বসিয়া আছে···নাল ফুলের পাতা ও ফুটন্ত ফুলে জল দেখা যায় না।

খল্‌সেমারির বিলের প্রান্তে ঘন সবুজ আউশ ধানের ক্ষেতের উপরকার বৃষ্টি-ধৌত ভাদ্রের আকাশের সুনীল প্রসার। সারা চক্রবাল জুড়িয়া সূর্যাস্তের অপরূপ বর্ণচ্ছটা, বিচিত্র রঙের মেঘের পাহাড়, মেঘের দ্বীপ, মেঘের সমুদ্র, মেঘের স্বপ্নপুরী—খোলা আকাশের সহিত এরকম পরিচয় তাহার এতদিন হয় নাই, মাঠের পারের দূরের দেশটা এবার তাহার রহস্য-অবগুণ্ঠন খুলিল—আট বছরের ছেলেটির কাছে।

যাইতে যাইতে বড় দেরী হইল। তাহার বাবা বলিল—তুমি বড্ড হাঁ-করা ছেলে, যা দেখো তাতেই হাঁ করে থাকো কেন অমন? জোরে হাঁটো।

সন্ধ্যার পর তাহারা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিল। শিষ্যের নাম লক্ষ্মণ মহাজন, বেশ বড় চাষী ও অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। বাহিরের বড় আটচালা ঘরে মহা আদরে তাহাদের থাকিবার স্থান করিয়া দিল।

লক্ষ্মণ মহাজনের ছোট ভাইয়ের স্ত্রী সকালে স্নান করিবার জন্য পুকুরের ঘাটে আসিয়াছিল—জলে নামিতে গিয়া পুকুরের পাড়ে নজর পড়াতে সে দেখিল পুকুর-পাড়ের কলাবাগানে একটি অচেনা ছোট ছেলে একখানি কঞ্চি হাতে একবার এদিক একবার ওদিক পায়চারি করিতেছে ও পাগলের মতো আপন মনে বকিতেছে। সে ঘড়া নামাইয়া কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কাদের বাড়ী এসেছ, খোকা?

অপুর যত জারিজুরি তাহার মায়ের কাছে। বাহিরে সে বেজায় মুখচোরা।

প্রথমটা অপুর মাথায় আসিল যে টানিয়া দৌড় দেয়। পরে সঙ্কুচিত সুরে বলিল—ওই ওদের বাড়ী—



বধূটি বলিল—বট্‌ঠাকুরদের বাড়ী ? বট্‌ঠাকুরের গুরুমহাশয়ের ছেলে ?—ও !

বধূ সঙ্গে করিয়া তাহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গেল। তাহাদের বাড়ী পৃথক—লক্ষ্মণ মহাজনের বাড়ী হইতে সামান্য দূরে, কিন্তু মধ্যে পুকুরটা পড়ে।

বধূর ব্যবহারে অপুর লাজুকতা কাটিয়া গেল। সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া জিনিসপত্র কৌতূহলের সহিত চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ওঃ কত কি জিনিস ! ...তাহাদের বাড়ীতে এরকম জিনিস নাই। এরা খুব বড়লোক তো! কড়ির আলনা, রঙ-বেরঙের ঝুলন্ত শিকা, পশমের পাখী, কাঁচের পুতুল, শোলার গাছ—আরও কত কি ! দু' একটা জিনিস সে ভয়ে ভয়ে হাতে তুলিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল।

বধূ এতক্ষণ ভাল করিয়া ছেলেটির মুখের দিকে চাহিয়া দেখে নাই—কাছের গোড়ায় দেখিয়া মনে হইল যে, এ এখনও ভারী ছেলেমানুষ, মুখের ভাব যেন পাঁচবছরের ছেলের মত কচি। এমন সুন্দর, অবোধ চোখের ভাব সে আর কোনো ছেলের চোখে এ পর্যন্ত দেখে নাই—এমন রঙ, এমন গড়ন, সুন্দর মুখ, এমন তুলি দিয়া আঁকা ডাগর নিষ্পাপ চোখ—অচেনা ছেলেটির উপর বধূর বড় মমতা হইল।

অপু বসিয়া নানা গল্প করিল—বিশেষ করিয়া কল্যকার রেলপথের কথাটি। খানিকটা পরে বধূ মোহনভোগ তৈয়ারী করিয়া খাইতে দিল। একটা বাটিতে অনেকখানি মোহনভোগ,এত ঘি দেওয়া যে আঙুলে ঘিয়ে মাখামাখি হইয়া যায়। অপু একটুখানি মুখে তুলিয়া অবাক হইয়া গেল—এমন অপূর্ব জিনিস আর সে কখনো খায় নাই তো ! ...মোহনভোগে কিস্‌মিস্ দেওয়া কেন ? কৈ তাহার মায়ের তৈরী মোহনভোগে তো কিস্‌মিস্ থাকে না ? বাড়ীতে সে মায়ের কাছে আবদার ধরে—মা, আজ আমাকে মোহনভোগ করে দিতে হবে। তাহার মা হাসি মুখে বলে—আচ্ছা, ওবেলা তোকে করে দেবো—পরে সে শুধু সুজি জলে সিদ্ধ করিয়া একটু গুড় মিশাইয়া পুলটিসের মত একটা দ্রব্য তৈয়ারী করিয়া কাঁসার সরপুরিয়া থালাতে আদর করিয়া ছেলেকে খাইতে দেয়। অপু তাহাই খুসির সহিত এতদিন খাইয়া আসিয়াছে, মোহনভোগ যে এরূপ হয় তাহা সে জানিত না। আজ কিন্তু তাহার মনে হইল এ-মোহনভোগে আর মায়ের তৈরী মোহনভোগে আকাশ-পাতাল তফাৎ ! ...সঙ্গে সঙ্গে মায়ের উপর করুণায় ও সহানুভূতিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল। হয়তো তাহার মাও জানে না এরকমের মোহনভোগ হয়। সে যেন আবছায়াভাবে বুঝিল, তাহার মা গরীব, তাহারা গরীব—তাই তাহাদের বাড়ী ভাল খাওয়া দাওয়া হয় না।

একদিন পাড়ার এক ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীর বাড়ী অপুর নিমন্ত্রণ হইল। দুপুরবেলা সে-বাড়ীর মেয়ে আসিয়া অপুকে ডাকিয়া লইয়া গেল। ওদের রান্নাঘরের দাওয়ায় যত্ন করিয়া পিড়ি পাতিয়া জল ছিটাইয়া অপুকে খাবার জায়গা করিয়া দিল ; যে মেয়েটি অপুকে ডাকিতে আসিয়াছিল, নাম তার অমলা, বেশ টকটকে ফর্সা রঙ, বড় বড় চোখ, বেশ মুখখানি, বয়স তার দিদির মতো। অমলার মা কাছে বসিয়া তাহাকে খাওয়াইলেন, নিজের হাতের তৈয়ারী চন্দ্রপুলী পাতে দিলেন। খাওয়ার পরে অমলা তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী দিয়া গেল। সেদিন বৈকালে খেলিতে খেলিতে অপুর পায়ের আঙুল হঠাৎ বাগানের বেড়ার দুই বাঁশের ফাঁকে পড়িয়া আটকাইয়া গেল। টাট্‌কা-চেরা নতুন বাঁশের বেড়া—আঙুল কাটিয়া রক্তারক্তি হইল, অমলা ছুটিয়া আসিয়া পাখানা বাঁশের ফাঁক হইতে বাহির না করিলে গোটা আঙুলটাই চাপা পড়িত! সে চলিতে পারিতেছিল না, অমলা তাহাকে কোলে করিয়া গোলার পাশ হইতে পাথরকুচির পাতা তুলিয়া বাটিয়া আঙুলে বাঁধিয়া দিল। পাছে বাবার বকুনি খাইতে হয়, এই ভয়ে অপু একথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিল না।

সে-রাত্রে শুইয়া অপু শুধু অমলারই স্বপ্ন দেখিল। সে অমলার কোলে বেড়াইতেছে, অমলার কাছে বসিয়া আছে, অমলার সঙ্গে খেলা করিতেছে, অমলা তাহার পায়ের আঙুলে পটি বাঁধিয়া দিতেছে, সে ও অমলা রেল-রাস্তায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে—অমলার হাসিভরা চোখমুখ ঘুমের ঘোরে সারারাত নিজের কাছে কাছে! ভোরে সে শুধু খুঁজিতে লাগিল অমলা কখন আসে। আর সব ছেলেমেয়েরা আসিল, খেলা আরম্ভ হইয়া গেল, ক্রমে বেশ বেলা হইল—কিন্তু অমলার দেখা নাই। বাড়ীর ভিতর হইতে বধূ খাবার খাইবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইল—রোজ সকালে বিকালে বধূ নিজের হাতে খাবার তৈয়ারী করিয়া তাহাকে খাওয়াইত—খাওয়া শেষ করিয়া আসিবার সময় সে বধূকে জিজ্ঞাসা করিল—সকালে কি অমলা দিদি এসেছিল ?

না, সে আসে নাই। ক্রমে আরও বেলা হওয়াতে খেলা ভাঙিয়া গেল। তাহার বাবা তাহাকে স্নান করিবার জন্য ডাকিল। তবুও কোথায় অমলা! অভিমানে তাহার মন ছাপাইয়া উঠিল,—বেশ, নাই বা আসিল! অমলার সহিত তাহার জন্মের মত আড়ি,—আর যদি সে কখনো তাহার সহিত কথা কয়! বৈকালেও খেলা আরম্ভ হইল, আর সকলেই আসিল—অমলা নাই। পাঁচ ছয়টি ছেলেমেয়ে খেলিতে আসিলেও অপুর মনে হইল, কাহার সহিত সে খেলিবে ? কেহই উপযুক্ত খেলার সাথী বলিয়া মনে হইল না ? উৎসাহহীন ভাবে সে খানিকক্ষণ খেলা করিল, তবুও অমলার দেখা নাই।

পরদিন সকালে অমলা আসিল। অপু কোনো কথা বলিল না। অমলা যেখানে বসে, সে তাহার ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না, অথচ মাঝে মাঝে আড়চোখে চাহিয়া চাহিয়া দেখে, সে যে রাগ করিয়া এরূপ করিতেছে, অমলা তাহা বুঝিয়াছে কিনা। অমলা সত্যই প্রথমটা বুঝিতে পারে নাই, পরে যখন সে বুঝিল যে, কিছু একটা হইয়াছে নিশ্চয়, তখন সে কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি খোকা, কথা বলচো না কেন ? ...কি হয়েচে ?

অপু অতশত বোঝে না, সে অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল—কি হয়েছে বৈকি ? তা কিছু কি আর হয়েছে ? কাল আসনি কেন ?

অমলা অবাক হইয়া বলিল—আসিনি তাই কি ?—সেই জন্যে রাগ কোরেচ ? অপু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—ঠিক তাই।

অমলা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া অপুকে হাত ধরিয়া লইয়া চলিল বাড়ীর ভিতর।

খানিকক্ষণ পরে অপু অমলার সঙ্গে তাহাদের বাড়ী গেল। অমলা তাহাদের আলমারী খুলিয়া কাঁচের বড় মেম-পুতুল, মোমের পাখী, গাছ, আরও কত কি দেখাইল। কালীগঞ্জের স্নানযাত্রার মেলা হইতে সে সব নাকি কেনা, অপু জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল। নতুন নতুন খেলার জিনিস—একটা রবারের বাঁদর, সেটা তুমি যেদিকে যাও তোমার দিকে চাহিয়া চোখ পিটপিট করিবে—একটা কিসের পুতুল, সেটার পেট টিপিলে দু'হাতে মৃগীরোগীর মত হঠাৎ পা ছুঁড়িয়া খঞ্জনি বাজাইতে থাকে—সকলের চেয়ে আশ্চর্যের জিনিস হইতেছে একটা টিনের ঘোড়া, রাণুদির কাকা তাহাদের বাড়ীর দালানের ঘড়িতে যেমন দম দেয়, ঐরকম দম দিয়া ছাড়িয়া দিলে সেটা খড় খড় করিয়া মেঝের উপর চলিতে

থাকে—অনেকদূর যায়—ঠিক যেন একেবারে সত্যকারের ঘোড়া। সেইটা দেখিয়া অপু অবাক হইয়া গেল। হাতে তুলিয়া বিস্ময়ের সহিত উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া অমলার দিকে চাহিয়া বলিল—এ কি রকম ঘোড়া, বেশ তো! এ কোথা থেকে কেনা, এর দাম কত?

তাহার পর অমলা তাহাকে একটা সিঁদুরের কৌটা খুলিয়া দেখাইল—সেটার মধ্যে রাঙা রঙের একখানা ছোট রাংতার মত কি। অপু বলিল—ওটা কি? রাংতা? অমলা হাসিয়া বলিল—রাংতা হবে কেন? সোনার পাত দেখোনি অপু? ...অপু সোনার পাত দেখে নাই! সোনার রঙ কি অত রাঙা? সোনার পাতখানা নাড়িয়া চাড়িয়া সে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। অমলার সহিত বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে সে ভাবিল—আহা, দিদিটার এ-সব খেলনা কিছুই নেই—মরে কেবল শুকনো নাটাফল আর রড়ার বীচি কুড়িয়ে। ...তাহার দিদির বয়সী অন্য কোনো মেয়ের খেলনার ঐশ্বর্য কত বেশী, তাহা সে এ পর্যন্ত কোনো দিন দেখে নাই, আজ তুলনা করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়া দিদির প্রতি অত্যন্ত করুণায় তাহার মনটা যেন গলিয়া গেল। তাহার পয়সা থাকিলে সে দিদিকে একটা কলের ঘোড়া কিনিয়া দিত—আর একটা রবারের বাঁদর ...তুমি যেদিকে চাও তোমার দিকে চাহিয়া সেটা চোখ পিট্‌পিট্ করে...

বধূর কাছে একজোড়া পুরানো তাস ছিল, ঠিক একজোড়া বলা চলে না, নানা জোড়া তাসের পরিত্যক্ত কাগজগুলি এক জায়গায় জড় করা আছে মাত্র—অপু সেগুলি লইয়া মধ্যে মধ্যে নাড়ে চাড়ে। রাণুদির বাড়ীতে মাঝে মাঝে দুপুরবেলা তাসের আড্ডা বসিত, সে বসিয়া বসিয়া খেলা দেখিত। টেক্কা, গোলাম, সাহেব, বিবি—কাগজ ধরা লইয়া মারামারি হয়—বেশ খেলা! সে তাস খেলিতে জানে না, তাহার মা দিদি কেহই জানে না।

সে যদি একজোড়া তাস পায় তবে সে, মা ও দিদি খেলে। খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরবেলা তাদের বাড়ীর বনের ধারের দিকে সেই জানালাটা—যেটার কপাটগুলার মধ্যে কি পোকায় কাটিয়া সরিষার মত গুঁড়া করিয়া দিয়াছে—নাড়া দিলে ঝুরঝুর করিয়া ঝরিয়া পড়ে, পুরানো কাঠের গুঁড়ার গন্ধ বাহির হয়—জানালার ধারের বন হইতে দুপুরে হাওয়ায় গন্ধ-ভেদালি লতার কটু গন্ধ আসে, রোয়াকের কালমেঘ-গাছের জঙ্গলে দিদির পরিচিত কাঁচপোকাটা একবার ওড়ে, আবার বসে, আবার ওড়ে, আবার বসে—নির্জন দুপুরে তারা তিনজনে সেই জানালাটির ধারে মাদুর পাতিয়া বসিয়া আপন মনে তাস খেলিবে।

সন্ধ্যার পরে বধূর ঘরে অপুর নিমন্ত্রণ ছিল। খাইতে বসিয়া খাবার জিনিসপত্র ও আয়োজনের ঘটা



দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। ছোট একখানা ফুলকাটা রেকাবীতে আলাদা করিয়া নুন ও নেবু কেন ? নুন নেবু তো মা পাতেই দেয় ! প্রত্যেক তরকারীর জন্য আবার আলাদা আলাদা বাটি ! তরকারীই বা কত ! অত বড় গলদা চিংড়ীর মাথাটা কি তাহার একার জন্য ?

লুচি ! লুচি ! তাহার ও তাহার দিদির স্বপ্নকামনার পারে এক রূপকথার দেশের নীল বেলা আবছায়া দেখা যায়···কত রাতে, দিনে, ওলের ডাঁটাচচ্চড়ী ও লাউ-ছেঁচকী দিয়া ভাত খাইতে খাইতে, কত জলখাবার-খাওয়া শূন্য সকালে বিকালে, অন্যমনস্ক মন হঠাৎ লুব্ধ উদাসগতিতে ছুটিয়া চলে সেখানে—যেখানে গরম রোদে দুপুরবেলা তাহাদের পাড়ার পাকা রাঁধুনি বীরু রায় গামছা কাঁধে ঘুরিয়া বেড়ায়, সদ্যতৈয়ারী বড় উনুনের উপর বড় লোহার কড়াইয়ে ঘি চাপানো থাকে, লুচি ভাজার অপূর্ব সুধারুচিঘ্রাণ আসে, কত ছেলেমেয়ে ভাল কাপড় জামা পরিয়া যাতায়াত করে, গাঙ্গুলী-বাড়ীর বড় নাটমন্দির ও জলপাইতলা বিছাইয়া গ্রীষ্মের দিনে সতরঞ্চ পাতা হয়, একদিন মাত্র বছরে সে দেশের ঠিকানা খুঁজিয়া মেলে—সেই বৈশাখ মাসের রামনবমী দোলের দিনটি—তাহাদের সেদিন নিমন্ত্রণ থাকে ওপাড়ার গাঙ্গুলী-বাড়ী। কিন্তু আজ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সেই সুদিনের উদয় হইল কি করিয়া ! খাইতে বসিয়া বার বার তাহার মনে হইতেছিল, আহা, তাহার দিদি এরকম খাইতে পায় নাই কখনো !

পরদিন সকালে আবার খেলা আরম্ভ হইল। অমলা আসিতেই অপু ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত ধরিল—আমি আর অমলাদি একদিকে, আর তোমরা সব একদিকে—

খানিক খেলা হইবার পর অপুর মনে হইল, অমলা তাহাকে দলে পাওয়ার অপেক্ষা বিশুকে দলে পাইতে ইচ্ছুক। ইহার প্রকৃত কারণ অপু জানিত না—অপু একেবারে কাঁচা খেলুড়ে, তাহাকে দলে লওয়ার মানেই পরাজয়—বিশু ডানপিটে ছেলে, তাহাকে দৌড়িয়া ধরা, কি খেলায় হারানো সোজা নয়। একবার অমলা স্পষ্টই বিরক্তি প্রকাশ করিল। অপু প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল সে যাহাতে জেতে, যাহাতে অমলা সন্তুষ্ট হয়—কিন্তু বিস্তর চেষ্টা সত্ত্বেও সে আবার হারিয়া গেল।

সে-বার দল গঠন করিবার সময় অমলা ঝুঁকিল বিশুর দিকে।

অপুর চোখ জলে ভরিয়া আসিল। খেলা তাহার কাছে হঠাৎ বড় বিস্বাদ মনে হইল—অমলা বিশুর দিকে ফিরিয়া সব কথা বলিতেছে, হাসিখুসি সবই তাহার সঙ্গে। খানিকটা পরে বিশু কি কাজে বাড়ী যাইতে চাহিলে অমলা তাহাকে বার বার বলিল যে, সে যেন আবার আসে। অপুর মনে অত্যন্ত ঈর্ষা হইল , সারা সকালটা একেবারে ফাঁকা হইয়া গেল। পরে সে মনে মনে ভাবিল—বিশু খেলা ছেড়ে চলে যাচ্ছে—গেলে খেলার খেলুড়ে কমে যাবে, তাই অমলাদি ঐ রকম বল্‌চে, আমি গেলে আমাকেও বল্‌বে, ওর চেয়ে বেশী বল্‌বে। হঠাৎ সে চলিয়া যাইবার ভান করিয়া বলিল—বেলা হয়ে যাচ্ছে, আমি যাই, নাইবো। অমলা কোনো কথা বলিল না, কেবল কামারদের নাড়ুগোপাল বলিল—আবার ওবেলা এসো ভাই !

অপু খানিক দূর গিয়া একবার পিছনে চাহিল—তাহাকে বাদ দিয়া কাহারও কোন ক্ষতি হয় নাই, পুরাদমে খেলা চলিতেছে, অমলা মহা উৎসাহে খুঁটির কাছে বুড়ী দাঁড়াইয়াছে—তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিতেছে না !

অপু আহত অভিমানে বাড়ী আসিয়া পৌছিল, কাহারও সঙ্গে কোনো কথা বলিল না।

ভারী তো অমলাদি !. না চাহিল তাহাকে—তাতেই বা কি ?···

দিন দুই পরে হরিহর ছেলেকে লইয়া বাড়ী আসিল।

এই মোটে কয়দিন, এরই মধ্যে সর্বজয়া ছেলেকে না দেখিয়া আর থাকিতে পারিতেছিল না।

দুর্গার খেলা কয়দিন হইতে ভালরকম জমে নাই, অপুর বিদেশযাত্রার দিনকতক আগে দেশী-কুম্‌ড়ার শুক্‌না খোলার নৌকা লইয়া ঝগড়া হওয়াতে দু'জনের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল—এখন আরও অনেক কুম্‌ড়ার খোলা জমিয়াছে, দুর্গা কিন্তু আর সেগুলি জলে ভাসাইতে যায় না—কেন মিছামিছি এ নিয়ে ঝগড়া করে তার কান মলে দিলাম ? আসুক সে ফিরে, আর কক্ষনো তার সঙ্গে ঝগড়া নয়, সব খোলা সে-ই নিক্।



বাড়ী আসিয়া অপু দিন পনেরো ধরিয়া নিজের অদ্ভুত ভ্রমণকাহিনী বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। কত আশ্চর্য জিনিস সে দেখিয়াছে এই কয়দিনে। রেলের রাস্তা, যেখান দিয়া সত্যিকার রেলগাড়ী যায়! মাটির আতা, পেঁপে, শসা—অবিকল যেন সত্যিকার ফল! সে পুতুলটা, যেটার পেট টিপিলে মৃগীরোগীর মত হাত পা ছুঁড়িয়া হঠাৎ খঞ্জনি বাজাইতে সুরু করে! অমলা-দি? কতদূর যে সে গিয়াছিল, কত পদ্মফুলে ভরা বিল, কত অচেনা নতুন গাঁ পার হইয়া, কত মাঠের উপরকার নির্জন পথ বাহিয়া, সেই যে কোন্ গাঁয়ে পথের ধারের কামারদোকানে বাবা তাহাকে জল খাওয়াইতে লইয়া গেলে তাহারা তাহাকে বাড়ীর মধ্যে ডাকিয়া লইয়া যত্ন করিয়া পিড়ি পাতিয়া বসাইয়া দুধ, চিঁড়ে, বাতাসা খাইতে দিয়াছিল! কোন্‌টা ফেলিয়া সে কোন্‌টার গল্প করে!

রেল-রাস্তার গল্প শুনিয়া তাহার দিদি মুগ্ধ হইয়া যায়, বার বার জিজ্ঞাসা করে—কত বড় নোয়াগুনো দেখ্‌লি অপু? তার টাঙানো বুঝি? খুব লম্বা? রেলগাড়ী দেখতে পেলি? গেল?

না—রেলগাড়ী অপু দেখে নাই। ঐটাই কেবল বাদ পড়িয়াছে—সে শুধু বাবার দোষে! মোটে ঘন্টা চার পাঁচ রেল-রাস্তার ধারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেই রেলগাড়ী দেখা যাইত—কিন্তু বাবাকে সে কিছুতেই বুঝাইয়া উঠিতে পারে নাই।

খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরবেলা অপু কোথাও বাহির না হইয়া ঘরেই থাকে। অনেক দিনের জীর্ণ পুরাতন কোঠা-বাড়ীর পুরাতন ঘর। জিনিসপত্র, কাঠের সেকালের সিন্দুক, কটা রঙের সেকালের বেতের পেঁট্‌রা, কড়ির আল্‌না, জলচৌকিতে ঘর ভরানো। এমন সব বাক্স আছে যাহা অপু কখনো খুলিতে দেখে নাই, তাহাতে রক্ষিত এমন সব হাঁড়ি কলসি আছে, যাহার অভ্যন্তরস্থ দ্রব্য সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

সব শুদ্ধ মিলিয়া ঘরটিতে পুরানো জিনিসের কেমন একটা পুরানো পুরানো গন্ধ বাহির হয়—সেটা কিসের গন্ধ সে জানে না, কিন্তু সেটা যেন বহু অতীত কালের কথা মনে আনিয়া দেয়। সে অতীত দিনে সে ছিল না, কিন্তু এই কড়ির আলনা ছিল, ঐ ঠাকুরদাদার বেতের ঝাঁপিটা ছিল, ঐ বড় কাঠের সিন্দুকটা ছিল, ওই যে সোঁদালি গাছের মাথা বনের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আছে, ওই পোড়ো জঙ্গলে ভরা জায়গাটাতে কাহাদের বড় চণ্ডীমণ্ডপ ছিল, আরও কত নামের কত ছেলে-মেয়ে একদিন এই ভিটাতে খেলিয়া বেড়াইত, কোথায় তাহারা ছায়া হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে, কতকাল আগে!

যখন সে একা ঘরে থাকে, মা ঘাটে যায়—তখন তাহার অত্যন্ত লোভ হয় ঐ বাক্সটা, বেতের ঝাঁপিটা খুলিয়া দিনের আলোয় বাহির করিয়া পরীক্ষা করিয়া

দেখে কি অদ্ভুত রহস্য উহাদের মধ্যে গুপ্ত আছে। ঘরের আড়ালে সর্বোচ্চ তাকে কাঠের বড় বারকোসে যে তালপাতার পুঁথির স্তূপ ও খাতাপত্র আছে, বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছিল, সেগুলি তাহার ঠাকুরদাদা রামচাঁদ তর্কালঙ্কারের—তাহার বড় ইচ্ছা ওইগুলি যদি হাতের নাগালে ধরা দেয়, তবে সে একবার নীচে নামাইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে। এক-একদিন বনের ধারের জানালাটায় বসিয়া দুপুরবেলা সে সেই ছেঁড়া কাশীদাসের মহাভারতখানা লইয়া পড়ে, সে নিজেই খুব ভাল পড়িতে শিখিয়াছে, আগেকার মত কারো মুখে শুনিতে হয় না, নিজেই জলের মত পড়িয়া যায় ও বুঝিতে পারে। পড়াশুনায় তাহার বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ, তাহার বাবা মাঝে মাঝে তাহাকে গাঙ্গুলীবাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে বৃদ্ধদের মজ্‌লিসে লইয়া যায়, রামায়ণ কি পাঁচালী পড়িতে দিয়া বলে, পড়ো তো বাবা, একবার শুনিয়ে দাও তো! বৃদ্ধেরা খুব তারিফ করেন, দীনু চাটুয্যে বলেন—আর আমার নাতিটা এই তোমার খোকারই বয়স হবে, দু'খানা বর্ণপরিচয় ছিঁড়লে বাপু, শুনলে বিশ্বেস করবে না, এখনো ভাল করে অক্ষর চিন্‌লে না—বাপের ধারা পেয়ে বসে আছে—ঐ যে-ক'দিন আমি আছি রে বাপু, চক্ষু বুজ্‌লেই লাঙ্গলের মুঠো ধরতে হবে। পুত্রগর্বে হরিহরের বুক ভরিয়া যায়। মনে মনে. ভাবে—একি তোমাদের হবে? করলে তো চিরকাল সুদের কারবার!—হোলামই বা গরীব, হাজার হোক পণ্ডিতবংশ তো বটে, বাবা মিথ্যেই তালপাতা ভরিয়ে ফেলেন নি পুঁথি লিখে, বংশে একটা ধারা দিয়ে গিয়েছেন, সেটা যাবে কোথায়?

তাহাদের ঘরের জানালার কয়েক হাত দুরেই বাড়ীর পাঁচিল এবং পাঁচিলের ওপাশ হইতেই পাঁচিলের গা ঘেঁষিয়া কি বিশাল আগাছার জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে। জানালায় বসিয়া শুধু চোখে পড়ে সবুজ সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ভাটশেওড়া গাছের মাথাগুলা, এগাছে ওগাছে দোদুল্যমান কত রকমের লতা, প্রাচীন বাঁশ-ঝাঁড়ের শীর্ষ বয়সের ভারে যেখানে সোঁদালি, বনচালতা গাছের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহার নীচের কালো মাটির বুকে খঞ্জন পাখীর নাচ। বড় বড় গাছপালার তলায় হলুদ, বন-কচু, কটু ওলের ঘন সবুজ জঙ্গল ঠেলাঠেলি করিয়া সূর্যের আলোর দিকে মুখ ফিরাইতে প্রাণপণ করিতেছে, এই জীবনের যুদ্ধে যে গাছটা অপারগ হইয়া গর্বদৃপ্ত প্রতিবেশীর আওতায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে তাহার পাতাগুলি বিবর্ণ, মৃত্যুপাণ্ডুর ডাঁটা গলিয়া আসিল,—তাহার মরণাহত দৃষ্টির সম্মুখে শেষ-শরতের বন-ভরা পরিপূর্ণ ঝলমলে রৌদ্রে পরগাছার ফুলের আকুল আর্দ্র সুগন্ধি মাখানো পৃথিবীটা তাহার সকল সৌন্দর্য, রহস্য, বিপুলতা লইয়া ধীরে ধীরে আড়ালে মিলাইয়া চলিয়াছে।

তাহাদের বাড়ীর ধার হইতে এই বনজঙ্গল এক দিকে সেই কুঠীর মাঠ অপর দিকে নদীর ধার পর্যন্ত একটানা চলিয়াছে। অপুর কাছে এই বন অফুরন্ত ঠেকে, সে দিদির সঙ্গে কতদুর এই বনের মধ্যে তো বেড়াইয়াছে, বনের শেষ দেখিতে পায় নাই—শুধু এইরকম তিত্তিরাজ গাছের তলা দিয়া পথ, মোটা মোটা গুলঞ্চলতা দুলানো থোলো থোলো বনচালতার ফল চারিধারে। সুঁড়ি পথটা একটা আমবাগানে আসিয়া শেষ হয়, আবার এগাছের ওগাছের তলা দিয়া বনকলমী, নাটা-কাঁটা ময়না-ঝোপের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে কোথায় কোন্‌দিকে লইয়া গিয়া ফেলিতেছে, শুধু বন-ধুঁদুলের লতা কোথায় সেই ত্রিশূন্যে দোলে, প্রাচীন শিরিষ গাছের শেওলা-ধরা ডালের গায়ে পরগাছার ঝাড় নজরে আসে।

এই বন তার শ্যামলতার নবীন স্পর্শটুকু তার আর তার দিদির মনে বুলাইয়া দিয়াছিল। জন্মিয়া অবধি এই বন তাহাদের সুপরিচিত, প্রতি পলের, প্রতি মুহূর্তের নীরব আনন্দ তাহাদের পিপাসু হৃদয় কত বিচিত্র কত অপূর্ব রসে ভরিয়া তোলে। বর্ষাসতেজ, ঘনসবুজ ঝোপের মাথায় নাটা-কাঁটার সুগন্ধ ফুলের হলুদ রঙের শীষ, আসন্ন সূর্যাস্তের ছায়ায় মোটা ময়না-কাঁটা ডালের আগায় কাঠবিড়ালীর লঘুগতি আসা-যাওয়া, পত্রপুষ্পফলের সে প্রাচুর্য, সবাকার অপেক্ষা যখন ঘনবনের প্রান্তবর্তী ঝোপঝাপের সঙ্গিহীন বাঁকা ডালে বনের কোনো অজানা পাখী বসিয়া থাকে, তখন তাহার মনের সে বিচিত্র, অপূর্ব, গভীর আনন্দ-রসের বর্ণনা সে মুখে বলিয়া কাহাকেও বুঝাইতে পারে না। সে যেন স্বপ্ন, সে মায়া,—চারিপাশ ঘিরিয়া পাখী গান গায়, ফুল ঝুর করিয়া ঝরিয়া পড়ে, সূর্যাস্তের আলো আরও ঘন ছায়াময় হয়।

এই বনের মধ্যে কোথায় একটা মজা পুরানো পুকুর আছে, তারই পাড়ে যে ভাঙা মন্দিরটা আছে,—আজকাল যেমন পঞ্চানন্দ ঠাকুর গ্রামের দেবতা, কোন সময়ে ঐ মন্দিরের বিশালাক্ষী দেবী সেই রকম ছিলেন। তিনি ছিলেন গ্রামের মজুমদার বংশের প্রতিষ্ঠিত দেবতা, একসময় কি বিষয়ে সফল-মনস্কাম হইয়া তাঁহারা দেবীর মন্দিরে নরবলি দেন, তাহাতে রুষ্ট হইয়া দেবী স্বপ্নে জানাইয়া যান যে তিনি মন্দির পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, আর কখনো ফিরিবেন না। সে অনেক কালের কথা, বিশালাক্ষীর পূজা হইতে দেখিয়াছে এরূপ কোনো লোক আর জীবিত নাই, মন্দির ভাঙিয়া চুরিয়া গিয়াছে, মন্দিরের সম্মুখের পুকুর মজিয়া ডোবায় পরিণত হইয়াছে, চারিধার বনে ছাইয়া ফেলিয়াছে, মজুমদার বংশেও বাতি দিতে আর কেহ নাই।

কেবল—সেও অনেকদিন আগে—গ্রামের স্বরূপ চক্রবর্তী ভিন-গাঁ হইতে নিমন্ত্রণ খাইয়া ফিরিতেছিলেন—সন্ধ্যার সময় নদীর ঘাটে নামিয়া আসিতে পথের ধারে দেখিলেন একটি সুন্দরী ষোড়শী দাঁড়াইয়া। স্থানটি লোকালয় হইতে দূরে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, পথে কেহ কোথাও নাই, এ-সময়ে নিরালা বনের ধারে একটি অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়েকে দেখিয়া স্বরূপ দস্তুরমত বিস্মিত হইলেন। কিন্তু তিনি কোনো কথা বলিবার পূর্বেই মেয়েটি ঈষৎ-গর্বমিশ্রিত অথচ মিষ্টসুরে বলিল—আমি এ-গ্রামের বিশালাক্ষী দেবী। গ্রামে অল্পদিনে ওলাওঠার মড়ক আরম্ভ হবে—বলে দিও চতুর্দশীর রাত্রে পঞ্চানন্দ-তলায় একশ' আটটা কুমড়ো বলি দিয়ে যেন কালীপূজো করে। কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্তম্ভিত স্বরূপ চক্রবর্তীর চোখের সামনেই মেয়েটি চারিধারের শীত সন্ধ্যার কুয়াসায় ধীরে ধীরে যেন মিলাইয়া গেল। এই ঘটনার দিন কয়েক পরে সত্যই সেবার গ্রামে ভয়ানক মড়ক দেখা দিয়াছিল।

এ-সব গল্প কতবার সে শুনিয়াছে। জানালার ধারে দাঁড়াইলেই বিশালাক্ষী ঠাকুরের কথা তাহার মনে ওঠে। দেবী বিশালাক্ষীকে একটিবার দেখিতে পাওয়া যায় না? হঠাৎ সে বনের পথে হয়ত গুলঞ্চের লতা পাড়িতেছে—সেই সময়—

—তুমি কে?

—আমি অপু।

—তুমি বড় ভাল ছেলে, কি বর চাও?

সে বিছানায় গিয়া শোয়। এক-একবার ঝিরঝিরে হাওয়ায় কত কি লতাপাতার তিক্ত মধুর গন্ধ ভাসিয়া আসে, ঠিক দুপুর বেলা, অনেক দূরের কোনো বড় গাছের মাথার উপর হইতে গাঙচিল টানিয়া টানিয়া ডাকে, যেন এই ছোট্ট গ্রামখানির অতীত ও বর্তমান সমস্ত ছোটো-খাটো দুঃখ শান্তি দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে, শরৎ-মধ্যাহ্নের রৌদ্রভরা, নীল নির্জন আকাশপথে,



এক উদাস গৃহ-বিবাগী পথিক-দেবতার সুকণ্ঠের অবদান দূর হইতে দূরে মিলাইয়া চলিয়াছে।

কখন সে ঘুমাইয়া পড়ে বুঝিতে পারে না, ঘুমাইয়া উঠিয়া দেখে বেলা একেবারে নাই। জানালার বাহিরে সারা বনটায় ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে, বাঁশঝাড়ের আগায় রাঙা রোদ।

প্রতিদিন এই সময়—ঠিক এই ছায়া-ভরা বিকালটিতে, নির্জন বনের দিকে চাহিয়া তাহার অতি অদ্ভুত কথা সব মনে হয় ; অপূর্ব খুশিতে মন ভরিয়া ওঠে, মনে হয় এ-রকম লতা-পাতার মধুর-গন্ধভরা দিনগুলি ইহার আগে কবে একবার যেন আসিয়াছিল, সে-সব দিনের অনুভূত আনন্দের অস্পষ্ট স্মৃতি আসিয়া এই দিনগুলিকে ভবিষ্যতের কোন্ অনির্দিষ্ট আনন্দের আশায় ভরিয়া তোলে। মনে হয় একটা যেন কিছু ঘটিবে, এ দিনগুলি বুঝি বৃথা যাইবে না—একটা বড় কোনো আনন্দ ইহাদের শেষে অপেক্ষা করিয়া আছে যেন।

এই অপরাহ্ণগুলির সঙ্গে, আজন্মসাথী, সুপরিচিত, এই আনন্দভরা বহুরূপী বনটার সঙ্গে কত রহস্যময়, স্বপ্ন-দেশের বার্তা যে জড়ানো আছে! বাঁশঝাড়ের উপরকার ছায়া-ভরা আকাশটার দিকে চাহিয়া সে দেখিতে পায়, এক তরুণ বীরের উদারতার সুযোগ পাইয়া কে প্রার্থী একজন তাহার অক্ষয় কবচকুণ্ডল মাগিয়া লইতে হাত পাতিয়াছে, পিটুলি-গোলা পান করিয়া কোথাকার এক ক্ষুদ্র দরিদ্র বালক খেলুড়েদের কাছে 'দুধ খেয়েছি' 'দুধ খেয়েছি' বলিয়া উল্লাসে নৃত্য করে,—ঐ যে পোড়ো ভিটার বেলতলাটা—ওইখানেই তো শরশয্যাশায়িত প্রবীণ বীর ভীষ্মদেবের মরণাহত ওষ্ঠে তীক্ষ্ণবাণে পৃথিবী ফুঁড়িয়া অর্জুন ভোগবতীধারা সিঞ্চন করিয়াছিলেন। প্রথম যৌবনে সরযূতটের কুসুমিত কাননে মৃগয়া করিতে গিয়া রাজা দশরথ মৃগভ্রমে যে জল-আহরণরত দরিদ্র বালককে বধ করেন—সে ঘটিয়াছিল ওই রাণুদিদিদের বাগানের বড় জামগাছটার তলায় যে ডোবা—তাহারই ধারে।

তাহাদের বাড়ী একখানা বই আছে, পাতাগুলা সব হলদে, মলাটটার খানিকটা নাই, নাম লেখা আছে 'বীরাঙ্গনা কাব্য', কিন্তু লেখকের নাম সে জানে না, গোড়ার দিকের পাতাগুলি ছিড়িয়া গিয়াছে। বইখানা বড় ভাল লাগে—তাহাতে সে পড়িয়াছে :-

অদূরে দেখিনু হ্রদ ; সে হ্রদের তীরে
রাজরথী একজন যান গড়াগড়ি
ভগ্নউরু! কাঁদি উচ্চে উঠিনু জাগিয়া।
কেন এ কুস্বপ্ন, দেব, দেখাইলা মোরে?

কুলুইচণ্ডী ব্রতের দিন মায়ের সঙ্গে গ্রামের উত্তর মাঠে যে পুরানো, মজা পুকুরের ধারে সে বন-ভোজন করিতে যায়—কেউ জানে না—চারিধারে বনে-ঘেরা সেই ছোট্ট পুকুরটাই মহাভারতের সেই দ্বৈপায়ন হ্রদ। ঐ নির্জন মাঠের পুকুরটার মধ্যেই সেই ভগ্নউরু, অবমানিত বীর থাকে একা একা, কেউ দেখে না, কেউ খোঁজ করে না। উত্তরে মাঠের কলা-বেগুনের ক্ষেত হইতে কৃষাণেরা ফিরিয়া আসে, জনমানুষের চিহ্ন থাকে না কোন দিকে—সোনাডাঙ্গা মাঠের পারের অনাবিষ্কৃত, বসতিশূন্য, অজানা দেশে চন্দ্রহীন রাত্রির ঘন অন্ধকার ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে, তখন হাজার হাজার বছরের পুরাতন মানব-বেদনা কখনো বা দরিদ্র পিতার প্রবঞ্চনা-মুগ্ধ অবোধ বালকের উল্লাসে, কখনো বা এক ভাগ্যহত, নিঃসঙ্গ, অসহায় রাজপুত্রের ছবিতে তাহার প্রবর্ধমান, উৎসুক মনের সহানুভূতিতে জাগ্রত ও সার্থক হয়! ঐ অজ্ঞাতনামা লেখকের বইখানা পড়িতে পড়িতে কতদিন যে তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিয়াছে!

তাহার বাবা বাড়ীতে নাই। বাড়ী থাকিলে তাহাকে একমনে ঘরে বসিয়া দপ্তর খুলিয়া পড়িতে হয়। একেবারে বেলা শেষ হইয়া যায় তবু ছুটি হয় না। তাহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠে। আর কতক্ষণ বসিয়া বসিয়া শুভঙ্করীর আর্যা মুখস্থ করিবে? আজ আর বুঝি সে খেলা করিবে না? বেলা বুঝি আর আছে?

হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে ছুটি হইয়া যায়। বই-দপ্তর কোনো রকমে ঝুপ্ করিয়া এক জায়গায় ফেলিয়া রাখিয়া ছায়াভরা উঠানে গিয়া খুশিতে সে নাচিতে থাকে।

অপূর্ব, অদ্ভুত বৈকালটা...নিবিড় ছায়াভরা গাছপালার ধারে খেলা-ঘর...গুলঞ্চ-লতার 'তার টাঙানো...খেজুর ডালের ঝাঁপ...বনের দিক হইতে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা গন্ধ বাহির হয়...রাঙা রোদটুকু জেঠামশায়দের পোড়ো ভিটায় বাতাবী-লেবু গাছের মাথায় চিক্ চিক্ করে, চক্চকে বাদামী রঙের



ডানাওয়ালা তেড়ো পাখী বনকলমী ঝোপে উড়িয়া আসিয়া বসে···তাজা মাটির গন্ধ···ছেলেমানুষের জগৎ ভরপুর আনন্দে উছলিয়া উঠে, কাহাকে সে কি করিয়া বুঝাইবে সে কি আনন্দ !

সন্ধ্যার পর সর্বজয়া ভাত চড়াইয়াছিল। অপু দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া আছে। খুব অন্ধকার, একটানা ঝিঁঝি-পোকা ডাকিতেছে।

অপু জিজ্ঞাসা করিল—পূজোর আর ক'দিন আছে মা ?

দুর্গা বঁটি পাতিয়া তরকারী কুটিতেছিল। বলিল, আর বাইশ দিন আছে, না মা ?

সে হিসাব ঠিক করিয়াছে। তাহার বাবা বাড়ী আসিবে, অপুর, মায়ের, তাহার জন্য পুতুল, কাপড়, আলতা আনিবে।

আজকাল সে বড় হইয়াছে বলিয়া তাহার মা অন্য পাড়ায় গিয়া নিমন্ত্রণ খাইতে দেয় না। লুচি খাইতে কেমন, তাহা সে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে। ফুট্‌ফুটে কোজাগরী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাভরা রাত্রে বাঁশবনের আলোছায়ার জালবুনানি পথ বহিয়া সে আগে পাড়ায় পাড়ায় বেড়াইয়া লক্ষ্মীপূজোর খই-মুড়ি-ভাজা আঁচল ভরিয়া লইয়া আসিত, বাড়ীতে, বাড়ীতে শাঁখ বাজে, পথে লুচি-ভাজার গন্ধ বাহির হয়, হয়তো পাড়ার কেউ পূজার শীতলের নৈবেদ্য একখানা তাহাদের বাড়ীতে পাঠাইয়া দেয়, সেও অনেক খই-মুড়ি আনিত, তাহার মা দুইদিন ধরিয়া তাহাদের জলপান খাইতে দিত, নিজেও খাইত। সেবার সেজ ঠাকরুণ বলিয়াছিল—ভদ্দর লোকের মেয়ে আবার ছোটলোকের মত বাড়ী বাড়ী ঘুরে খই-মুড়ি নিয়ে বেড়াবে কি ? ওসব দেখতে খারাপ···ওরকম আর পাঠিও না বৌমা—সেই হইতে সে আর যায় না।

দুর্গা বলিল—তাস খেল্‌বে ?

—তা যা, ও-ঘর থেকে তাসটা নিয়ে আয় একটু খেলি—দুর্গা বিপন্নমুখে অপুর দিকে চাহিল। অপু হাসিয়া বলিল—চল্‌ আমি দাঁড়াচ্চি—

তাহাদের মা বলিল—আহা হা, মেয়ের ভয় দেখে আর বাঁচি নে, সারাদিন বলে হেঁট মাটি ওপর করে বেড়াবার সময় ভয় থাকে না আর রাত্রিতে এ-ঘর থেকে ও-ঘর যেতে একেবারে সব আড়ষ্ট !···

শিষ্যবাড়ী হইতে অপুর আনা সেই তাসজোড়াটা। তাসখেলায় তিনজনেরই কৃতিত্ব সমান। অপু এখনও সব রঙ চেনে না—মাঝে মাঝে হাতের তাস বিপক্ষদলের খেলোয়াড় মাকে দেখাইয়া বলে, এটা কি রঙ, রুইতন ? দ্যাখো না মা—

দুর্গার মন আজ খুব খুসি আছে। রাত্রিতে রান্না প্রায়ই হয় না, ও-বেলার বাসি ভাত তরকারী থাকে। আজ ভাত চড়িয়াছে, তরকারী রান্না হইবে, ইহাতে তাহার মহা আনন্দ। আজ যেন একটা উৎসবের দিন। অপু বলে—তাস খেল্‌তে খেল্‌তে সেই গল্পটা

বলো না মা, সেই শ্যামলঙ্কার গল্পটা।

হঠাৎ সে মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়ে। মায়ের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে আবদারের সুরে বলে—সেই ছড়াটা বলো না মা, সেই—শ্যামলঙ্কা বাটনা বাটে মাটিতে লুটায় কেশ। দুর্গা বলে—খেলার সময় ছড়া বললে খেলা কি করে হবে অপু? ওঠ—

সর্বজয়া বলিল, দুগ্‌গা, পাতালকোঁড় আজ কোথায় পেলি রে?

—সেই যে গোঁসাইদের বড় বাগানটা আছে! অপু, সেই রাঙী গাই খুঁজতে একবার তুই আর আমি···সেখানে অনেক ফুটেছিল, কেউ টের পায়নি মা, খুব বন কি না! তা হোলে লোকে তুলে নিয়ে যেতো—

অপু বলিল, সেখানে গিইছিলি? উঃ, সে যে বড্ড বন রে দিদি! সর্বজয়া সস্নেহে বারবার ছেলের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। সেদিনকার সেই অপু—আয় চাঁদ, আয় চাঁদ, খোকনের কপালে টি-ই-ই-ই দিয়ে যা—বলিলে বারবার কলের পুতুলের মত চাঁদের মত কপালখানি অঙ্গুলিবদ্ধ হস্তের দিকে ঝাঁকাইয়া দিত, সে কি না আজ তাস খেলিতে বসিয়াছে! তাহার কাছে দৃশ্যটা বড় অভিনব ঠেকে। অপু খেলিতে না পারিলে বা আশা করিয়া কোনো পিট জিতিতে না পারিলে কিংবা অপুর হাতে খারাপ তাসগুলা দিয়া নিজের হাতে ভাল তাস আসিলে, বিপক্ষদলের খেলোয়াড় হইয়াও তাহার মনে কষ্ট হইতেছিল।

দুর্গা বলিল—আজ কি হয়েছে জানো মা—

অপু বলিল—যাঃ, তা হলে তোর সঙ্গে আড়ি করবো, বোলে দ্যাখ—

—করগে যা আড়ি—শোনো মা, ও পোস্তদানার নাম জানে না, আজ রাজীদের বাড়ী পোস্তদানা রোদ্দুরে দিয়েছে, ও বল্লে, কি রাজীদি? রাজী বল্লে, যষ্টিমধু, খেয়ে দ্যাখ্—ও খেয়ে এল মা সেখানে দাঁড়িয়ে, বুঝতেও্ পারলে না যে পোস্ত—এমন বোকা—না মা?

অপু মুখে বলিল বটে, কিন্তু দিদির সহিত সে আড়ি করিবে না। সেই যে যেদিন তাহার পাকা মাকাল ফলগুলা সতুদা লইয়া পলাইয়াছিল, সেদিন তাহার দিদি সারাদিন বন বাগান খুঁজিয়া সন্ধ্যার সময় কোথা হইতে আঁচলে বাঁধিয়া একরাশ মাকাল ফল আনিয়া তাহার সম্মুখে খুলিয়া দেখাইয়া বলিয়াছিল—কেমন, হলো এখন? বড্ড যে কাঁদ্‌ছিলি সকালবেলা? সে-সন্ধ্যায় কিসে সে বেশী আনন্দ পাইয়াছিল—মাকাল ফলগুলা হইতে, কি দিদির মুখের, বিশেষ করিয়া তাহার ডাগর চোখের মমতাভরা স্নিগ্ধ হাসি হইতে—তাহা সে জানে না।

ছক্কার খেলা অপু, বুঝেসুঝে খেলিস—দুর্গা মহাখুসির সহিত তাস কুড়াইয়া সাজাইতে লাগিল।···

—কি ফুলের গন্ধ বেরুচ্চে, না দিদি?

তাহাদের মা বলিল, তাহাদের জেঠামশায়দের ভিটার পিছনে ছাতিম গাছ আছে, সেই ফুলের গন্ধ। অপু ও দুর্গা দু'জনেই আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ মা, ওই ছাতিমতলায় একবার বাঘ এসেছিল বলেছিলে না? কিন্তু তাহার মা তাড়াতাড়ি তাস ফেলিয়া উঠিয়া বলিল—ঐ যাঃ, ভাত পুড়ে গেল, ধরাগন্ধ বেরিয়েছে—ভাতটা নামিয়ে দাঁড়া বল্‌চি—

খাইতে বসিয়া দুর্গা বলিল—পাতালকোঁড়ের তরকারীটা কি সুন্দর খেতে হয়েছে মা? তাহার মুখ স্বর্গীয় তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে অপুও বলিল—বাঃ! খেতে ঠিক মাংসের মত, না দিদি? পাতালকোঁড় এক জায়গায় কত ফুটে আছে মা, আমি ভাবি ব্যাঙের ছাতা, তাই তুলি নে—উভয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা-বাক্যে সর্বজয়ার বুক গর্বে ও তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। তবুও কি আর উপযুক্ত উপকরণ সে পাইয়াছে? লোকের বাড়িতে ভোজে রাঁধিতে ডাকে সেজ ঠাক্‌রুণকে, ডাকুক না দেখি একবার তাহাকে, রান্না কাহাকে বলে সেজ ঠাকরুণকে সে—হুঁ। সর্বজয়া বলিল—অপুর হাতে জল ঢেলে দে দুগ্‌গা, ওকি ছেলের কাণ্ড? ঐ রাস্তার মাঝখানে মুখ ধোয়?···

কিন্তু অপু আর এক পাও নড়িতে চাহে না, সম্মুখে সেই ভাঙা পাঁচিলের ফাঁক, অন্ধকার বাঁশবন, ঝোপ-জঙ্গলের অন্ধকার, ঝিঙের বীচির মতো কালো। পোড়ো ভিটেবাড়ী···আরও অজানা কত কি বিভীষিকা! সে বুঝিতে পারে না, যেখানে প্রাণ লইয়া টানাটানি সেখানে পথের উপর আঁচানোটাই কি এত বেশী?

তাহার পরে সকলে গিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। রাত্রি গভীর হয়, ছাতিম ফুলের উগ্র সুবাসে হেমন্তের

আঁচ-লাগা শিশিরার্দ্র নৈশ বায়ু ভরিয়া যায়। মধ্য রাত্রে বেণুবনশীর্ষে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের ম্লান জ্যোৎস্না উঠিয়া শিশিরসিক্ত গাছপালায় ডালে-পাতায় চিক্‌চিক্ করে। আলো-আঁধারের অপরূপ মায়ায় বনপ্রান্ত ঘুমন্ত পরীর দেশের মত রহস্য-ভরা। শন্ শন্ করিয়া হঠাৎ হয়তো এক ঝলক হাওয়া সোঁদালির ডাল দুলাইয়া, তেলাকুচা ঝোপের মাথা কাঁপাইয়া বহিয়া যায়।



এক একদিন এই সময় অপুর ঘুম ভাঙিয়া যাইত।

সেই দেবী যেন আসিয়াছেন, সেই গ্রামের বিস্মৃতা অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিশালাক্ষী!

পুলিনাশালিনী ইছামতীর ডালিমের রোঁয়ার মত স্বচ্ছ জলের ধারে, কুঁচা-শেওলা-ভরা ঠাণ্ডা কাদায় কতদিন আগে যাহাদের চরণ-চিহ্ন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তীরের প্রাচীন সপ্তপর্ণটাও হয়তো যাহাদের দেখে নাই, পুরানো কালের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দিরে তাহারাই এক সময়ে ফুলফল-নৈবেদ্যে পূজা দিত,—আজকালকার লোকেরা কে তাঁহাকে জানে?

তিনি কিন্তু এ গ্রামকে এখনো ভোলেন নাই।

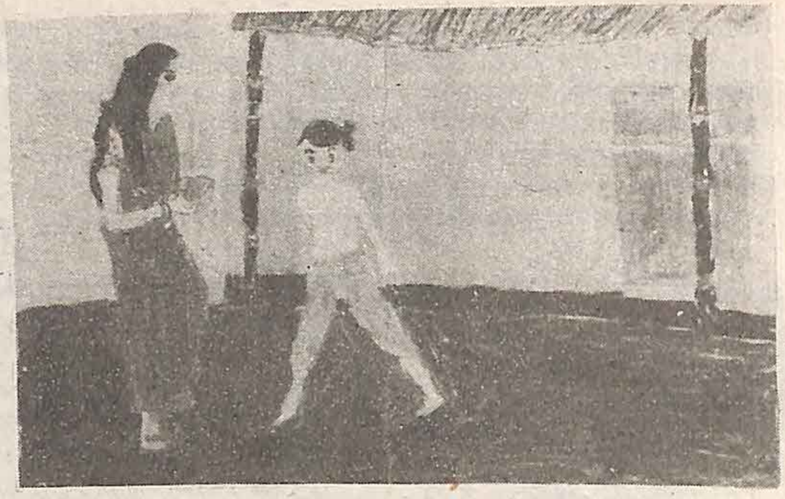
গ্রাম নিশুতি হইয়া গেলে অনেক রাত্রে তিনি বনে বনে ফুল ফুটাইয়া বেড়ান, বিহঙ্গশিশুদের দেখা-শুনা করেন, জ্যোৎস্না-রাত্রের শেষ প্রহরে ছোট্ট ছোট্ট মৌমাছিদের চাকগুলি বুনো ভাঁওরা, নটকান, পুঁয়ো ফুলের মিষ্ট মধুতে ভরাইয়া দেন।

তিনি জানেন, কোন্ ঝোপের কোণে বাসক ফুলের মাথা লুকাইয়া আছে, নিভৃত বনের মধ্যে ছাতিম ফুলের দল কোথায় গাছের ছায়ায় শুইয়া, ইছামতীর কোন্ বাঁকে সবুজ শেওলার ফাঁকে ফাঁকে নীলপাপ্‌ড়ি কলমীফুলের দল ভিড় পাকাইয়া তুলিতেছে, কাঁটা গাছের ডাল-পালার মধ্যে ছোট্ট খড়ের বাসায় টুনটুনি পাখীর ছেলেমেয়েরা কোথায় ঘুম ভাঙিয়া উঠিত।

তাঁর রূপের স্নিগ্ধ আলোয় বন যেন ভরিয়া গিয়াছে। নীরবতায়, জ্যোৎস্নায়, সুগন্ধে অস্পষ্ট আলো-আঁধারের মায়ায় রাত্রির অপরূপ শ্রী।

দিনের আলো ফুটিবার আগেই কিন্তু বনলক্ষ্মী কোথায় মিলাইয়া যায়, স্বরূপ চক্রবর্তীর পর আর তাঁহাকে কেহ কোনদিন দেখে নাই।

১০



সেদিন বাহির হইতে ঘুরিয়া আসিয়া বাড়ী ঢুকিয়াই অপু দুর্গাকে বলিল, দিদি, শিউলিতলায় গুঁড়ির কাছে আমি একটা বাঁকা কঞ্চি রেখে গিইচি, আর তুই বুঝি সেটাকে ভেঙে দু'খণ্ড করে রেখেচিস ?

দুর্গা সেখানাকে ভাঙিয়াছিল ঠিকই। বলিল—আহা, ভারী তো একখানা বাঁকা কঞ্চি !...তোর যত পাগলামি—বাঁশবাগান খুঁজ্‌লে কঞ্চি তো আর মিল্‌বে না ? কঞ্চির ভারী অমিল্ কি না !

অপু লজ্জিত মুখে বলিল—অমিল কি না তুই এনে দে দিকি ওই রকম একখানি কঞ্চি ! আমি কত খুঁজে পেতে নিয়ে আস্‌বো তুই ভেঙে রেখে দিবি ? বেশ তো—

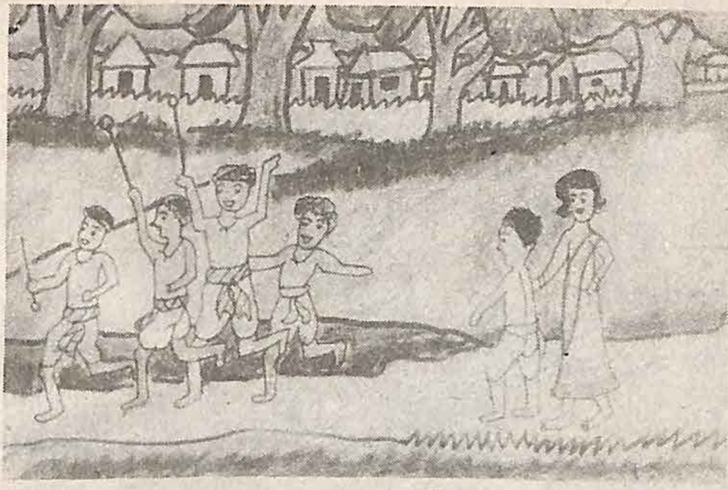
তার চোখে জল আসিয়া গেল।

দুর্গা বলিল—দেবো এখন এনে যত চাস্—এর আবার কান্না কি ?

বাঁকা কঞ্চি অপুর জীবনে এক অদ্ভুত জিনিস। একখানা শুক্‌নো হাল্‌কা, গোড়ার দিক মোটা, আগার দিক সরু বাঁকা কঞ্চি হাতে করিলেই অপুর মন পুলকে শিহরিয়া ওঠে, মনে অদ্ভুত সব কল্পনা জাগে। একখানা বাঁকা কঞ্চি হাতে করিয়া এক-একদিন সে সারা সকাল কি বৈকাল আপন মনে বাঁশবনের পথে কি নদীর ধারে বেড়াইয়া বেড়ায় ও নিজেকে কখনো রূপকথার রাজপুত্র, কখনো তামাকের দোকানী, কখনো ভ্রমণকারী, কখনো বা সেনাপতি, কখনো মহাভারতের অর্জুন বলিয়া কল্পনা করে ও আপন মনে বিড় বিড় করিয়া কাল্পনিক ঘটনা—যাহা ওই অবস্থায় তাহার জীবনে ঘটিলে তাহার আনন্দ হইত—সেই সব ঘটনা বলিয়া যায়। কঞ্চি যত মনের মত হাল্‌কা হইবে ও পরিমাণ মত বাঁকা হইবে, তাহার আনন্দ ও কল্পনা ততই পরিপূর্ণতা লাভ করে—কিন্তু সে রকম কঞ্চি সংগ্রহ করা যে কত শক্ত, অপু তাহা বোঝে। কত খুঁজিয়া তবে একখানা মেলে।

অপু যে বাঁকা কঞ্চি হাতে এরকম করিয়া বেড়ায়, একথা কেউ না শুনিতে পায় অপুর সেদিকে অত্যন্ত চেষ্টা। এরূপ অবস্থায় লোকে তাহাকে আপন মনে বকিতে দেখিলে পাগল ভাবিবে কি কি মনে করিবে—এ-লজ্জায় সে পারতপক্ষে জনসমাগমপূর্ণ স্থানে বা যেদিকে কেহ হঠাৎ আসিয়া পড়িতে পারে সে-সব দিকে না গিয়া নদীর ধারে, নির্জন বাঁশবনের পথে, নিজেদের বাড়ীর পিছনে তেঁতুলতলায় ঘোরে। এ-অবস্থায় তাহাকে কেহ না দেখে, সেদিকে সে অত্যন্ত সতর্ক। হঠাৎ যদি কেহ আসিয়া পড়ে, তখনি সে হাতের কঞ্চিখানা ফেলিয়া দেয়—যদি কেহ কিছু ভাবে এজন্য তার ভারী লজ্জা।

কেবল জানে তার দিদি। দিদি তাহাকে এ-অবস্থায় দেখিয়া ফেলিয়াছিল—দিদির কাছে আর লুকাইয়া কি হইবে, তাই সে বাঁকা কঞ্চির কথা



দিদিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। অন্য লোক হইলে লজ্জায় অপু কখনই একথার উল্লেখ করিতে পারিত না, যদিও কেহই জানে না অপুর সহিত বাঁকা কঞ্চির কি রহস্যময় সম্পর্ক—তবুও অপুর মনে হয় সকলেই সেকথা জানে, বলিলেই সকলে তাহাকে পাগল বলিবে, ঠাট্টা করিবে।

কে বুঝিবে একখানা বাঁকা কঞ্চি হাতে পাইলে সে না খাইয়া-দাইয়া নদীর ধারে কি কোনো জনহীন বনের পথে কি অপূর্ব আনন্দেই সারাদিন একা একা কাটাইয়া দিতে পারে!

দিদিকে অনুরোধ করিয়াছিল, মাকে যেন এসব বলিস্‌নে দিদি!...দুর্গা বলে নাই। সে জানে, অপু—ওটা একটা পাগল। ভারী মমতা হয় ওর ওপর, ছোট্ট বোকা ভাইটা!...মাকে বলিয়া আর কি হইবে

১১



অপু কাউকে একথা এখনো বলে নাই—তাহার দিদিকেও না।

সেদিন চুপি চুপি দুপুরে সে যখন তাহার বাবার ঐ বই-বোঝাই কাঠের সিন্দুকটা লুকাইয়া খুলিয়াছিল, সিন্দুকটার মধ্যের একখানা বইয়ের মধ্যেই এই অদ্ভুত কথাটার সন্ধান পাইয়াছে।

উঠানের উপর বাঁশঝাড়ের ছায়া তখনও পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ হয় নাই, ঠিক দুপুরে সোনাডাঙ্গার তেপান্তর মাঠের সেই প্রাচীন অশ্বত্থ গাছের ছায়ার মত এক জায়গায় একরাশ ছায়া জমাট বাঁধিয়া ছিল।

একদিন সে দুপুরবেলা বাবার অনুপস্থিতিতে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া চুপি চুপি বইয়ের বাক্সটা লুকাইয়া খুলিল। অধীর আগ্রহের সহিত সে এ-বই ও-বই খুলিয়া খানিকটা করিয়া ছবি দেখিতে এবং খানিকটা করিয়া বইয়ের মধ্যে ভাল গল্প লেখা আছে কি না দেখিতে লাগিল। একখানা বইয়ের মলাট খুলিয়া দেখিল, নাম লেখা আছে 'সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ'। ইহার অর্থ কি বা বইখানা কোন্ বিষয়ের তাহা সে বিন্দুবিসর্গও বুঝিল না। বইখানা খুলিতেই একদল কাগজ-কাটা পোকা নিঃশব্দে বিবর্ণ মার্বেল কাগজের নীচ হইতে বাহির হইয়া উর্ধ্বশ্বাসে যেদিকে দুই চোখ যায় দৌড় দিল। অপু বইখানা নাকের কাছে লইয়া গিয়া ঘ্রাণ লইল, কেমন পুরানো পুরানো গন্ধ। মেটে রঙের পুরু পুরু পাতাগুলার এই গন্ধটা তাহার বড় ভাল লাগে। যখনই এ-গন্ধ সে পায় তখনই কি জানি কেন তাহার বাবার কথা মনে পড়ে!

অত্যন্ত পুরানো মার্বেল কাগজের বাঁধাই-করা মলাটের নানাস্থানে চটা উঠিয়া গিয়াছে। এইরকম বইয়ের উপরই তাহার প্রধান মোহ। সেইজন্য সে বইখানা বালিশের তলায় লুকাইয়া রাখিয়া অন্যান্য বই তুলিয়া বাক্স বন্ধ করিয়া দিল।

লুকাইয়া পড়িতে পড়িতে এই বইখানিতেই একদিন সে পড়িল বড় অদ্ভুত কথাটা। হঠাৎ শুনিলে মানুষ আশ্চর্য হইয়া যায় বটে—কিন্তু ছাপার অক্ষরে বইখানার মধ্যে এ-কথা লেখা আছে, সে পড়িয়া দেখিল। পারদের গুণ বর্ণনা করিতে করিতে লেখক লিখিয়াছেন—শকুনির ডিমের মধ্যে পারদ পুরিয়া কয়েকদিন রৌদ্রে রাখিতে হয়, পরে সেই ডিম মুখের ভিতর পুরিয়া মানুষ ইচ্ছা করিলে শূন্যমার্গে বিচরণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়!

অপু নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না,—আবার পড়িল—আবার পড়িল।

পরে নিজের ডালাভাঙা বাক্সটার মধ্যে বইখানা লুকাইয়া রাখিয়া দিয়া কথাটা ভাবিতে ভাবিতে সে অবাক হইয়া গেল।

দিদিকে জিজ্ঞাসা করে—শকুনিরা বাসা বাঁধে কোথায় জানিস্ দিদি?

তাহার দিদি বলিতে পারে না। সে পাড়ার

ছেলেদের সতু, নীলু, কিনু, পটল, নেড়া—সকলকে জিজ্ঞাসা করে। কেউ বলে, সে এখানে নয় ; উত্তর মাঠে উঁচু গাছের মাথায়। তাহার মা বকে—এই দুপুরবেলা কোথায় ঘুরে বেড়াস্ ! অপু ঘরে ঢুকিয়া শুইবার ভান করে, বইখানা খুলিয়া সেই জায়গাটা আবার পড়িয়া দেখে—আশ্চর্য ! এত সহজে উড়িবার উপায়টা কেউ জানে না ! হয়তো এই বইখানা আর কাহারও বাড়ী নাই, শুধু তাহার বাবারই আছে ; হয়তো এই জায়গাটা আর কেহ পড়িয়া দেখে নাই, শুধু তাহারই চোখে পড়িয়াছে এতদিনে !

বইখানার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া আবার সে আঘ্রাণ লয়—সেই পুরানো গন্ধটা ! এই বইয়ে যাহা আছে, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে তাহার মনে আর কোন অবিশ্বাস থাকে না।

পারদের জন্য ভাবনা নাই—পারদ মানে পারা সে জানে। আয়নার পেছনে পারা মাখানো থাকে, একখানা ভাঙ্গা আয়না বাড়ীতে আছে, উহা যোগাড় করিতে পারিবে এখন।—কিন্তু শকুনির ডিম এখন সে কোথায় পায় ?

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে একদিন তাহার দিদি ডাকে—আয় শোন্ অপু, মজা দেখবি আয় ! পরে সে একমুঠা পাতের ভাত লইয়া বাড়ীর খিড়কীদোরের বাঁশবাগানে গিয়া হাঁক দেয়—আয় ভুলো, তু-উ-উ-উ। ডাক দিয়াই দুর্গা ভাইয়ের দিকে চাহিয়া হাসি হাসি মুখে চুপ করিয়া থাকে—যেন কি এক অপূর্ব রহস্য-পুরীর দুয়ার এখনই তাহাদের চোখের সামনে খুলিয়া যাইবে ! হঠাৎ কোথা হইতে কুকুরটা আসিয়া পড়িতেই দুর্গা হাত তুলিয়া বলিয়া উঠে—ওই এসেচে ! কোত্থেকে এলো দেখ্লি ? খুসিতে সে হি হি করিয়া হাসে।

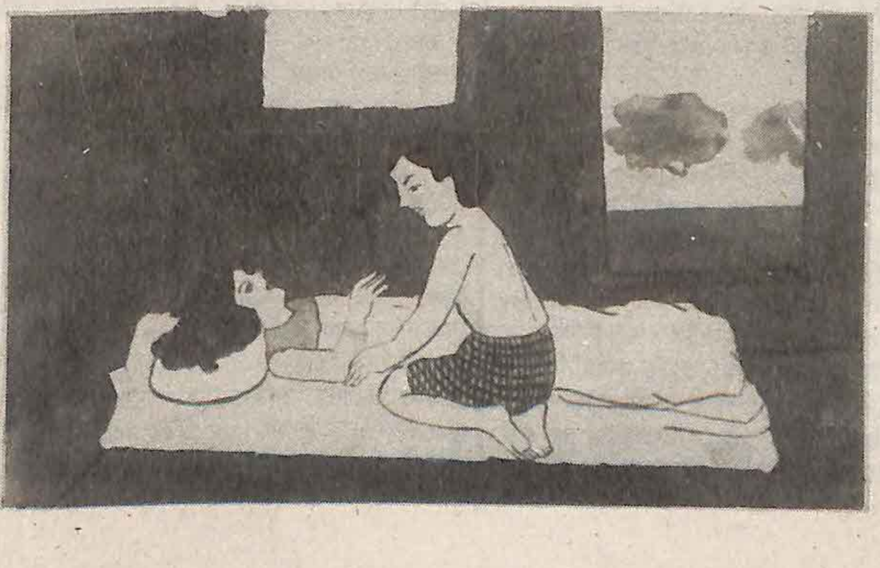
রোজ রোজ এই কুকুরকে ভাত খাওয়ানোর ব্যাপারে দুর্গার আমোদ হয় ভারী।—তুমি হাঁক দেও, কেউ কোথাও নাই, চারিদিক চুপচাপ !...ভাত মাটিতে নামাইয়া দুর্গা চোখ বুজিয়া থাকে ; আশা ও কৌতূহলের ব্যাকুলতায় বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করে ; মনে ভাবে—আজ ভুলো আস্‌বে না বোধ হয়, দেখি দিকি কোত্থেকে আসে ! আজ কি আর শুন্‌তে পেয়েচে !

হঠাৎ ঘনঝোপে একটা শব্দ ওঠে—

চক্ষের নিমেষে বনজঙ্গলের লতাপাতা ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ভুলো কোথা হইতে নক্ষত্রবেগে আসিয়া হাজির।

অমনি দুর্গার সমস্ত গা দিয়া যেন একটা কিসের স্রোত বহিয়া যায়। বিস্ময় ও কৌতুকে তাহার মুখ উজ্জ্বল দেখায় ! মনে মনে ভাবে—ঠিকই শুনতে পায় তো, আসে কোত্থেকে ! আচ্ছা কাল একটু চুপি চুপি ডেকে দেখবো দিকি, তাও শুন্‌তে পাবে ?

এই আমোদ উপভোগ করিতে সে মায়ের বকুনি



সহ্য করিয়াও রোজ খাইবার সময় নিজে বরং কিছু কম খাইয়াও কুকুরের জন্য কিছু ভাত পাতে সঞ্চয় করিয়া রাখে।

অপু কিন্তু দিদির কুকুর ডাকিবার মধ্যে কি আমোদ আছে তাহা খুঁজিয়া পায় না। দিদির ও-সব মেয়েলি ব্যাপারের মধ্যে সে নাই। অধীর আগ্রহে ভোজনরত শীর্ণ কুকুরটার দিকে সে চাহিয়াও দেখে না, শুধু শকুনির ডিমের কথা ভাবে।

অবশেষে সন্ধান মিলিল। হীরু নাপিতের কাঁঠালতলায় রাখালেরা গরু বাঁধিয়া গৃহস্থের বাড়ীর তেল-তামাক আনিতে যায়। অপু গিয়া তাহাদের পাড়ার রাখালকে বলিল—তোরা কত মাঠে মাঠে বেড়াস, শকুনির বাসা দেখতে পাস? আমায় যদি একটা শকুনির ডিম এনে দিস আমি দুটো পয়সা দেবো।

দিন চারেক পরেই রাখাল তাহাদের বাড়ীর সামনে আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া কোমরের থলি হইতে দুইটা কালো রঙের ছোট ছোট ডিম বাহির করিয়া বলিল—এই দ্যাখো ঠাকুর, এনিচি। অপু তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া বলিল, দেখি! পরে আহ্লাদের সহিত উল্টাইতে উল্টাইতে বলিল—শকুনির ডিম!. ঠিক তো? রাখাল সে সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ উত্থাপিত করিল। উহা শকুনির ডিম কি না এসম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নাই, সে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া কোথাকার কোন্ উঁচু গাছের মগ্‌ডাল হইতে ইহা সংগ্রহ- করিয়া আনিয়াছে—কিন্তু দুই আনার কমে দিবে না।

পারিশ্রমিক শুনিয়া অপু অন্ধকার দেখিল। বলিল, দুটো পয়সা দেবো, আর আমার কড়িগুলো নিবি? সব দিয়ে দেবো, এক টিনের ঠোঙা কড়ি—সব। এই এত বড় বড় সোনাগেঁটে—দেখবি, দেখাবো?

রাখালকে সাংসারিক বিষয়ে অপুর অপেক্ষা অনেক হুঁসিয়ার বলিয়া মনে হইল; সে নগদ পয়সা ছাড়া কোন রকমেই রাজি হয় না। অনেক দরদস্তুরের পর আসিয়া চার পয়সায় দাঁড়াইল। অপু দিদির কাছে চাহিয়া চিন্তিয়া দু'টা পয়সা যোগাড় করিয়া তাহাকে চুকাইয়া দিয়া ডিম দু'টি লইল। তাহা ছাড়া রাখাল কিছু কড়িও লইল। এই কড়িগুলা অপুর প্রাণ, অর্দ্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যার বিনিময়েও সে এই কড়ি কখনো হাতছাড়া করিত না অন্য সময়; কিন্তু আকাশে উড়িবার আমোদের কাছে কি আর বেগুনবীচি-খেলা!

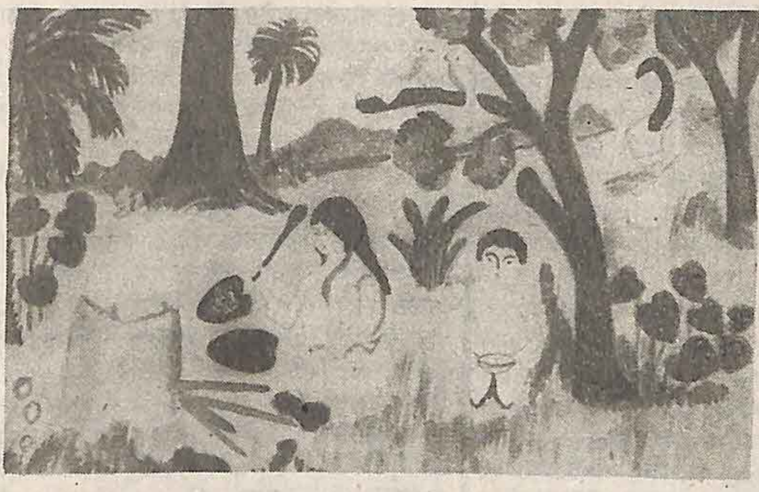
ডিমটা হাতে করিয়া তাহার মনটা যেন ফুঁ-দেওয়া রবারের বেলুনের মত হাল্‌কা হইয়া ফুলিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে যেন একটু সন্দেহের ছায়া তাহার মনে আসিয়া পৌঁছিল, এইটুকু এতক্ষণ ছিল না; ডিম হাতে পাওয়ার পর হইতে যেন কোথা হইতে ওটুকু দেখা দিল খুব অস্পষ্ট। সন্ধ্যার আগে আপনমনে নেড়াদের জামগাছের কাটা গুঁড়ির উপর বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল, সত্যি সত্যি উড়া যাইবে তো! সে উড়িয়া কোথায় যাইবে? মামার বাড়ীর দেশে? বাবা যেখানে আছে সেখানে? নদীর ওপারে? শালিক পাখী ময়না পাখীর মত, ও-ই আকাশের গায়ে তারাটা যেখানে উঠিয়াছে?

সেই দিনই, কি তাহার পরদিন। সন্ধ্যার একটু আগে দুর্গা সলিতার জন্য ছেঁড়া নেকড়া খুঁজতেছিল। তাকের হাঁড়ি-কলসির পাশে গোঁজা পাকাইবার ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড়ের টুকরার তাল হাতড়াইতে কি যেন ঠক্ করিয়া তাহার পিছন হইতে গড়াইয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেল। ঘরের ভিতর অন্ধকার, ভাল দেখা যায় না, দুর্গা মেঝে হইতে উঠাইয়া লইয়া বাহিরে আসিয়া বলিল—ওমা, কিসের দুটো বড় বড় ডিম এখানে! এঃ, পড়ে একেবারে গুঁড়ো হয়ে গিয়েচে—দেখচো মা কি পাখী ডিম পেড়েচে ঘরের মধ্যে!

তাহার পর কি ঘটিল, সে-কথা না তোলাই ভালো। অপু সমস্ত দিন খাইল না…কান্না…হৈ হৈ কাণ্ড। তাহার মা ঘাটে গল্প করে—ছেলেটার যে কি কাণ্ড, ওমা এমন কথা তো কখনো শুনিনি—শুনেচো সেজ ঠাকুরঝি, শকুনির ডিম নিয়ে নাকি মানুষে উড়তে পারে—ওই ওদের বাড়ীর রাখাল ছোড়াটা, বদ্‌মায়েসের ধাড়ি! তাকে বুঝি বলেচে, সে কোত্থেকে দুটো কাগের না কিসের ডিম এনে বলেচে—এই নাও শকুনির ডিম! ছেলেটা যে কি বোকা সে আর তোমার কাছে কি বলবো সেজ ঠাকুরঝি—কি করি যে এ ছেলে নিয়ে আমি?

কিন্তু বেচারী সর্বজয়া কি করিয়া জানিবে? সকলেই তো কিছু 'সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ' পড়ে নাই, বা সকলেই কিছু পারদের গুণও জানে না।

আকাশে তাহা হইলে তো সকলেই উড়িত!



১২

অনেকদিন হইতে গ্রামের বৃদ্ধ নরোত্তম দাস বাবাজির সঙ্গে অপুর বড় ভাব। গাঙ্গুলীপাড়ার গৌরবর্ণ, দিব্যকান্তি, সদানন্দ বৃদ্ধ সামান্য খড়ের ঘরে বাস করেন। বিশেষ গোলমাল ভালবাসেন না, প্রায়ই নির্জনে থাকেন, সন্ধ্যার পর মাঝে মাঝে গাঙ্গুলীদের চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া বসেন। অপুর বাল্যকাল হইতেই হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া মাঝে মাঝে নরোত্তম দাসের কাছে লইয়া যাইত—সেই হইতেই দু'জনের মধ্যে খুব ভাব। মাঝে মাঝে অপু গিয়া বৃদ্ধের নিকট হাজির হয়, ডাক দেয়,—দাদু আছো? বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া তালপাতার চাটাইখানা দাওয়ায় পাতিয়া দিয়া বলেন—এসো দাদাভাই এসো, বসো বসো—

অন্যস্থানে অপু মুখচোরা, মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না—কিন্তু এই সরল শান্তদর্শন বৃদ্ধের সঙ্গে সে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে মিশিয়া থাকে, বৃদ্ধের সঙ্গে তাহার আলাপ, খেলার সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপের মত ঘনিষ্ঠ, বাধাহীন ও উল্লাস-ভরা। নরোত্তম দাসের কেহ নাই, বৃদ্ধ একাই থাকেন—এক স্বজাতীয় বৈষ্ণবের মেয়ে কাজকর্ম করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। অনেক সময় সারা বিকাল ধরিয়া অপু বসিয়া বসিয়া গল্প শোনে ও গল্প করে। একথা সে জানে যে, নরোত্তম দাস বাবাজি তাহার বাবার অপেক্ষাও বয়সে অনেক বড়, অন্নদা রায়ের অপেক্ষাও বড়—কিন্তু এই বয়োবৃদ্ধতার জন্যই অপুর কেমন যেন মনে হয় বৃদ্ধ তার সতীর্থ, এখানে আসিলে তাহার সকল সঙ্কোচ, সকল লজ্জা আপনা হইতেই ঘুচিয়া যায়। গল্প করিতে করিতে অপু মন খুলিয়া হাসে, এমন সব কথা বলে যাহা অন্যস্থানে সে ভয়ে বলিতে পারে না, পাছে প্রবীণ লোকেরা কেহ ধমক দিয়া 'জ্যাঠা ছেলে' বলে; নরোত্তম দাস বলেন—দাদু, তুমি আমার গৌর, তোমাকে দেখলে আমার মনে হয় দাদু, আমার গৌর তোমার বয়সে ঠিক তোমার মতই সুন্দর, সুশ্রী, নিষ্পাপ ছিলেন—ওই রকম ভাব-মাখানো চোখ ছিল তাঁরও—

অন্যস্থানে এ-কথায় অপুর হয়তো লজ্জা হইত, এখানে সে হাসিয়া বলে—দাদু, তা হোলে এবার তুমি আমায় সেই বইখানার ছবি দেখাও।

বৃদ্ধ ঘর হইতে 'প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা'-খানা বাহির করিয়া আনেন। তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় গ্রন্থ, নির্জনে পড়িতে পড়িতে তিনি মুগ্ধ বিভোর হইয়া থাকেন। ছবি মোটে দু'খানি, দেখানো শেষ হইয়া গেলে বৃদ্ধ বলেন, আমি মরবার সময়ে বইখানা তোমাকে দিয়ে যাবো দাদু, তোমার হাতে বইয়ের অপমান হবে না—

তাঁহার এক শিষ্য মাঝে মাঝে পদ রচনা করিয়া তাঁহাকে শুনাইতে আসিত। বৃদ্ধ বিরক্ত হইয়া বলিতেন, পদ বেঁধেচো বেশ করেচো, ওসব আমায় শুনিও না বাপু, পদকর্তা ছিলেন বিদ্যাপতি

চণ্ডীদাস—তাঁদের পর ওসব আমার কানে বাজে—ওসব গিয়ে অন্য জায়গায় শোনাও।

সহজ, সামান্য, অনাড়ম্বর জীবনের গতি-পথ বাহিয়া এখানে কেমন যেন একটা অন্তঃসলিলা মুক্তির ধারা বহিতে থাকে, অপুর মন সেটুকু কেমন করিয়া ধরিয়া ফেলে। তাহার কাছে তাহা তাজা মাটি, পাখী, গাছপালার সাহচর্যের মত অন্তরঙ্গ ও আনন্দপূর্ণ ঠেকে বলিয়া দাদুর কাছে আসিবার আকর্ষণ তাহার এত প্রবল।

ফিরিবার সময় অপু নরোত্তম দাসের উঠানের গাছতলাটা হইতে একরাশি মুচুকুন্দ-চাঁপা ফুল কুড়াইয়া আনে। বিছানায় সেগুলি সে রাখিয়া দেয়। তাহার পরে সন্ধ্যার আলো জ্বলিলেই বাবার আদেশে পড়িতে বসিতে হয়। ঘন্টাখানেকের বেশী কোনোদিনই পড়িতে হয় না, কিন্তু অপুর মনে হয় কত রাতই যে হইয়া গেল! পরে ছুটি পাইয়া সে শুইতে যায়, বিছানায় শুইয়া পড়ে,—আর অমনি আজকার দিনের সকল খেলাধূলা, সারাদিনের সকল আনন্দের স্মৃতিতে ভরপুর হইয়া বিছানায় রাখা মুচুকুন্দ-চাঁপার গন্ধ তাহার দেহমনকে, খেলাধূলার অতীত ক্ষণগুলির বিরহাতুর বালক-প্রাণকে অভিভূত করিয়া বহিতে থাকে। বিছানায় উপুড় হইয়া ফুলের রাশির মধ্যে মুখ ডুবাইয়া সে অনেকক্ষণ ঘ্রাণ লয়।...

সেদিন তাহার দিদি চুপি চুপি বলে—চড়ুইভাতি কর্‌বি অপু?

তাহাদের দোর দিয়া পাড়ার সকলে কুলুই-চণ্ডীর ব্রতের বনভোজনে গ্রামের পিছনের মাঠে যায়। তাহার মাও যায়, কিন্তু তাহাকে লইয়া যায় না।...

নীলমণি রায়ের জঙ্গলাকীর্ণ ভিটার ওধারের খানিকটা বন দুর্গা নিজের হাতে দা দিয়া কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া ভাইকে বলিল—দাঁড়িয়ে দ্যাখ তেঁতুলতলায়, মা আসচে কিনা—আমি চাল বের করে নিয়ে আসি শিগ্‌গির করে—

একটা ভাল নারিকেলের মালায় দুই পলা তেল নেয় চুপি চুপি তেলের ভাঁড়টা হইতে। অপহৃত মালামাল বাহিরে আনিয়া ভাইয়ের জিম্মা করিয়া বলিল—শিগ্‌গির নিয়ে যা, দৌড়ো অপু—সেইখেনে রেখে আয়, দেখিস্ যেন গরু-টরুতে খেয়ে ফেলে না—

চারিদিক বনে ঘেরা। বাহির হইতে দেখা যায় না। খেলাঘরের মাটির ছোঁবার মত ছোট্ট একটা হাঁড়িতে দুর্গা ভাত চড়াইয়া দিয়া বলিল, এই দ্যাখ্ অপু, কত বড় বড় মেটে আলুর ফল নিয়ে এসিচি এক জায়গা থেকে। পুঁটুদের তালতলায় একটা ঝোপের মাথায় অনেক হয়ে আছে, ভাতে দেবো—

অপু মহা উৎসাহে শুকনা লতা পাতা কুড়াইয়া আনে। এই তাহাদের প্রথম বন-ভোজন। অপুর এখনও বিশ্বাস হইতেছিল না যে, এখানে সত্যিকারের ভাত-তরকারী রান্না হইবে, না, খেলাঘরের বন-ভোজন, যা কতবার হইয়াছে, সেরকম হইবে,—ধূলার ভাত, খাপরার আলুভাজা, কাঁঠালপাতার লুচি?

কিন্তু বড় সুন্দর খেলাটি!—বড় সুন্দর স্থান বন-ভোজনের! চারিধারে বনঝোপ, ওদিকে তেলাকুচা-লতার দুলুনি, বেলগাছের তলে জঙ্গলে সেওড়া গাছে ফুলের ঝাড়, আধপোড়া কটা দূর্বাঘাসের উপর খঞ্জন পাখীরা নাচিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে, নির্জন ঝোপঝাড়ের আড়ালে নিভৃত নিরালা স্থানটি। প্রথম বসন্তের দিনে ঝোপে ঝোপে নতুন কচি পাতা, ঘেঁটুফুলের ঝাড় পোড়ো ভিটাটা আলো করিয়া ফুটিয়া আছে, বাতাবিলেবু গাছটায় কয়দিনের কুয়াসায় ফুল অনেক ঝরিয়া গেলেও থোকা থোকা সাদা ফুল উপরের ডালে চোখে পড়ে।

চড়ুইভাতির মাঝামাঝি অপুদের বাড়ীর উঠানে কাহার ডাক শোনা গেল। দুর্গা বলিল—বিনির গলা যেন—নিয়ে আয় তো ডেকে অপু। একটু পরে অপুর পিছনে পিছনে দুর্গার সমবয়সী একটি কালো মেয়ে আসিল—একটু হাসিয়া যেন কতকটা সম্ভ্রমের সুরে বলিল—কি হচ্ছে দুগগা দিদি?

দুগ্‌গা বলিল—আয় না বিনি, চড়ুইভাতি কচ্চি-বোস

মেয়েটি ওপাড়ার কালীনাথ চক্কত্তির মেয়ে—পরণে আধময়লা শাড়ী, হাতে সরু সরু কাঁচের চুড়ি, একটু লম্বা গড়ন, মুখ নিতান্ত সাধাসিধা। তাহার বাপ নীচু বামুন বলিয়া সামাজিক ব্যাপারে পাড়ায় তাহাদের নিমন্ত্রণ হয় না, গ্রামের একপাশে নিতান্ত সঙ্কুচিতভাবে তাহারা বাস করে। অবস্থাও ভাল নয়। বিনি দুর্গার ফরমাইজ খাটিতে লাগিল খুব। বেড়াইতে আসিয়া হঠাৎ সে যেন একটা লাভজনক ব্যাপারের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, এখন ইহারা তাহাকে এই উৎসবের অংশীদার স্বীকার

করিবে কি না করিবে—এরূপ একটা দ্বিধামিশ্রত উল্লাসের ভাব তাহার কথাবার্তায় ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ পাইতেছিল। দুর্গা বলিল—বিনি, আর দু'টো শুক্‌নো কাঠ দ্যাখ্ তো—আগুনটা জ্বলছে না ভাল—

বিনি তখন কাঠ আনিতে ছুটিল এবং একটু পরে এক বোঝা শুক্‌নো বেতের ডাল আনিয়া হাজির করিয়া বলিল—এতে হবে দুগ্‌গা দিদি—না আর আনবো ?…দুর্গা যখন বলিল—বিনি এসেচে—ও তো এখানে খাবে—আর দু'টো চাল নিয়ে আয় অপু—বিনির মুখখানা খুসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।—খানিকটা পরে বিনি জল আনিয়া দিল। আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল—কি কি তরকারী, দুগ্‌গা দিদি ?

ভাত নামাইয়া দুর্গা তেলটুকু দিয়া বেগুন তাহাতে ফেলিয়া দিয়া ভাজে। খানিকটা পরে সে অবাক হইয়া ছোবার দিকে চাহিয়া থাকে, অপুকে ডাকিয়া বলে—ঠিক একেবারে সত্যিকারের বেগুন-ভাজার মত রঙ হচ্চে দেখিচিস্ অপু ! ঠিক যেন মা'র রান্না বেগুন-ভাজা, না ?

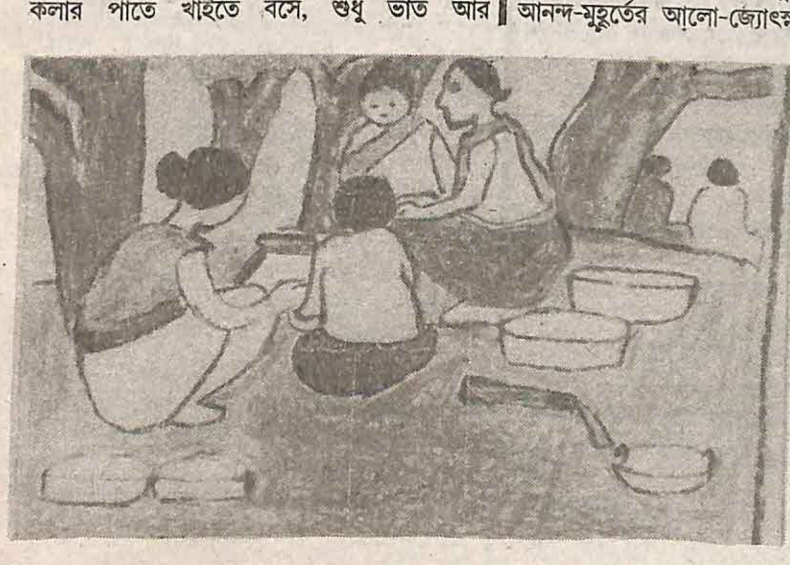
অপুরও ব্যাপারটা আশ্চর্য বোধ হয়। তাহার এখনও যেন বিশ্বাস হইতেছিল না যে, তাহাদের বন-ভোজনে সত্যিকার ভাত, সত্যিকার বেগুন-ভাজা সম্ভবপর হইবে। তাহার পর তিনজনে মহা আনন্দে কলার পাতে খাইতে বসে, শুধু ভাত আর বেগুন-ভাজা, আর কিছু না। অপু গ্রাস মুখে তুলিবার সময় দুর্গা সেদিকে চাহিয়া ছিল, আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে,—কেমন হয়েচে রে বেগুন-ভাজা ?

অপু বলে,—বেশ হয়েচে দিদি, কিন্তু নুন হয়নি যেন—

লবণকে রন্ধনের উপকরণের তালিকা হইতে ইহারা অদ্য একেবারেই বাদ দিয়াছে, লবণের বালাই রাখে নাই। কিন্তু মহাখুসিতে তিনজনে কোযো আলুর ফল ভাতে ও পান্‌সে আধ-পোড়া বেগুন-ভাজা দিয়া চড়ুই-ভাতির ভাত খাইতে বসিল। দুর্গার এই প্রথম রান্না, সে বিস্ময়-মেশানো আনন্দের সঙ্গে নিজের হাতের শিল্প-সৃষ্টি উপভোগ করিতেছিল। এই বন-ঝোপের মধ্যে, এই শুক্‌না লতা-পাতার রাশের মধ্যে খেজুর-তলায় ঝরিয়া-পড়া খেজুর-পাতার পাশে বসিয়া সত্যিকারের ভাত তরকারী খাওয়া !

খাইতে খাইতে দুর্গা অপুর দিকে চাহিয়া হি হি করিয়া খুসির হাসি হাসিল। খুসিতে ভাতের দলা তাহার গলার মধ্যে আটকাইয়া যাইতেছিল যেন। বিনি খাইতে খাইতে ভয়ে ভয়ে বলিল—একটু তেল আছে দুগ্‌গাদি ? মেটে আলুর ফল ভাতে মেখে নিতাম। দুর্গা বলিল—অপু, ছুটে নিয়ে আয় একটু তেল—

যে জীবন কত শত পুলকের ভাণ্ডার, কত আনন্দ-মুহূর্তের আলো-জ্যোৎস্নার অবদানে মণ্ডিত,



ইহাদের সে মাধুরীময় জীবনযাত্রার, সবে তো আরম্ভ। অনন্ত যে-জীবনপথ দূর হইতে বহুদূরে দৃষ্টির কোন্ ওপারে বিসর্পিত, সে-পথের ইহারা নিতান্ত ক্ষুদ্র পথিকদল, পথের বাঁকে ফুলেফলে, দুঃখেসুখে ইহাদের অভ্যর্থনা একেবারে নূতন।

আনন্দ! আনন্দ! প্রসারের আনন্দ, জীবনের মাঝে মাঝে যে আড়াল আছে, বিশাল তুষারমৌলি গিরিসঙ্কটের ওদিকের যে পথটা দেখা যাইতেছে না—তাহার আনন্দ, অজানার আনন্দ! সামান্য সামান্য, ছোটখাটো তুচ্ছ জিনিসের আনন্দ।

অপু বলিল—মাকে কি বল্‌বি দিদি? আবার ওবেলা ভাত খাবি?

দূর, মাকে কখনো বলি! সন্দের পর দেখিস্ খিদে পাবে একন!··· বিনিরা নীচু বামুন বলিয়া পাড়ায় জল খাইতে চাহিলে লোকে উহাদের ঘটিতে করিয়া জল খাইতে দেয়, তাহাও আবার মাজিয়া দিতে হয়। বিনি দু'একবার ইতস্ততঃ করিয়া অপুর গ্লাসটা দেখাইয়া বলিল—আমার গালে একটু জল ঢেলে দেও তো অপু? জল-তেষ্টা পেয়েছে। অপু বলিল—নাও না বিনি দি, তুমি নিয়ে চুমুক দিয়ে খাও না!

তবু যেন বিনির সাহস হয় না। দুর্গা বলিল—নে না বিনি, গেলাসটা নিয়ে খা না!

খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে দুর্গা বলিল—হাঁড়িটা ফেলা হবে না কিন্তু, আবার আর-একদিন বনভোজন করবো—কেমন তো? ওই কুলগাছটার ওপরে টাঙিয়ে রেখে দেবো।

অপু বলিল—হ্যাঁ, ওখানে থাকবে কিনা? মাতোর মা কাঠ কুড়োতে আসে, দেখতে পেলে নিয়ে যাবে দিদি—ভারী চোর—

একটা ভাঙা পাঁচিলের ঘুলঘুলির মধ্যে ছোবাটা দুর্গা রাখিয়া দিল। অপুর বুক ঢিপ্.ঢিপ্ করিতেছিল। ঐ ঘুলঘুলিটার ওপিঠে আর একটা ছোট ঘুলঘুলি আছে, তাহার মধ্যে অপু লুকাইয়া চুরুটের বাক্স রাখিয়া দিয়াছে, দিদি সেদিকে যদি যাইয়া পড়ে!

নেড়াদের বাড়ীতে কিছুদিন আগে নেড়ার ভগ্নীপতি ও তাহার এক বন্ধু আসিয়াছিল। কলিকাতার কাছে কোথায় বাড়ী। খুব বাবু, খুব চুরুট খায়। এই একবার খাইল, আবার এই খাইতেছে। অপুর মনে মনে অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল সেও একবার চুরুট খাইয়া দেখিবে, কেমন লাগে। সে নেড়ার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া গ্রামের হরিচরণের দোকান হইতে তিন পয়সার রাঙা কাগজ মোড়া দশটি চুরুট কিনিয়া আনে। সেদিন এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে একা বসিয়া চুপি চুপি একটা সিগারেট ধরাইয়া খাইয়াছিল—ভাল লাগে নাই, তেতো তেতো, কেমন একটা ঝাঁঝ—ছ'টান খাইয়া সে আর খাইতে পারে নাই, কিন্তু তাহার ভাগের বাকী চারিটি চুরুট সে ফেলিয়াও দিতে পারে নাই, নেড়ার ভগ্নীপতির নিকট সংগৃহীত একটা খালি চুরুটের বাক্সে সে-কয়টি সে ওই পোড়ো ভিটের জঙ্গলে ভাঙা পাঁচিলের ঘুল্‌ঘুলিতে লুকাইয়া রাখিয়া দিয়াছে। প্রথম চুরুট খাইবার দিন চুরুট টানা শেষ হইয়া গেলে ভয়ে তাহার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিতেছিল, পাছে মুখের গন্ধে মা টের পায়।

পাকা কুল অনেক করিয়া খাইয়া নিজের মুখের হাই হাত পাতিয়া অনেকবার পরীক্ষা করিয়া তবে সে সেদিন পুনর্বার মনুষ্যসমাজে প্রবেশ করিয়াছিল। যায় বুঝি আজ বামালশুদ্ধ ধরা পড়িয়া!—কিন্তু দিদির পাঁচিলের ওপিঠে যাইবার দরকার হয় না। এপিঠেই কাজ সারা হইয়া যায়।



১৩

গ্রামে বারোয়ারী চড়কপূজার সময় আসিল। গ্রামের বৈদ্যনাথ মজুমদার চাঁদার খাতা হাতে বাড়ী বাড়ী চাঁদা আদায় করিতে আসিলেন। হরিহর বলিল,—না খুড়ো, এবার আমার এক টাকা চাঁদা ধরাটা অন্যেয্য হয়েছে—এক টাকা দেবার কি আমার অবস্থা? বৈদ্যনাথ বলিলেন—না হে না, এবার নীলমণি হাজরার দল এরকম দলটি এ-অঞ্চলে কেউ চক্ষেও দেখেনি! এবার পাল-পাড়ার বাজারে মহেশ সেকরার বালক-কেত্তনের দল গাইবে, তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া চাই-ই—

বৈদ্যনাথ এমন ভাব দেখাইলেন যেন নিশ্চিন্দিপুরবাসিগণের জীবনমরণ এই প্রতিযোগিতার সাফল্যের উপর নির্ভর করিতেছে।

অপু একটা কঞ্চি টানিতে টানিতে বাড়ী ঢুকিয়া বলিল, পাকা কঞ্চি বাবা, তোমার খুব ভাল কলম হবে, ডোবার ধারের বাঁশতলায় পড়ে ছিল, কুড়িয়ে আনলাম—পরে সে হাসিমুখে সেটা কতকটা উঁচু করিয়া তুলিয়া দেখাইয়া বলিল—হবে না বাবা তোমার কলম? কেমন পাকা, না?

চড়কের আর বেশী দেরী নাই। বাড়ী বাড়ী গাজনের সন্ন্যাসী নাচিতে বাহির হইয়াছে। দুর্গা ও অপু আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীদলের পিছনে পিছনে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইল। অন্য অন্য গৃহস্থ-বাড়ী হইতে পুরানো কাপড় দেয়, চাল পয়সা দেয়—কেউ বা ঘড়া দেয়—তাহারা কিছুই দিতে পারে না দু'টো চাল ছাড়া—এজন্য তাহাদের বাড়ীতে এ-দল কোন বারেই আসে না। দশ বারো দিন সন্ন্যাসী-নাচনের পর চড়কের পূর্ব রাত্রে নীলপূজা আসিল।

নীলপূজার দিন বৈকালে একটা ছোট খেজুরগাছে সন্ন্যাসীরা কাঁটা ভাঙে—এবার দুর্গা আসিয়া খবর দিল প্রতি বৎসরের সেই গাছটাতে এবার কাঁটা-ভাঙা হইবে না, নদীর ধারে আর একটা গাছ সন্ন্যাসীরা এবার পূর্ব হইতে ঠিক করিয়াছে। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে দল বাঁধিয়া দুর্গা ও অপু সেখানে গিয়া জোটে। তারপর কাঁটা-ভাঙার নাচ হইয়া গেলে সকলে চড়কতলাটাতে একবার বেড়াইতে যায়। খেজুরের ডাল দিয়া নীলপূজার মণ্ডপ ঘিরিয়াছে—চড়কতলার মাঠের শেওড়াবন ও অন্যান্য জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে। সেখানে ভুবন মুখুয্যেদের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে দেখা হইল—রাণী, পুঁটি, টুনু—এদের বাড়ীতে কড়া শাসন আছে, দুর্গার মত টো টো করিয়া যেখানে সেখানে বেড়াইবার হুকুম নাই—অতি কষ্টে বলিয়া কহিয়া ইহারা চড়কতলা পর্যন্ত আসিয়াছে।

টুনু বলিল—আজ রাত্রে সন্নিসিরা শ্মশান জাগাতে যাবে—

রাণী বলিল—আহা, তা বুঝি আর জানিনে? একজন মড়া হবে। তাকে বেঁধে নিয়ে যাবে শ্মশানের

ইহাদের সে মাধুরীময় জীবনযাত্রার, সবে তো আরম্ভ। অনন্ত যে-জীবনপথ দূর হইতে বহুদূরে দৃষ্টির কোন্ ওপারে বিসর্পিত, সে-পথের ইহারা নিতান্ত ক্ষুদ্র পথিকদল, পথের বাঁকে ফুলেফলে, দুঃখেসুখে ইহাদের অভ্যর্থনা একেবারে নূতন।

আনন্দ! আনন্দ! প্রসারের আনন্দ, জীবনের মাঝে মাঝে যে আড়াল আছে, বিশাল তুষারমৌলি গিরিসঙ্কটের ওদিকের যে পথটা দেখা যাইতেছে না—তাহার আনন্দ, অজানার আনন্দ! সামান্য সামান্য, ছোটখাটো তুচ্ছ জিনিসের আনন্দ।

অপু বলিল—মাকে কি বল্‌বি দিদি? আবার ওবেলা ভাত খাবি?

দূর, মাকে কখনো বলি! সন্দের পর দেখিস্ খিদে পাবে একন!··· বিনিরা নীচু বামুন বলিয়া পাড়ায় জল খাইতে চাহিলে লোকে উহাদের ঘটিতে করিয়া জল খাইতে দেয়, তাহাও আবার মাজিয়া দিতে হয়। বিনি দু'একবার ইতস্ততঃ করিয়া অপুর গ্লাসটা দেখাইয়া বলিল—আমার গালে একটু জল ঢেলে দেও তো অপু? জল-তেষ্টা পেয়েছে। অপু বলিল—নাও না বিনি দি, তুমি নিয়ে চুমুক দিয়ে খাও না!

তবু যেন বিনির সাহস হয় না। দুর্গা বলিল—নে না বিনি, গেলাসটা নিয়ে খা না!

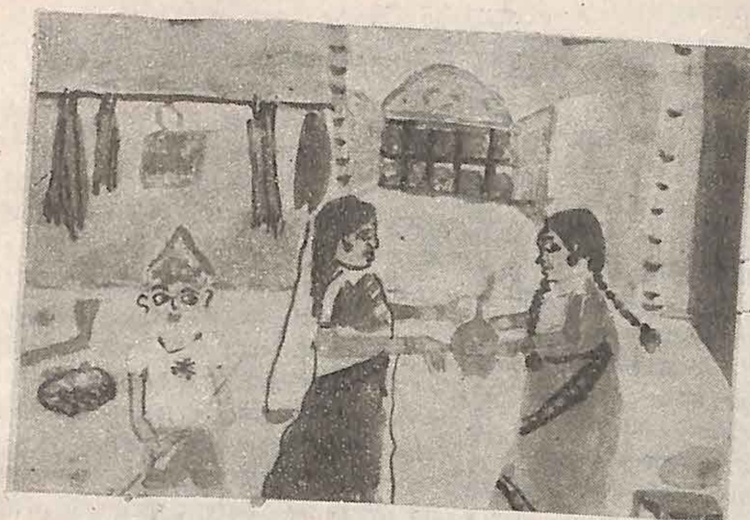
খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে দুর্গা বলিল—হাঁড়িটা ফেলা হবে না কিন্তু, আবার আর-একদিন বনভোজন করবো—কেমন তো? ওই কুলগাছটার ওপরে টাঙিয়ে রেখে দেবো।

অপু বলিল—হ্যাঁ, ওখানে থাকবে কিনা? মাতোর মা কাঠ কুড়োতে আসে, দেখতে পেলে নিয়ে যাবে দিদি—ভারী চোর—

একটা ভাঙা পাঁচিলের ঘুলঘুলির মধ্যে ছোবাটা দুর্গা রাখিয়া দিল। অপুর বুক ঢিপ্.ঢিপ্ করিতেছিল। ঐ ঘুলঘুলিটার ওপিঠে আর একটা ছোট ঘুলঘুলি আছে, তাহার মধ্যে অপু লুকাইয়া চুরুটের বাক্স রাখিয়া দিয়াছে, দিদি সেদিকে যদি যাইয়া পড়ে!

নেড়াদের বাড়ীতে কিছুদিন আগে নেড়ার ভগ্নীপতি ও তাহার এক বন্ধু আসিয়াছিল। কলিকাতার কাছে কোথায় বাড়ী। খুব বাবু, খুব চুরুট খায়। এই একবার খাইল, আবার এই খাইতেছে। অপুর মনে মনে অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল সেও একবার চুরুট খাইয়া দেখিবে, কেমন লাগে। সে নেড়ার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া গ্রামের হরিচরণের দোকান হইতে তিন পয়সার রাঙা কাগজ মোড়া দশটি চুরুট কিনিয়া আনে। সেদিন এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে একা বসিয়া চুপি চুপি একটা সিগারেট ধরাইয়া খাইয়াছিল—ভাল লাগে নাই, তেতো তেতো, কেমন একটা ঝাঁঝ—ছ'টান খাইয়া সে আর খাইতে পারে নাই, কিন্তু তাহার ভাগের বাকী চারিটি চুরুট সে ফেলিয়াও দিতে পারে নাই, নেড়ার ভগ্নীপতির নিকট সংগৃহীত একটা খালি চুরুটের বাক্সে সে-কয়টি সে ওই পোড়ো ভিটের জঙ্গলে ভাঙা পাঁচিলের ঘুল্‌ঘুলিতে লুকাইয়া রাখিয়া দিয়াছে। প্রথম চুরুট খাইবার দিন চুরুট টানা শেষ হইয়া গেলে ভয়ে তাহার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিতেছিল, পাছে মুখের গন্ধে মা টের পায়।

পাকা কুল অনেক করিয়া খাইয়া নিজের মুখের হাই হাত পাতিয়া অনেকবার পরীক্ষা করিয়া তবে সে সেদিন পুনর্বার মনুষ্যসমাজে প্রবেশ করিয়াছিল। যায় বুঝি আজ বামালশুদ্ধ ধরা পড়িয়া!—কিন্তু দিদির পাঁচিলের ওপিঠে যাইবার দরকার হয় না। এপিঠেই কাজ সারা হইয়া যায়।



১৩

গ্রামে বারোয়ারী চড়কপূজার সময় আসিল। গ্রামের বৈদ্যনাথ মজুমদার চাঁদার খাতা হাতে বাড়ী বাড়ী চাঁদা আদায় করিতে আসিলেন। হরিহর বলিল,—না খুড়ো, এবার আমার এক টাকা চাঁদা ধরাটা অনেয্য হয়েছে—এক টাকা দেবার কি আমার অবস্থা ? বৈদ্যনাথ বলিলেন—না হে না, এবার নীলমণি হাজরার দল এরকম দলটি এ-অঞ্চলে কেউ চক্ষেও দেখেনি ! এবার পাল-পাড়ার বাজারে মহেশ সেকরার বালক-কেত্তনের দল গাইবে, তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া চাই-ই—

বৈদ্যনাথ এমন ভাব দেখাইলেন যেন নিশ্চিন্দিপুরবাসিগণের জীবনমরণ এই প্রতিযোগিতার সাফল্যের উপর নির্ভর করিতেছে।

অপু একটা কঞ্চি টানিতে টানিতে বাড়ী ঢুকিয়া বলিল, পাকা কঞ্চি বাবা, তোমার খুব ভাল কলম হবে, ডোবার ধারের বাঁশতলায় পড়ে ছিল, কুড়িয়ে আনলাম—পরে সে হাসিমুখে সেটা কতকটা উঁচু করিয়া তুলিয়া দেখাইয়া বলিল—হবে না বাবা তোমার কলম ? কেমন পাকা, না ?

চড়কের আর বেশী দেরী নাই। বাড়ী বাড়ী গাজনের সন্ন্যাসী নাচিতে বাহির হইয়াছে। দুর্গা ও অপু আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীদলের পিছনে পিছনে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইল। অন্য অন্য গৃহস্থ-বাড়ী হইতে পুরানো কাপড় দেয়, চাল পয়সা দেয়—কেউ বা ঘড়া দেয়—তাহারা কিছুই দিতে পারে না দু'টো চাল ছাড়া—এজন্য তাহাদের বাড়ীতে এ-দল কোন বারেই আসে না। দশ বারো দিন সন্ন্যাসী-নাচনের পর চড়কের পূর্ব রাত্রে নীলপূজা আসিল।

নীলপূজার দিন বৈকালে একটা ছোট খেজুরগাছে সন্ন্যাসীরা কাঁটা ভাঙে—এবার দুর্গা আসিয়া খবর দিল প্রতি বৎসরের সেই গাছটাতে এবার কাঁটা-ভাঙা হইবে না, নদীর ধারে আর একটা গাছ সন্ন্যাসীরা এবার পূর্ব হইতে ঠিক করিয়াছে। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে দল বাঁধিয়া দুর্গা ও অপু সেখানে গিয়া জোটে। তারপর কাঁটা-ভাঙার নাচ হইয়া গেলে সকলে চড়কতলাটাতে একবার বেড়াইতে যায়। খেজুরের ডাল দিয়া নীলপূজার মণ্ডপ ঘিরিয়াছে—চড়কতলার মাঠের শেওড়াবন ও অন্যান্য জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে। সেখানে ভুবন মুখুয্যেদের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে দেখা হইল—রাণী, পুঁটি, টুনু—এদের বাড়ীতে কড়া শাসন আছে, দুর্গার মত টো টো করিয়া যেখানে সেখানে বেড়াইবার হুকুম নাই—অতি কষ্টে বলিয়া কহিয়া ইহারা চড়কতলা পর্যন্ত আসিয়াছে।

টুনু বলিল—আজ রাত্রে সন্নিসিরা শ্মশান জাগাতে যাবে—

রাণী বলিল—আহা, তা বুঝি আর জানিনে ? একজন মড়া হবে। তাকে বেঁধে নিয়ে যাবে শ্মশানের

সেই ছাতিমতলায়। তাকে আবার বাঁচাবে, তারপর মড়ার মুণ্ডু নিয়ে আসবে—ছড়া বল্‌তে বল্‌তে আস্‌বে—ওর সব মন্তর আছে—

দুর্গা বলিল—আমি জানি ওদের ছড়া, শুনবি বোলবো ?

স্বগ্‌গো থেকে এলো রথ
নাম্‌লো খেতুতলে
চব্বিশ কুটী বাণবর্ষা শিবের সঙ্গে চলে—
সত্যযুগের মড়া আর আওল যুগের মাটি
শিব শিব বল রে ভাই ঢাকে দাও কাঠি—

পরে হাসিয়া বলে—কেমন চমৎকার এবার গোষ্ঠবিহারের পুতুল হয়েছে নীলুদা ?...দাসু কুমোরের বাড়ী দেখে এলাম—দেখিস্‌নি রাণু ?

পুঁটি বলিল—সত্যিকার মড়ার মুণ্ডু রাণুদি ?

—নয় তো কি ?...অনেক রাত্রে যদি আসিস্ তো দেখ্‌তে পাবি। চল্ ভাই আমরা বাড়ী যাই—আজ রাতটা ভালো নয়—আয়রে অপু, দুগ্‌গাদি আয়।

অপু বলিল—কেন ভালো নয় রাণুদি ? কি হবে আজ রাতে ?...

রাণী বলিল—সে সব কথা বল্‌তে নেই—তুই আয় বাড়ী। অপু গেল না, কিন্তু দুর্গা ওদের দলের সঙ্গে চলিয়া গেল। তারপর হঠাৎ মেঘ করিল, সন্ধ্যার অন্ধকার মেঘে ঘনীভূত করিয়া তুলিল। অপু বাড়ী ফিরিতেছে, পথে জনপ্রাণী নাই, সন্ধ্যা হইতে শ্মশান ও মড়ার মুণ্ডের গল্প শুনিয়া তাহার কেমন ভয় ভয় করিতেছে। মোড়ের বাঁশবনের কাছে আসিয়া মনে হইল কিসের যেন কটু গন্ধ বাহির হইতেছে—সে দ্রুত পদে চলিতে লাগিল। আর একটুখানি গিয়া নেড়ার ঠাকুরমার সঙ্গে দেখা। নেড়ার ঠাকুরমা নীলপূজার নৈবেদ্য হাতে চড়কতলায় পূজা দিতে যাইতেছে। অপু অন্ধকারে প্রথমটা চিনিতে পারে নাই, পরে চিনিয়া বলিল—কিসের গন্ধ বেরিয়েচে ঠাকুরমা ?

বুড়ী বলিল—আজ ওঁরা সব বেরিয়েচেন কিনা!...তারই গন্ধ আর কি...অপু বলিল—কারা ঠাকুরমা ?

—কারা আবার—শিবের দলবল, সন্দেবেলা ওঁদের নাম করতে নেই—রাম রাম—রাম রাম—

অপুর গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। চারিধারে অন্ধকার সন্ধ্যা, আকাশে কালো মেঘ, বাঁশবন, শ্মশানের গন্ধ, শিবের অনুচর ভূতপ্রেত—ছোট ছেলের মন বিস্ময়ে, ভয়ে, রহস্যে, অজানার অনুভূতিতে ভরিয়া উঠিল। সে আতঙ্কের সুরে বলিল—আমি কি করে বাড়ী যাবো ঠাক্‌মা ?

বুড়ী বকিয়া উঠিল—তা এত রাত করাই বা কেন বাপু আজকের দিনে ?...এসো আমার সঙ্গে। নীলপূজার থালাখানা দিয়ে আসি, তারপর এগিয়ে দেবো'খন। ধন্যি যা হোক্—

বারোয়ারীতলায় ঘাস চাঁচিয়া প্রকাণ্ড বাঁশের মেরাপ বাঁধিয়া সামিয়ানা টাঙানো হইয়াছে।—যাত্রাদল আসে আসে—এখনও পৌঁছে নাই। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে লোকে বলে, কাল সকালের গাড়ীতে আসিবে, সকাল চলিয়া গেলে বৈকালের আশায় থাকে। অপুর স্নানাহার বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। রাত্রে অপুর ঘুম হয় না, বাঁধভাঙা বন্যার স্রোতের মত কৌতূহল ও খুসির যে কি প্রবল অদম্য উচ্ছ্বাস! বিছানায় ছট্‌ফট্ এপাশ-ওপাশ করে। যাত্রা হবে! যাত্রা হবে! যাত্রা হবে!

মায়ের বারণ আছে, অতবড় মেয়ে পাড়া ছাড়িয়া যেন কোথাও না যায়...দুর্গা চুপি চুপি গিয়া দেখিয়া আসিয়া রাজলক্ষ্মীর কাছে আসর-সজ্জা ও বাঁশের গায়ে ঝুলানো লাল নীল কাগজের অভিনবত্ব সম্বন্ধে গল্প করে। অপুর মনে হয়, যে-পঞ্চাননতলায় সে দু'বেলা খেলা করে সেই তুচ্ছ অত্যন্ত পরিচিত সামান্য স্থানটাতে আজ বা কাল নীলমণি হাজরার দলের যাত্রার মত একটা অভূতপূর্ব অবাস্তবঘটনা ঘটিবে, এও কি সম্ভব ? কথাটা যেন তার বিশ্বাসই হয় না।

হঠাৎ শুনিতে পাওয়া যায় আজ বিকালেই দল আসিবে। এক ঝলক রক্ত যেন বুক হইতে নাচিয়া চলকাইয়া একেবারে মাথায় উঠিয়া পড়ে।...

কুমার-পাড়ার মোড়ে দুপুরের পর হইতেই সকল ছেলের সঙ্গে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর দূরে একখানা গরুর গাড়ী তাহার চোখে পড়িল। সাজের বাক্স বোঝাই গাড়ী—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচখানা! পটু একে একে আঙুল দিয়া গুণিয়া খুসির সুরে বলিল—অপু-দা, আমরা এদের পেছনে পেছনে এদের বাসায় গিয়ে দেখে আসি, যাবি ? সাজের গাড়ীগুলার পিছনে, দলের লোকেরা যাইতেছে, সকলের মাথায় টেরিকাটা, অনেকের জুতা হাতে।

পটু একজন দাড়িওয়ালা লোককে দেখাইয়া কহিল—এ বোধ হয় রাজা সাজে, না অপু-দা ?···

আকাশ বাতাসের রঙ একেবারে বদ্‌লাইয়া গেল—অপু মহা উৎসাহে বাড়ী ফিরিয়া দেখে তাহার বাবা দাওয়ায় বসিয়া কি লিখিতেছে ও গুন্‌গুন্ করিয়া গান করিতেছে। সে ভাবে যাত্রাদলের আসিবার কথা তাহার বাবাও জানিতে পারিয়াছে, তাই এত স্ফূর্তি। উৎসাহে হাত নাড়িয়া বলে—সাজ একেবারে পাঁচ গাড়ী বাবা! এরকম দল—

হরিহর শিষ্যবাড়ী বিলি করার জন্য বালির কাগজে কবচ লিখিতেছিল, মুখ তুলিয়া বিস্ময়ের সুরে বলে—কিসের সাজ রে খোকা? অপু আশ্চর্য হইয়া যায়, এতবড় ঘটনা বাবার জানা নাই! বাবাকে সে নিতান্ত কৃপার পাত্র বিবেচনা করে···

সকালে উঠিয়া অপুকে পড়িতে বসিতে হয়। খানিক পরে সে কাঁদো কাঁদো ভাবে বলে—আমি বারোয়ারীতলায় যাবো বাবা, সক্কলে যাচ্চে আর আমি



এখন বুঝি বসে বসে পড়বো? এখ্‌খুনি যদি যাত্রা আরম্ভ হয়?

তাহার বাবা বলে—পড়ো পড়ো, এখন বসে পড়ো, যাত্রা আরম্ভ হলে ঢোল বাজবার শব্দ তো শুনতে পাওয়া যাবে। তখন না হয় যেও এখন। প্রৌঢ় বয়সের ছেলে, নিজে সব সময় আজকাল বিদেশে থাকে, অল্পদিনের জন্য বাড়ী আসিয়া ছেলেকে চোখ-ছাড়া করিতে মন চায় না। অভিমানে রাগে অপুর চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে। সে কান্না-ভরা গলায় আবার শুভঙ্করী সুরু করে—মাস মাহিনা যার যত, দিন তার পড়ে কত···

কিন্তু সকালে যাত্রা বসে না, খবর আসে ওবেলা বসিবে। ওবেলা অপু মায়ের কাছে গিয়া কাঁদো কাঁদো ভাবে বাবার অত্যাচারের কাহিনী আনুপূর্বিক বর্ণনা করে। সবর্জয়া আসিয়া বলে—দাও না গো ছেলেটাকে ছেড়ে! বছরকারের দিনটা—তোমার ন' মাস বাড়ীতে থাকা নেই বছরে, আর ও একদিনের পড়াতে একেবারে তক্কলঙ্কার ঠাকুর হয়ে উঠবে কিনা।

অপু ছুটি পায়। সারা দুপুর তাহার বারোয়ারীতলায় কাটে। বৈকালে যাত্রা বসিবার পূর্বে বাড়ীতে খাবার খাইতে আসিল। বাবা রোয়াকে বসিয়া কবচ লিখিতেছে। অন্যদিন এ সময় তাহাকে তাহার বাবার কাছে বসিয়া বই পড়িতে হয়। পাছে ছেলে চটিয়া যায় এই ভয়ে তাহার বাবা তাহাকে খুশি রাখিবার জন্য নানারকম কৌতুকের আয়োজন করে। বলে—খোকা, চট্ করে শেলেটে লিখে আনো দিকি, ঐঃ ভূত বাপ্‌রে। অপু এই সব অদ্ভুত ধরণের কথা শুনিয়া হাসিয়া খুন হয়, তাড়াতাড়ি লিখিয়া আনিয়া দেখায়। বলে, বাবা এইটে হয়ে গেলে আমি কিন্তু চলে যাব!···তাহার বাবা বলে—যেও এখন, যেও এখন খোকা—আচ্ছা চট্ করে লিখে আনো দিকি—আর একটা অদ্ভুত কথা বলে। অপু আবার হাসিয়া উঠে।

আজ কিন্তু অপুর মনে হইল, বাহির হইতে কি একটা প্রচণ্ড শক্তি আসিয়া তাহাকে তাহার বাবার নিকট হইতে সরাইয়া লইয়া গিয়াছে। বাবা নির্জন ছায়া-ভরা বৈকালে বাঁশবন-ঘেরা বাড়ীতে একা বসিয়া বসিয়া লিখিতেছে, কিন্তু এমন শক্তি নাই যে, তাহাকে বসাইয়া রাখে। এখন যদি বলে, খোকা এস, পড়তে

বসো—অম্‌নি চারিদিক হইতে একটা যেন ভয়ানক প্রতিবাদের হট্টগোল উঠিবে। সকলে যেন বলিবে—না, না, না, এ হয় না ! এ হয় না ! যাত্রা যে বসে বসে !—কোন্ উল্লাসের প্রবল শক্তি তাহার বাবাকে যেন নিতান্ত অসহায়, নিরীহ, দুর্বল করিয়া দিয়াছে। সাধ্য নাই যে, তাহার পড়িবার কথা পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ করে ! বাবার জন্য অপুর মন কেমন করে।

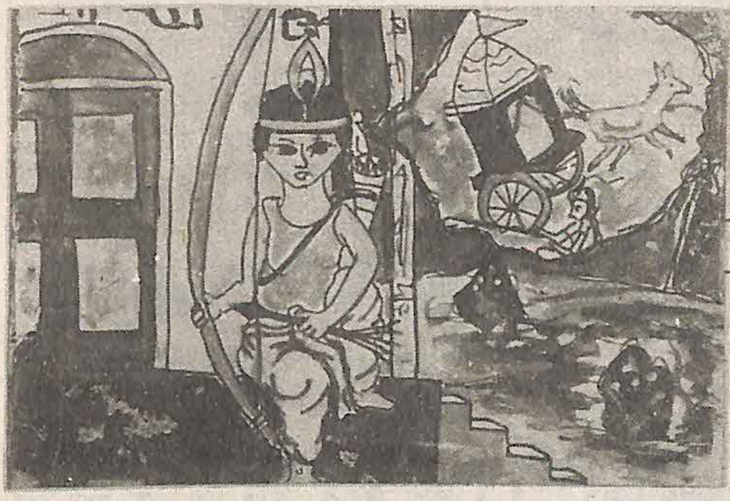
দুর্গা বলিল—অপু, তুই মাকে বল্ না আমিও দেখতে যাবো। অপু বলে—মা, দিদি কেন আসুক না আমার সঙ্গে। চিক্ দিয়ে ঘিরে দিয়েচ, সেইখানে বস্‌বে ! মা বলে—এখন থাক্, আমি ওই ওদের বাড়ীর মেয়েরা যাবে তাদের সঙ্গে যাবো—আমার সঙ্গে যাবে এখন।

বারোয়ারীতলায় যাইবার সময় দুর্গা পিছন হইতে তাহাকে ডাকিল—শোন্ অপু ! পরে সে কাছে আসিয়া হাসিহাসি মুখে বলিল—হাত পাত্ দিকি। অপু হাত পাতিতেই দুর্গা তাহার হাতে দু'টা পয়সা রাখিয়াই তাহার হাতটা নিজের দু'হাতের মধ্যে লইয়া মুঠা পাকাইয়া দিয়া বলিল—দু'পয়সার মুড়কি কিনে খাস, নয়তো যদি নিচু বিক্রি হয় তো কিনে খাস্। ইহার দিন সাতেক পূর্বে একদিন অপু আসিয়া চুপি চুপি দিদিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—তোর পুতুলের বাক্সে পয়সা আছে ? একটা দিবি ? দুর্গা বলিয়াছিল—কি হবে পয়সা তোর ? অপু দিদির মুখের দিকে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল—নিচু খাব—কথা শেষ করিয়া সে পুনরায় লজ্জার হাসি হাসিল। কৈফিয়তের সুরে বলে—বোষ্টমদের বাগানে ওরা মাচা বেঁধেচে দিদি, অনেক নিচু পেড়েচে, দু'ঝুড়ি-ই-ই—এক পয়সায় ছ'টা, এই এত বড় বড়, একেবারে সিঁদুরের মত রাঙা ! সতু কিন্‌লে, সাধন কিন্‌লে—পরে একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আছে দিদি ? দুর্গার পুতুলের বাক্সে সেদিন কিছুই ছিল না, সে কিছু দিতে পারে নাই। অপুকে বিরসমুখে চলিয়া যাইতে দেখিয়া সেদিন তাহার খুব কষ্ট হইয়াছিল, তাই কাল বৈকালে সে বাবার কাছে পয়সা দু'টা চড়ক দেখিবার নাম করিয়া চাহিয়া লয়। সোনার ভাঁটার মত ভাইটা, মুখের আব্‌দার না রাখিতে পারিলে দুর্গার ভারী মন কেমন করে।

অপু চলিয়া গেলে তাহার মা ঘাট হইতে আসিয়া বলে—দুগ্‌গা, একটা কাজ কর্ তো ! রাণুদের বাগান থেকে দুটো সাদা গন্ধ-ভেদালির পাতা খুঁজে নিয়ে আয় তো—অপুর শরীরটা অসুখ করেচে, একটু ঝোল করে দোব।

মায়ের কথায় সে এক ছুটে রাণুদের বাগানে যায়—বাগানে মানুষ-সমান উঁচু ঘন আগাছার জঙ্গলের মধ্যে গন্ধ-ভেদালির পাতা খুঁজিতে খুঁজিতে মনের সুখে মাথা দুলাইয়া পিসিমার মুখে ছেলেবেলায় শেখা একটা ছড়া আবৃত্তি করে :—

হলুদ বনে বনে—
নাক-ছাবিটা হারিয়ে গেছে সুখ নেইকো মনে—



১৪

যাত্রা আরম্ভ হয়। জগৎ নাই, কেহ নাই—শুধু অপু আছে আর নীলমণি হাজরার যাত্রার দল আছে সামনে। সন্ধ্যার আগে বেহালায় ইমন আলাপ করে। ভাল বেহালাদার—পাড়াগাঁয়ের ছেলে সে, কখনও ভাল জিনিস শোনে নাই—উদাস করুণ সুরে হঠাৎ মন কেমন করিয়া উঠে···মনে হয় বাবা এখনও বাড়ীতে বসিয়া সেই কি লিখিতেছে, দিদি আসিতে চাহিয়াও আসিতে পারে নাই। প্রথম যখন জরির সাজপোষাক পরিয়া ঝাড় টাঙানো ও কড়ির ডুমের আলো-সজ্জিত আসরে রাজার মন্ত্রিদল আসিতে আরম্ভ করে, অপু মনে মনে ভাবে এমন সব জিনিস তাহার বাবা দেখিল না! সবাই তো আসরে আসিয়াছে; গ্রামের, তাহাদের পাড়ার, কোন লোক তো বাকী নাই; তবে বাবা কেন এখনো····· ? পালা দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। সেবার সে বালক-কীর্তনের দলের যাত্রা শুনিয়াছিল—সে কি, আর এ কি! কি সব সাজ! কি সব চেহারা!···

হঠাৎ পিছন হইতে কে বলে—খোকা, বেশ দেখতে পাচ্ছ তো ?···তাহার বাবা কখন আসিয়া আসরে বসিয়াছে, অপু জানিতে পারে নাই। বাবার দিকে ফিরিয়া বলে—বাবা, দিদি ?···এসেচে ? চিকের মধ্যে বুঝি ?

মন্ত্রীর গুপ্ত ষড়যন্ত্রে যখন রাজা রাজ্যচ্যুত হইয়া স্ত্রী পুত্র লইয়া বনে চলিয়াছেন, তখন কাঁদুনে সুরে বেহালায় সঙ্গত হয়। তারপর রাজা স্ত্রীপুত্রের হাত ধরিয়া এক এক পা করিয়া থামেন, আর এক এক পা অগ্রসর হইতে থাকেন। অপু অপলক চোখে চাহিয়া বসিয়া থাকে, মুগ্ধ বিস্মিত হইয়া যায়; এমন তো সে কখনো দেখে নাই!

তারপর কোথায় চলিয়া গিয়াছেন রাজা, কোথায় গিয়াছেন রাণী!···ঘন নিবিড় বনে রাজপুত্র অজয় ও রাজকুমারী ইন্দুলেখা ভাইবোনে ঘুরিয়া বেড়ায়। কেউ নাই যে তাহাদের মুখের দিকে চায়, কেউ নাই নির্জন বনে তাহাদের পথ দেখাইয়া চলে। ছোট ভাইয়ের জন্য ফল আনিতে একটু দূরে চলিয়া যাইয়া ইন্দুলেখা আর ফেরে না। অজয় বনের মধ্যে বোনকে খুঁজিয়া বেড়ায়—তাহার পর নদীর ধারে হঠাৎ খুঁজিয়া পায় ইন্দুলেখার মৃতদেহ—ক্ষুধার তাড়নায় বিষফল খাইয়া সে মরিয়া গিয়াছে। অজয়ের করুণ গান—কোথা ছেড়ে গেলি এ বন-কান্তারে প্রাণপ্রিয় প্রাণসাথী রে—শুনিয়া অপু এতক্ষণ মুগ্ধ চোখে চাহিয়া ছিল—আর থাকিতে পারে না, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদে।

মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া জুড়ির দীর্ঘ গান ও বেহালার কসরৎ-এর সময় অপুকে তাহার বাবা ডাকিয়া বলে—ঘুম পাচ্ছে ? বাড়ী যাবে খোকা ? ঘুম! সর্বনাশ!···না, সে বাড়ী যাইবে না। বাহিরে ডাকিয়া তাহার বাবা বলে—এই দু'টো পয়সা রাখো

বাবা, কিছু কিনে খেও, আমি গেলাম। অপুর ইচ্ছা হয় সে এক পয়সার পান কিনিয়া খাইবে, পানের দোকানের কাছে কিসের অত্যন্ত ভিড় দেখিয়া অগ্রসর হইয়া দেখে অবাক কাণ্ড! সেনাপতি বিচিত্রকেতু হাতিয়ারবন্ধ অবস্থায় বার্ডসাই কিনিয়া ধরাইতেছেন—তাঁহাকে ঘিরিয়া রথযাত্রার ভিড়। আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য!...রাজকুমার অজয় কোথা হইতে আসিয়া বিচিত্রকেতুর কনুইয়ে হাত দিয়া বলিল—এক পয়সার পান খাওয়াও না কিশোরীদা?...রাজপুত্রের প্রতি সেনাপতির বিশ্বস্ততার নিদর্শন দেখা গেল না—হাত-ঝাড়া দিয়া বলিল—যাঃ অত পয়সা নেই—ওবেলা সাবানখানা যে দু'জনে মাখ্‌লে—আমাকে কি বলেছিলে? রাজপুত্র পুনরায় বলিল—খাওয়াও না কিশোরীদা! আমি বুঝি কখনো কিছু দিইনি তোমাকে? বিচিত্রকেতু হাত ছড়াইয়া চলিয়া গেল।

ছেলেটি অপুর সমবয়সী হইবে। টুকটুকে, বেশ দেখিতে, গানের গলা বড় সুন্দর। অপু মুগ্ধ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকে—বড়ই ইচ্ছা হয় আলাপ করিতে। হঠাৎ সে কিসের টানে সাহসী হইয়া আগাইয়া যায়—একটু লজ্জার সঙ্গে বলে—পান খাবে? অজয় একটু অবাক হয়, বলে—তুমি খাওয়াবে—এস না।...দু'জনে ভাব হইয়া যায়। ভাব বলিলে ভুল হয়। অপু মুগ্ধ, অভিভূত হইয়া যায়। ইহাকেই সে এতদিন মনে মনে চাহিয়া আসিয়াছে—এই রাজপুত্র অজয়কে! তাহার মায়ের শত রূপকথার কাহিনীর মধ্য দিয়া, শৈশবের শত স্বপ্নময়ী মুগ্ধ কল্পনার ঘোরে তাহার প্রাণ ইহাকেই চাহিয়াছে,—এই চোখ, এই মুখ, এই গলার স্বর। ঠিক সে যাহা চায় তাহাই। অজয় জিজ্ঞাসা করে—তোমাদের বাড়ী কোথায় ভাই? আমাকে একজনের বাড়ীতে খেতে দিয়েচে, বড্ড বেলায় খেতে দেয়। তোমাদের বাড়ীতে কে খায় ভাই?...

খুশিতে অপুর সারা গা কেমন করে, সে বলে—ভাই, আমাদের বাড়ীতে একজন খেতে যায়, সে আজ দেখলাম ঢোলক বাজাচ্ছে—তুমি কাল থেকে যেও, আমি এসে ডেকে নিয়ে যাবো—ঢোলকওয়ালা না হয় তুমি যে বাড়ীতে আগে খেতে, সেখানে খাবে—

খানিকক্ষণ দু'জনে এদিক-ওদিক বেড়াইবার পর অজয় বলে—আমি যাই ভাই, শেষ সিনে আমার গান আছে—আমার পার্ট কেমন লাগছে তোমার?

শেষ রাত্রে যাত্রা ভাঙিলে অপু বাড়ী আসে। পথে আসিতে আসিতে যে যেখানে কথা বলে তাহার মনে হয় যাত্রার এক্‌টো হইতেছে। বাড়ীতে তাহার দিদি বলে—ও অপু, কেমন যাত্রা শুন্‌লি? অপুর মনে হয়, গভীর জনশূন্য বনের মধ্যে রাজকুমারী ইন্দুলেখা কি বলিয়া উঠিল! কিসের যে ঘোর তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে! মহা খুসির সহিত সে বলে—কাল থেকে অজয় যে সেজেছিল মা—সে আমাদের বাড়ী খেতে আসবে—

তাহার মা বলে—দু'জন খাবে? কোত্থেকে—অপু বলে,—তা না, একজন তো চলে যাবে, শুধু অজয় খাবে—

দুর্গা বলে—কেমন যাত্রা রে অপু?...এমন কক্ষনো দেখিনি—কেমন গান কল্লে যখন সেই রাজকন্যে ম'রে গেল! অপুর তো রাত্রে ঘুমের ঘোরে চারিধারে যেন বেহালার সঙ্গীত হয়। ভোর হইলে একটু বেলায় তার ঘুম ভাঙে—শেষ রাত্রে ঘুমাইয়াছে, তৃপ্তির সঙ্গে ঘুম হয় নাই, সূর্যের তীক্ষ্ণ আলোয় চোখে যেন সূচ বিঁধে। চোখে জল দিলে জ্বালা করে। কিন্তু তাহার কানে একটা বেহালা-ঢোল-মন্দিরার ঐকতান বাজনা তখনও যেন বাজিতেছে—তখনও যেন সে যাত্রার আসরেই বসিয়া আছে!

ঘাটের পথে যাইতে পাড়ার মেয়েরা কথা বলিতে বলিতে যাইতেছে, অপুর মনে হইল কেহ ধীরাবতী, কেহ কলিঙ্গদেশের মহারাণী, কেহ রাজপুত্র অজয়ের মা বসুমতী। দিদির প্রতি কথায়, হাত পা নাড়ার ভঙ্গিতে, রাজকন্যা ইন্দুলেখা যেন মাখানো! কাল যে ইন্দুলেখা সাজিয়াছিল তাহাকে মানাইয়াছিল মন্দ নয় বটে, কিন্তু তাহার মনে মনে রাজকন্যা ইন্দুলেখার যে প্রতিমা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা তাহার দিদিকে লইয়া, ঐ রকম গায়ের রঙ, অমনি বড় বড় চোখ, অমন সুন্দর মুখ, অমনি সুন্দর চুল!

ইন্দুলেখা তাহার সকল করুণা, স্নেহ, মাধুরী লইয়া কোন্ সে-কালের দেশের অতীত জীবনের পারে আবার তাহার দিদি হইয়া যেন ফিরিয়া আসিয়াছে—কাল তাই ইন্দুলেখার কথার ভঙ্গিতে, প্রতি পদক্ষেপে দিদিই যেন ফুটিয়া ফুটিয়া বাহির

হইতেছিল। যখন গভীর বনে সে শতস্নেহে ছোট ভাইকে জড়াইয়া রাখিয়াছিল, তাহাকে খাওয়াইবার জন্য ফল আহরণ করিতে গিয়া একা নির্জন বনের মধ্যে হারাইয়া গেল—তখন সেই একদিনের মাকাল ফলের ঘটনাই অপুর ক্রমাগত মনে হইতেছিল!

দুপুরবেলা খাইবার জন্য অপু গিয়া অজয়কে ডাকিয়া আনিল। তাহার মা দু'জনকে এক জায়গায় খাইতে দিয়া অজয়ের পরিচয় লইতে বসিল। সে ব্রাহ্মণের ছেলে, তাহার কেহ নাই, এক মাসি তাহাকে মানুষ করিয়াছিল, সেও মরিয়া গিয়াছে। আজ বছর খানেক যাত্রার দলে কাজ করিতেছে। সর্বজয়ার ছেলেটির উপর খুব স্নেহ হইল—বারবার জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে খাওয়াইল। খাওয়াইবার উপকরণ বেশী কিছু নাই, তবু ছেলেটি খুব খুশির সঙ্গে খাইল। তাহার পর দুর্গা মাকে চুপি চুপি বলল—মা, ওকে সেই কালকের গানটা গাইতে বল না—সেই "কোথা ছেড়ে গেলি এ বন-কান্তারে প্রাণপ্রিয় প্রাণসাথী রে"—

অজয়া গলা ছাড়িয়া গানটি গাহিল—অপু মুগ্ধ হইয়া গেল, সর্বজয়ার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল। আহা, এমন ছেলের মা নাই! তাহার পর সে আরও গান গাহিল। সর্বজয়া বলিল—বিকেলে মুড়ি ভাজবো, তখন এসে অবিশ্যি করে মুড়ি খেয়ে যেও—লজ্জা করো না যেন—যখন আসবে, আপনার বাড়ীর মত—বুঝলে—?

অপু তাহাকে সঙ্গে করিয়া নদীর ধারের দিকে বেড়াইতে গেল। সেখানে অজয় বলিল, ভাই, তোমার তো গলা বড় মিষ্টি—একটা গান গাও না!... অপুর খুব ইচ্ছা হইল ইহার কাছে গান গাহিয়া সে বাহাদুরী লইবে। কিন্তু বড় ভয় করে—এ একজন যাত্রাদলের ছেলে—এর কাছে তার গান গাওয়া! নদীর ধারে বড় শিমূলগাছটার তলায় চলা-চলতির পথ হইতে কিছু দূরে বাঁশঝোপের আড়ালে দু'জনে বসে। অপু অনেক কষ্টে লজ্জা কাটাইয়া একটা গান ধরে—শ্রীচরণে ভার একবার গা তোল হে অনন্ত—দাশু রায়ের পাঁচালীর গান, বাবার মুখে শুনিয়া সে লিখিয়া লইয়াছে। অজয় অবাক হইয়া যায়, বলে—তোমার এমন গলা ভাই! তা তুমি গান গাও না কেন?—আর একটা গান গাও। অপু উৎসাহিত হইয়া আর একটা ধরে—খেয়ার আশে বসে রে মন ডুব্‌ল বেলা খেয়ার ধারে। তাহার দিদি কোথা হইতে শিখিয়া আসিয়া গাহিত, সুরটা বড় ভাল লাগায় অপু তাহার কাছ হইতে শিখিয়াছিল—বাড়ীতে কেহ না থাকিলে মাঝে মাঝে গানটা তাহারা দু'জনে গাহিয়া থাকে।

গান শেষ হইলে অজয় প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বলিল—এমন গলা থাকলে যে কোনো দলে ঢুকলে পোনেরো টাকা করে মাইনে সেধে দেবে বলচি



তোমায়—এর ওপর একটু যদি শেখো !—

বাড়ীতে কেহ না থাকিলে দিদির সামনে গাহিয়া অপু কতদিন দিদিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে—হ্যাঁ দিদি, আমার গলা আছে ? গান হবে ?—দিদি তাহাকে বারবার আশ্বাস দিয়া আসিয়াছে। কিন্তু দিদির আশ্বাস যতই আশাপ্রদ হউক, আজ একজন সঙ্গীতদক্ষ খাস যাত্রার দলের নামকরা মেডেলওয়ালা গায়কের মুখে এ প্রশংসার কথা শুনিয়া আনন্দে অপু কি বলিয়া উত্তর করিবে ঠাওর করিতে পারিল না।

বলিল—তোমার ঐ গানটা আমায় শেখাও না !—তাহার পরে দুইজন গলা মিলাইয়া সে-গানটা গাহিল।

অনেকক্ষণ হইয়া গেল। নদী বাহিয়া ছপ্ ছপ্ করিয়া নৌকা চলিতেছে, নদীর পাড়ের নীচে জলের ধারে একজন কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। অজয় বলিল—কি খুঁজ্‌চে ভাই ? অপু বলিল—ও ব্যাঙাচি খুঁজ্‌চে ছিপে মাছ ধরবে—তাহার পর বলিল—আচ্ছা ভাই,তুমি আমাদের এখানে থাকো না কেন ?—যেও না কোথাও, থাক্‌বে ?...

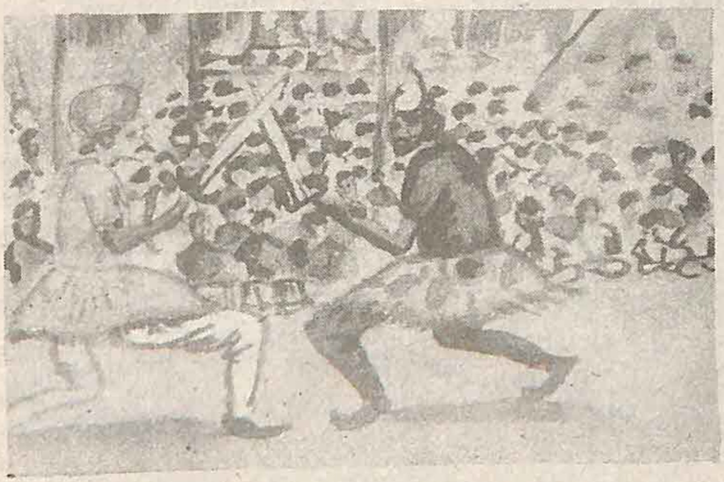
এমন চোখ, এমন মিষ্টি গলার সুর। তাহার উপর অপুর কাছে সে সেই রাজপুত্র অজয়। কোন্ বনে ফিরিতে ফিরিতে অসহায় ছন্নছাড়া রূপবান রাজার ছেলের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইয়া ভাব হইয়া গিয়াছে—চিরজন্মের বন্ধু। আর তাহাকে কি করিয়া ছাড়া যায়।

অজয়ও অনেক মনের কথা বলিয়া ফেলিল। এমন সাথী তাহার আর জুটে নাই। সে প্রায় চল্লিশ টাকা জমাইয়াছে। আর একটু বড় হইলে সে এ-দল ছাড়িয়া দিবে। অধিকারী বড় মারে। সে আশুতোষ পালের দলে যাইবে—সেখানে বড় সুখ, রোজ রাত্রে লুচি। না খাইলে তিন আনা পয়সা খোরাকী দেয়। এ-দল ছাড়িলে সে আবার অপুদের বাড়ী আসিবে ও সে-সময় কিছুদিন থাকিবে। বৈকালের কিছু আগে অজয় বলিল—চল ভাই, আজ আবার এখুনি আসর হবে, সকাল সকাল ফিরি। যদি 'পরশুরামের দর্প-সংহার' হয়, তবে আমি নিয়তি সাজবো, দেখো কেমন একটা গান আছে—

আরও তিন দিন যাত্রা হইল। গ্রামসুদ্ধ লোকের মুখে যাত্রা ছাড়া আর কথা নাই। পথে ঘাটে মাঠে, গাঁয়ের মাঝি নৌকা বাহিতে বাহিতে, রাখাল গরু চরাইতে চরাইতে, যাত্রার পালার নতুন শেখা গান গায়। গ্রামের মেয়েরা দলের ছেলেদের বাড়ীতে ডাকাইয়া যাহার যে-গান ভাল লাগিয়াছে, তাহার মুখে সে-গান ফরমাইস করিয়া শুনিতে লাগিলেন। অপু আরও তিন চারটা নতুন গান শিখিয়া ফেলিল। একদিন সে যাত্রার দলের বাসায় অজয়ের সঙ্গে গিয়াছে, সেখানে তাহাকে দলের সকলে মিলিয়া ধরিল তাহাকে একটা গান গাহিতে হইবে। সেখানে সকলে অজয়ের মুখে শুনিয়াছে সে খুব ভাল গান গাহিতে পারে। অপু বহু সাধ্যসাধনার পর নিজের বিদ্যা ভাল করিয়া জাহির করিবার খাতিরে একটা গাহিয়া ফেলিল। সকলে তাহাকে ধরিয়া অধিকারীর নিকটে লইয়া গেল। সেখানেও তাহাকে একটা গাহিতে হইল। অধিকারী কালো রঙের ভুঁড়িওয়ালা লোক, আসরে জুড়ি সাজিয়া গান করে। গান শুনিয়া বলিল, এস না খোকা, দলে আসবে ? অপুর বুকখানা আনন্দে ও গর্বে দশহাত হইল। আরও সকলে মিলিয়া তাহাকে ধরে—এস, চল তোমাকে আমাদের দলে নিয়ে যাই। অপুর তো ইচ্ছা সে এখনি যায়। যাত্রাদলের কাজ করা যে মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য, সেকথা এতদিন সে কেন জানিত না, ইহাই তো আশ্চর্যের বিষয়। সে গোপনে অজয়কে বলিল, আচ্ছা ভাই, এখন যদি আমি দলে যাই আমাকে কি সাজতে দেবে ? অজয় বলিল, এখন এই সখী-টখী, কি বালকের পার্ট—এইরকম, তারপর ভাল করে শিখলে—

অপু সখী সাজিতে চায় না—জরির মুকুট মাথায় সে সেনাপতি সাজিয়া তলোয়ার ঝুলাইবে, যুদ্ধ করিবে। বড় হইলে সে যাত্রার দলে যাইবেই, উহাই তাহার জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য। অজয় তাহাকে চুপি চুপি কষ্টিপাথরের রঙ একটা ছোক্‌রাকে দেখাইয়া বলিল, এই যে দেখচো, এর নাম বিষ্টু তেলি। আমার সঙ্গে মোটে বনে না, আমি নিজের পয়সায় দেশলাই কিনে বালিশের তলায় রেখে শুই, দেশলাই উঠিয়ে নেয় চুরুট খেতে, আর দেয় না। আমি বলি, আমার রাত্রে ভয় করে, দেশলাইটা দাও। অন্ধকারে মন ছম্ ছম্ করে, তাই সেদিন চেয়েছিলাম বলে এমনি থাবড়া একটা মেরেচে ! নাচে ভালো বলে অধিকারী বড় খাতির করে, কিছু বল্‌বারও যো নেই—

দিন পাঁচেক পরে যাত্রার দলের গাওনা শেষ হইয়া



গেলে তাহারা রওনা হইল। অজয় বাড়ীর ছেলের মত যখন তখন আসিত যাইত, এই কয়দিনে সে যেন অপুরই এক ভাই হইয়া পড়িয়াছিল। অপুর সমবয়সী ছোট ছেলে—সংসারে কেহ নাই শুনিয়া সর্বজয়া তাহাকে এ কয়দিন অপুর মত যত্ন করিয়াছে। দুর্গাও তাহাকে আপন ভাইয়ের চোখে দেখিয়াছে—তাহার কাছে গান শিখিয়া লইয়াছে, কত গল্প শুনাইয়াছে, তাহার পিসিমার কথা বলিয়াছে, তিনজনে মিলিয়া উঠানে বড় ঘর আঁকিয়া গঙ্গা-যমুনা খেলিয়াছে, খাইবার সময় জোর করিয়া বেশী খাইতে বাধ্য করিয়াছে। যাত্রাদলে থাকে, কে দ্যাখে, কোথায় শোয়, কি খায়, আহা বলিবার কেহ নাই; গৃহ-সংসারের যে-স্নেহস্পর্শ বোধ হয় জন্মাবধিই তাহার ভাগ্যে জোটে নাই, অপ্রত্যাশিতভাবে আজ তাহার স্বাদ লাভ করিয়া লোভীর মত সে কিছুতেই ছাড়িয়া যাইতে চাহিতেছিল না।

যাইবার সময় সে হঠাৎ পুঁটুলি খুলিয়া কষ্টে সঞ্চিত পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া সর্বজয়ার হাতে দিতে গেল। একটু লজ্জার সুরে বলিল—এই পাঁচটি টাকা দিয়ে দিদির বিয়ের সময় একখানা ভাল কাপড়—

সর্বজয়া—না বাবা, না—তুমি মুখে বললে এই খুব হোল, টাকা দিতে হবে না। তোমার এখন টাকার কত দরকার—বিয়ে-থাওয়া করে সংসারী হতে হবে—

তবু সে কিছুতেই ছাড়ে না—অনেক বুঝাইয়া তবে তাহাকে নিরস্ত করিতে হইল।

তাহার পর সকলে উহাদের বাড়ীর দরজার সামনে খানিকটা পথ পর্যন্ত তাহাকে আগাইয়া দিতে আসিল। যাইবার সময় সে বার বার বলিয়া গেল, দিদির বিয়ের সময় অবশ্য করিয়া যেন তাহাকে পত্র দেওয়া হয়।

গাবতলার ছায়ায় ছায়ায় তাহার সুকুমার বালকমূর্তি ভাঁট শেওড়া ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেলে হঠাৎ সর্বজয়ার মনে হইল, বড্ড ছেলেমানুষ—আহা, এই বয়সে বেরিয়েছে নিজের রোজগার নিজে কর্তে! অপুর আমার যদি ঐরকম হোত—মাগো!...



১৫

প্রথম প্রথম যখন হরিহর কাশী হইতে আসিল তখন সকলে বলিত তাহার ভবিষ্যৎ বড় উজ্জ্বল, এ অঞ্চলে ওরকম বিদ্যা শিখিয়া কেহ আসে নাই। তাহার বিদ্যার সুখ্যাতি সকলের মুখে ছিল, সকলে বলিত সে এইবার একটা কিছু করিবে। সর্বজয়াও ভাবিত, শীঘ্রই উহারা তাহার স্বামীকে ডাকাইয়া একটা ভাল চাকুরী দিবে (কাহারা চাকুরী দেয় সে সম্বন্ধে তাহার ধারণা ছিল কুয়াসাচ্ছন্ন সমুদ্রবক্ষের মত অস্পষ্ট)। কিন্তু মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর করিয়া বহুকাল চলিয়া গেল, অর্ধরাত্রির মাথায় কোনো জরির-পোষাক-পরা ঘোড়সওয়ার সভাপণ্ডিতপদের নিয়োগ-পত্র লইয়া ছুটিয়া আসিল না, বা আরব্য উপন্যাসের দৈত্য কোন মণি-খচিত মায়াপ্রাসাদ আকাশ বাহিয়া উড়াইয়া আনিয়া তাহাদের ভাঙা ঘরে বসাইয়া দিয়া গেল না, বরং সে-ঘরের পোকা-কাটা কপাট দিন দিন আরও জীর্ণ হইতে চলিল, কড়িকাঠ আরও ঝুলিয়া পড়িতে চাহিল; আগে যাও বা ছিল তাও আর সব থাকিতেছে না, তবু সে একেবারে আশা ছাড়ে নাই। হরিহরও বিদেশ হইতে আসিয়া প্রতিবারই একটা আশার কথা এমনভাবে বলে, যেন সব ঠিক, অল্পমাত্র বিলম্ব আছে, অবস্থা ফিরিল বলিয়া! কিন্তু হয় কৈ?—

জীবন বড় মধুময় শুধু এইজন্য যে, এই মাধুর্যের অনেকটাই স্বপ্ন ও কল্পনা দিয়া গড়া। হোক্ না স্বপ্ন মিথ্যা, কল্পনা বাস্তবতার লেশশূন্য; নাই বা থাকিল সব সময় তাহাদের পিছনে সার্থকতা; তাহারাই যে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাহারা আসুক, জীবনে অক্ষয় হোক্ তাহাদের আসন; তুচ্ছ সার্থকতা, তুচ্ছ লাভ।

হরিহর বাড়ী হইতে গিয়াছে প্রায় দুই তিন মাস। টাকাকড়ি খরচপত্রও অনেকদিন পাঠায় নাই। দুর্গা অসুখে ভুগিতেছে একটু বেশী, খায় দায় অসুখ হয়, দু'দিন একটু ভাল থাকে, হঠাৎ একদিন আবার হয়।

এবার হরিহর যখন বিদেশে যায় তখন বলিয়া গিয়াছে, এইবার সে এখান হইতে উঠিয়া অন্যত্র বাস করিবার একটা কিছু ঠিক করিয়া আসিবেই।

...পাড়ার একপাশে নিকানো পুঁছানো ছোট্ট খড়ের ঘর দু'তিনখানা। গোয়ালে হৃষ্টপুষ্ট দুগ্ধবতী গাভী বাঁধা, মাচা-ভরা বিচালি, গোলাভরা ধান! মাঠের ধারের মটর-ক্ষেতের তাজা সবুজ গন্ধ খোলা হাওয়ায় উঠান দিয়া বহিয়া যায়। পাখী ডাকে—নীলকণ্ঠ, বাবুই, শ্যামা। অপু সকালে উঠিয়া বড় মাটির ভাঁড়ে দোয়া এক পাত্র তাজা সফেন কালো গাইয়ের দুধের সঙ্গে মুড়ির ফলার খাইয়া পড়িতে বসে, দুর্গা ম্যালেরিয়ায় ভোগে না। সকলেই জানে, সকলেই খাতির করে, আসিয়া পায়ের ধূলা লয়। গরীব বলিয়া কেহ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে না।...

শুধুই স্বপ্ন দেখে, দিন নাই, রাত নাই, সর্বজয়া

শুধুই স্বপ্ন দেখে। তাহার মনে হয় এতকাল পরে সত্য সত্যই একটা কিছু লাগিয়া যাইবে। মনের মধ্যে কে যেন বলে।

দুর্গা একটা ছোট্ট মানকচু কোথা হইতে যোগাড় করিয়া আনিয়া রান্নাঘরে ধর্না দিয়া বসিয়া থাকে। তাহার মা বলে তোর হোল কি দুগ্‌গা ? আজ কি বলে ভাত খাবি ? কাল সন্ধ্যেবেলাও তো জ্বর এসেচে ? দুর্গা বলে, তা হোক্ মা, সে জ্বর বুঝি—একটু তো মোটে শীত করলো !...তুমি এই মানকচুটা ভাতে দিয়ে দু'টো ভাত—। তাহার মা বলে—যাঃ, অসুখ হয়ে তোর খাই খাই বড্ড বেড়েছে ! আজ কাল ভাল যদি থাকিস তো পরশু বরং দেবো—

অনেক কাকুতি মিনতির পর না পারিয়া শেষে দুর্গা মানকচু তুলিয়া রাখিয়া দেয়। খানিকটা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, আপন মনে সে বলে, আজ খুব ভাল আছি, আজ আর জ্বর আসবে না আমার—ওবেলা দু'খানা রুটি আর আলুভাজা খাবো। একটু পরে হাই ওঠে, সে জানে ইহা জ্বর আসার পূর্বলক্ষণ। তবুও সে মনকে বোঝায়, হাই উঠুক, এমনি তো কত হাই ওঠে, জ্বর আর হবে না। ক্রমে শীত করে, রৌদ্রে গিয়া বসিতে ইচ্ছা হয়। সে রৌদ্রে না গিয়া মনকে প্রবোধ দেয় যে, শীত বোধ হওয়া একটা স্বাভাবিক শারীরিক ব্যাপার, জ্বর আসার সহিত ইহার সম্পর্ক কি ?

কিন্তু কোনো প্রবোধ খাটে না। রৌদ্রে পড়িতে পড়িতে জ্বর আসে, সে লুকাইয়া গিয়া রৌদ্রে বসে, পাছে মা টের পায়। তাহার মন হুহু করে ; ভাবে—জ্বর জ্বর ভেবে এরকম হচ্ছে, সত্যি সত্যি জ্বর হয়নি—

রাঙা রোদ শেওলাধরা ভাঙা পাঁচিলের গায়ে গিয়া পড়ে। বৈকালের ছায়া ঘন হয়। দুর্গার মনে হয়, অন্যমনস্ক হইয়া থাকিলে জ্বর চলিয়া যাইবে ; অপুকে বলে, বোস্ দিকি একটু আমার কাছে, আয় গল্প করি।

—একদিন যা আশ্চর্য ব্যাপার।...

কোথা হইতে সেদিন এক বুড়ো মুসলমান একটা বড় রঙ-চঙ করা কাচ বসানো টিনের বাক্স লইয়া খেলা দেখাইতে আসে। ওপাড়ার জীবন চৌধুরীর উঠানে সে খেলা দেখাইতেছিল। দুর্গা পাশেই দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার পয়সা ছিল না। আর সকলে এক পয়সা দিয়া বাক্সের গায়ের একটা চোঙের মধ্যে চোখ দিয়া কি সব দেখিতেছিল।

বুড়া মুসলমানটি বাক্সটি বাজাইয়া সুর করিয়া বলিতেছিল, তাজবিবিকা রোজা দেখো, হাতী বাঘকা লড়াই দেখো। এক একজনের দেখা শেষ হইলে যেমন সে চোঙ হইতে চোখ সরাইয়া লইতেছিল অমনি দুর্গা তাহাকে মহা আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা



করিতেছিল, কি দেখলি রে ওর মধ্যে সব সত্যিকারের ?

উঃ ! সে কি অপূর্ব ব্যাপার দেখিয়াছে তাহা তাহারা বলিতে পারে না ! কি সে-সব !

সকলের দেখা একে একে হইয়া গেল। দুর্গা চলিয়া যাইতেছিল, বুড়া মুসলমানটি বলিল, দেখবে না খুকী ? দুর্গা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, নাঃ—আমার কাছে পয়সা নেই।

লোকটি বলিল, এসো এসো খুকী, দেখে যাও—পয়সা লাগ্‌বে না—

দুর্গার একটু লজ্জা হইয়াছিল, মুখে বলিল, নাঃ—কিন্তু আগ্রহে কৌতূহলে তাহার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিল।

লোকটি বলিল—এসো, এসো, দোষ কি—এসো, দ্যাখো—

দুর্গা উজ্জ্বল মুখে পায়ে পায়ে বাক্সের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল বটে, তবুও সাহস করিয়া মুখটা চোঙের মধ্যে দিতে পারে নাই। লোকটি বলিল, এই নলটার মধ্যে দিয়ে তাকাও দিকি খুকী !

দুর্গা মাথার উপর উড়ন্ত চুলের গোছা কানের পাশে সরাইয়া চাহিয়া দেখিল। পরের দশ মিনিটের কথার সে কোনো বর্ণনা করিতে পারে না। সত্যিকারের মানুষ ছবিতে কি করিয়া দেখা যায় ? কত সাহেব, মেম, ঘর, বাড়ী, যুদ্ধ, সে সব কথা সে বলিতে পারে না। কি জিনিসই সে দেখিয়াছিল !

অপুকে দেখাইতে বড় ইচ্ছা করে, দুর্গা কতবার খুঁজিয়াছে, ও-খেলা আর কোনও দিন আসে নাই।...

গল্প ভাল করিয়া শেষ হইতে না হইতে দুর্গা জ্বরের ধমকে আর বসিতে পারে না, উঠিয়া ঘরের মধ্যে কাঁথা মুড়ি দিয়া শোয়।

* * *

আজকাল বাবা বাড়ী নাই, অপুকে আর খুঁজিয়া মেলা দায়। বইদপ্তরে ঘুন ধরিবার যোগাড় হইয়াছে। সকালবেলা সেই যে বাহির হয়, আর ফেরে একেবারে দুপুর ঘুরিয়া গেলে খাইবার সময়। তাহার মা বকে—ছেলের না নিকুচি করেছে—তোমার লেখাপড়া একেবারে শিকেয় উঠ্‌লো ? এবার বাড়ী এলে সব কথা বলে দেবো, দেখো—

অপু ভয়ে ভয়ে দপ্তর লইয়া বসে। বইগুলা সব চারিদিকে ছড়ায়। মাকে বলে, একটু খয়ের দাও মা, আমি দোয়াতের কালিতে দেবো—

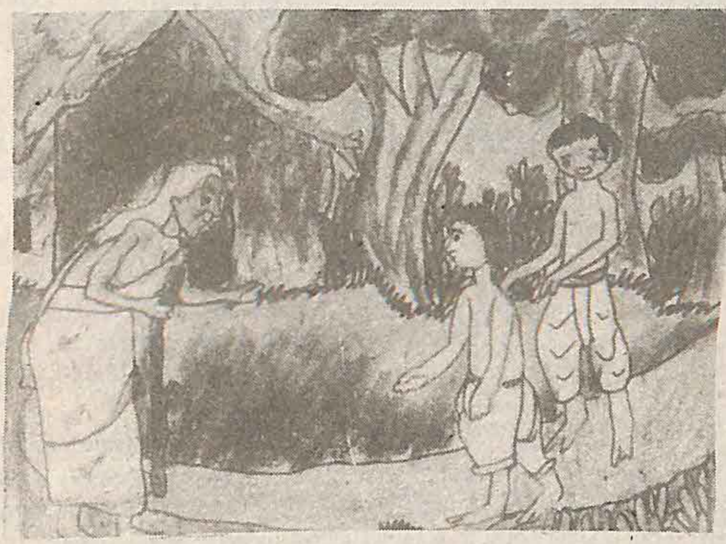
পরে সে বসিয়া বসিয়া হাতের লেখা লিখিয়া রৌদ্রে দেয়। শুকাইয়া গেলে খয়ের ভিজানো কালি চক্‌চক্ করে—অপু মহা খুসির সহিত সেদিকে চাহিয়া থাকে—ভাবে—আর একটু খয়ের দেবো কাল থেকে—ওঃ কি চক্‌চক্ করবে দেখো একবার !—পানের বাটা হইতে মাকে লুকাইয়া বড় একখণ্ড খয়ের লইয়া কালির দোয়াতে দেয়। পরে লেখা লিখিয়া শুকাইতে দিয়া, কতটা আজ জ্বল্‌জ্বল্ করে দেখিবার জন্য কৌতূহলের সহিত সেদিকে চাহিয়া থাকে। মনে হয়—আচ্ছা, যদি আর একটু দি ?

একদিন মার কাছে ধরা পড়িয়া যায়। মা বলে, ছেলের লেখার সঙ্গে খোঁজ নেই, কেবল ড্যালা ড্যালা খয়ের রোজ দরকার—রেখে দে খয়ের—

ধরা পড়িয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া বলে, খয়ের নৈলে কালি হয় বুঝি ?...আমি বুঝি এম্‌নি এম্‌নি—

—না খয়ের নৈলে কালি হবে কেন ? এই সব রাজ্যির ছেলে আর লেখাপড়া কচ্চে না—তাদের সের সের খয়ের রোজ যোগান রয়েচে যে দোকানে ! যাঃ—

অপু বসিয়া বসিয়া একখানা খাতায় নাটক লেখে। বহু লিখিয়া খাতাখানা সে প্রায় ভরাইয়া ফেলিয়াছে,—মন্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকায় রাজা রাজ্য ছাড়িয়া বনে যান, রাজপুত্র নীলাম্বর ও রাজকুমারী অম্বা বনের মধ্যে দস্যুর হাতে পড়ে, ঘোর যুদ্ধ হয়, পরে রাজকুমারীর মৃতদেহ নদীতীরে দেখা যায়। নাটকে সতু বলিয়া একটি জটিল চরিত্র, সৃষ্ট হইবার অল্প পরেই, বিশেষ কোন মারাত্মক দোষের বর্ণনা না থাকা সত্ত্বেও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়—নাটকের শেষদিকে রাজপুত্রী অম্বার নারদের বরে পুনর্জীবনপ্রাপ্তি বা বিশ্বস্ত সেনাপতি জীবনকেতুর সহিত তাহার বিবাহ প্রভৃতির ঘটনায় যাঁহারা বলেন যে, গত বৈশাখ মাসে দেখা যাত্রার পালা হইতে এক নামগুলি ছাড়া ইহা মূলতঃ কোন অংশেই পৃথক নহে, বা সেই হইতেই ইহা হুবহু লওয়া, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, অতীতের কোনো এক নীরব জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে নির্জন বাসকক্ষের স্তিমিতদীপ শয্যায় এক প্রাচীন কবির নীলমেঘের মত দৃশ্যমান ময়ূর-নিনাদিত দূর বনভূমির স্বপ্ন যদি কালিদাসকে মুক্ত মেঘের



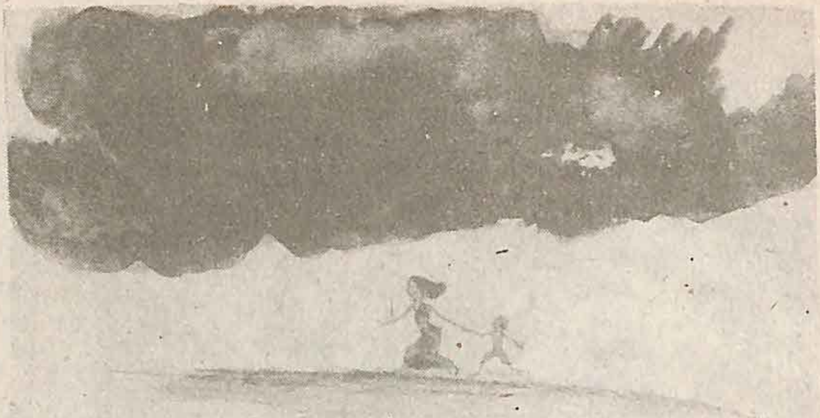
ভ্রমণ-বর্ণনে অনুপ্রাণিত করিয়া থাকে তাহা হইলেই বা কি ?—সেই বিস্মৃত শুভ যামিনীর বন্দনা মানুষে নিজের অজ্ঞাতসারে হাজার বৎসর ধরিয়া করিয়া আসিতেছে।

আগুন দিয়াই আগুন জ্বালানো যায়, ছাই-এর ঢিপিতে মশাল গুঁজিয়া কে কোথায় মশাল জ্বালে ?

দপ্তরে একখানা বই আছে,—বইখানার নাম চরিতাবলী, লেখা আছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। পুরানো বই, তাহার বাবার নানা জায়গা হইতে ছেলের জন্য বই সংগ্রহ করিবার বাতিক আছে, কোথা হইতে এখানা আনিয়াছিল, অপু মাঝে মাঝে খানিকটা খুলিয়া পড়িয়া থাকে। বইখানাতে যাঁহাদের গল্প আছে সে ঐ রকম হইতে চায়। হাটে আলু বেচিতে পাঠাইলে কৃষকপুত্র রস্কো বেড়ার ধারে বসিয়া বসিয়া বীজগণিতের চর্চা করিত, কাগজের অভাবে চামড়ার পাতে ভোঁতা আল দিয়া অঙ্ক কষিত; মেষপালক ডুবাল ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল মেষদলকে যদৃচ্ছ-বিচরণের সুযোগ দিয়া একমনে গাছতলায় বসিয়া 'ভূচিত্র' পাঠে মগ্ন থাকিত—সে ঐ রকম হইতে চায়।··· 'বীজগণিত' কি জিনিস ? সে বীজগণিত পড়িতে চায় রস্কোর মত। সে এই হাতের লেখা লিখিতে চায় না, ধারাপাত কি শুভঙ্করী এসব তাহার ভাল লাগে না। ঐ রকম নির্জন গাছতলায়, বনের ছায়ায়, কি বেড়ার ধারে বসিয়া বসিয়া সে 'ভূচিত্র' (জিনিসটা কি ?) পাতিয়া পড়িবে, বড় বড় বই পড়িবে, পণ্ডিত হইবে ঐরকম। কিন্তু কোথায় পাইবে সে-সব জিনিস ? কোথায় বা 'ভূচিত্র', কোথায় বা 'বীজগণিত', কোথায়ই বা ল্যাটিন ব্যাকরণ ?—এখানে শুধুই কড়ি কষার আর্যা, আর তৃতীয় নাম্‌তা !

মা বকিলে কি হইবে, যাহা সে পড়িতে চায়, তাহা এখানে কই ?

১৬



হরিহর মোটে পাঁচটা টাকা পাঠাইয়াছিল, তাহার পর আর পত্রও নাই, টাকাও নাই। সেও অনেকদিন হইয়া গেল—রোজ সকালে উঠিয়া সর্বজয়া ভাবে আজ ঠিক খবর আসিবে। ছেলেকে বলে, তুই খেলে খেলে বেড়াস্ বলে দেখতে পাস্‌নে, ডাক বাক্সটার কাছে বসে থাক্‌বি—পিওন যেমন আসবে আর অমনি জিগ্যেস করবি—

অপু বলে—বা, আমি বুঝি বসে থাকি নে? কালও তো এলো পুঁটুদের চিঠি, আমাদের খবরের কাগজ দিয়ে গেল—জিগ্যেস করে এস দিকি পুঁটুকে? কাল তবে আমাদের খবরের কাগজ কি করে এল? আমি থাকিনে বৈ কি?

বর্ষা রীতিমত নামিয়াছে, অপু মায়ের কথায় ঠায় রায়েদের চণ্ডীমণ্ডপে পিওনের প্রত্যাশায় বসিয়া থাকে। সাধু কর্মকারের ঘরের চালা হইতে গোলা পায়রার দল ভিজিতে ভিজিতে ঝট্‌পট্ করিয়া উড়িতে উড়িতে রায়েদের পশ্চিমের ঘরের কার্নিসে আসিয়া বসিতেছে, অপু চাহিয়া চাহিয়া দ্যাখে। আকাশের ডাককে সে ভয় করে। বিদ্যুৎ চম্‌কাইলে মনে মনে ভাবে—দেবতা কি রকম নলপাচ্চে দেখেচো, এইবার ঠিক ডাক্‌বে—পরে সে চোখ বুজিয়া কানে আঙুল দিয়া থাকে।

সকালে ঘাটে গিয়া নাপিত বউয়ের সঙ্গে দেখা হয়। সর্বজয়া কাপড়ের ভিতর হইতে কাঁসার রেকাবী বাহির করিয়া বলে, এই দ্যাখো জিনিসখানা, খুব ভালো—ভরণ না, কিছু না, ফুল কাঁসা। তুমি বলেছিলে, তাই বলি যাই নিয়ে—এ সে জিনিস নয়, এ আমার বিয়ের দানের—এখন এ জিনিস আর মেলে না।

অনেক দরদস্তুরের পর নাপিত বউ নগদ একটা আধুলি আঁচল হইতে খুলিয়া দিয়া রেকাবীখানা কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া লয়। কাউকে যেন না প্রকাশ করে, সর্বজয়া এ অনুরোধ বার বার করে।

দুই-একদিনে ঘনীভূত বর্ষা নামিল। পূবে হুহু হাওয়া—খানা ডোবা সব থৈ থৈ করিতেছে—পথে ঘাটে একহাঁটু জল, দিন রাত সোঁ সোঁ, বাঁশবনে ঝড় বাধে—বাঁশের মাথা মাটিতে লুটাইয়া লুটাইয়া পড়ে—আকাশের কোথাও ফাঁক নাই—মাঝে মাঝে একটু যেন ফর্সা দেখায়—আবার তখুনি আগেকার চেয়েও অন্ধকার করিয়া আসে—কালো কালো মেঘের রাশ হু হু উড়িয়া পূর্ব হইতে পশ্চিমে চলিয়াছে—দূর আকাশের কোথায় যেন দেবাসুরের মহাসংগ্রাম বাধিয়াছে।

মহাঝড়!

দিন রাত সোঁ সোঁ শব্দ—নদীর জল বাড়ে—কত ঘরদোর কত জায়গায় যে পড়িয়া গেল!...নদী নালা জলে ভাসিয়া গিয়াছে—গরু বাছুর গাছের তলে, বাঁশবনে, বাড়ীর ছাঁচতলায় অঝোরে দাঁড়াইয়া

ভিজিতেছে, পাখী-পাখালির শব্দ নাই কোনো দিকে। চার পাঁচ দিন সমানভাবে কাটিল—কেবল ঝড়ের শব্দ আর অবিশ্রান্ত ধারা-বর্ষণ।—অপু দাওয়ায় উঠিয়া তাড়াতাড়ি মাথা মুছিতে মুছিতে বলিল—আমাদের বাঁশতলায় জল এসেচে দিদি, দেখবি? দুর্গা কাঁথা মুড়ি দিয়া শুইয়া ছিল —না উঠিয়াই বলিল—কতখানি জল এসেচে?...অপু বলে, তোর জ্বর সারলে কাল দেখে আসিস। তেঁতুলতলার পথে হাঁটু জল! পরে জিজ্ঞাসা করে—মা কোথায় রে?...

ঘরে একটা দানা নেই—দু'টোখানি বাসি চালভাজা মাত্র আছে। অপু কান্নাকাটি করে,—তা হবে না মা, আমার খিদে পায় না বুঝি—আমি দু'টো ভাত খাবো—হুঁ-উ...

তার মা বলিল, লক্ষ্মী মাণিক আমার—ওরকম কি করে!...অনেক করে চালভাজা মেখে দেবো এখন—রাঁধবো কেমন করে? দেখচিস নে কি রকম সেঁওটা করেচে?—উনুনের মধ্যে এক উনুন জল যে! পরে সে কাপড়ের ভিতর হইতে একটা কি বাহির করিয়া হাসিমুখে দেখাইয়া বলে—এই দ্যাখ্ একটা কইমাছ, দেখি বাঁশতলায় কানে হেঁটে বেড়াচ্ছে—বন্যের জল পেয়ে সব উঠে আসচে গাঙ থেকে—বরোজপোতার ডোবা ভেসে নদীর সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে কিনা!...তাই সব উঠে আসচে—

দুর্গা কাঁথা ফেলিয়া ওঠে—অবাক হইয়া যায়। বলে, দেখি মা মাছটা! হ্যাঁ মা, কইমাছ বুঝি কানে হেঁটে বেড়ায়? আর আছে? অপু এখনি বৃষ্টিমাথায় ছুটিয়া যায় আর কি—অনেক কষ্টে তাহার মা তাহাকে থামায়।

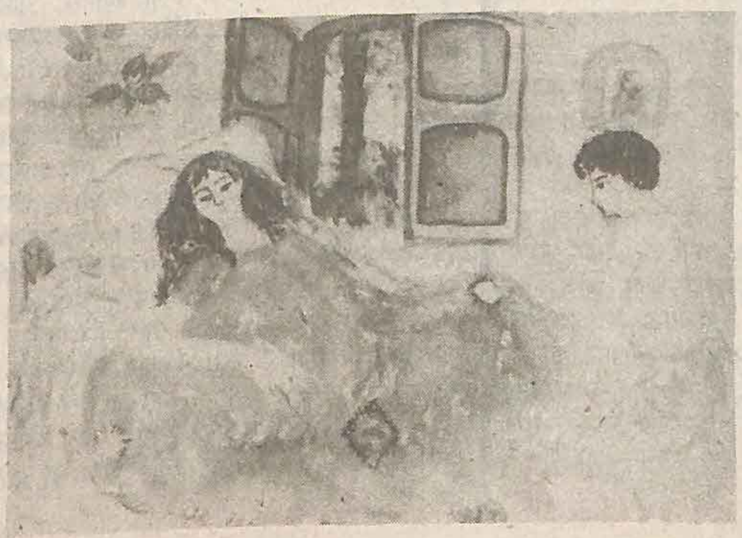
দুর্গা বলে—একটু জ্বর সারলে কাল সকালে চল্ অপু তুই আর আমি বাঁশবাগান থেকে মাছ নিয়ে আসবো এখন। পরে সে অবাক হইয়া ভাবে—বাঁশবাগানে মাছ! কি করে এল? বাঃ তো!—মা কি আর ভাল করে খুঁজেচে? খুঁজলে আরও সেখানে আছে—দেখতে পেলাম না কি রকম কইমাছ কানে হাঁটে—কাল সকালে দেখবো—সকালে জ্বর সেরে যাবে—

চারিদিকের বন-বাগান ঘিরিয়া সন্ধ্যা নামে। সন্ধ্যার মেঘে ও ত্রয়োদশীর অন্ধকারে চারিধার একাকার! দুর্গা যে বিছানা পাতিয়া শুইয়া আছে, তাহারই একপাশে তাহার মা ও অপু বসে।

ভাইবোনে শীঘ্রই তুমুল তর্ক বাধিয়া যায়। অপু সরিয়া মায়ের কাছে ঘেঁসিয়া বসে—ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেজায় শীত করে। হাসিয়া বলে—মা—কি? সেই শামলঙ্কা বাট্‌না বাটে মাটিতে লুটায় কেশ?...

দুর্গা বলে—ততক্ষণে মা আমার ছেড়ে গিয়েচেন দেশ—

অপু বলে—দূর—হাঁ মা তাই? ততক্ষণে মা



আমার ছেড়ে গিয়েচেন দেশ ?—কথা বলিয়াই সে দিদির অজ্ঞতায় হাসে।

সর্বজয়ার বুকে ছেলের অবোধ উল্লাসের হাসি শেলের মত বেঁধে। মনে মনে ভাবে—সাতটা নয়, পাঁচটা নয়—এই তো একটা ছেলে—কি অদেষ্ট যে করে এসেছিলাম—তার মুখের আবদার রাখতে পারিনে—ঘি না, লুচি না, সন্দেশ না—কিনা শুধু দুটো ভাত—নিনক্যি।...আবার ভাবে—এই ভাঙা ঘর, টানাটানির সংসার—অপু মানুষ হোলে আর এ দুঃখ থাকবে না—ভগবান তাকে মানুষ করে তোলেন যেন।...

অনেক রাত্রে সর্বজয়ার ঘুম ভাঙিয়া যায়—অপু ডাকিতেছে—মা,—ওমা ওঠো—আমার গায়ে জল পড়চে—

সর্বজয়া উঠিয়া আলো জ্বালে—বাহিরে ভয়ানক বৃষ্টির শব্দ হইতেছে—ফুটা ছাদ দিয়া ঘরের সর্বত্র জল পড়িতেছে। সে বিছানা সরাইয়া পাতিয়া দেয়। দুর্গা অঘোরে জ্বরে শুইয়া আছে—তাহার মা গায়ে হাত দিয়া দ্যাখে, তাহার গায়ের কাঁথা ভিজিয়া সপ্ সপ্ করিতেছে। ডাকিয়া বলে—দুগ্‌গা—ও দুগ্‌গা, শুনছিস ?—একটু ওঠ দিকি ? বিছানাটা সরিয়ে নি—ও দুগ্‌গা—শিগগির, একেবারে ভিজে গেল যে সব ?...

ছেলেমেয়ে ঘুমাইয়া পড়িলেও সর্বজয়ার ঘুম আসে না। অন্ধকার রাত—এই ঘন বর্ষা—তাহার মন ছম্ ছম্ করে—ভয় হয় একটা যেন কিছু ঘটিবে...কিছু ঘটিবে! বুকের মধ্যে কেমন যেন করে। ভাবে—সে মানুষেরই বা কি হোল ? কোন পত্তরও আসে না—টাকা মরুক গে যাক্! এরকম তো কোনবার হয় না ?...তাঁর শরীরটা ভাল আছে তো ? মা সিদ্ধেশ্বরী, স'পাঁচ আনার ভোগ দেবো, ভালো খবর এনে দাও মা—

তার পরদিন সকালের দিকে সামান্য একটু বৃষ্টি থামিল। সর্বজয়া বাড়ীর বাহির হইয়া দেখিল বাঁশবনের মধ্যের ছোট ডোবাটা জলে ভর্তি হইয়া গিয়াছে। ঘাটের পথে নিবারণের মা ভিজিতে ভিজিতে কোথায় যাইতেছিল, সর্বজয়া ডাকিয়া বলিল—ও নিবারণের মা শোন্—পরে সলজ্জভাবে বলিল—সেই তুই একবার বলেছিলি না খিন্দাবুশি চাদরের কথা, তোর ছেলের জন্যে—তা নিবি ?

নিবারণের মা বলিল—আছে ?—দেয়া একটু ধরুক, মোর ছেলেরে সঙ্গে করে এখনি আসবো এখন—নতুন আছে মা ঠাক্‌রোণ, না পুরোনো ?...

সর্বজয়া বলিল, তুই আয় না—এখুনি দেখবি।...একটু পুরোনো, কিন্তু সে কেউ গায়ে দেয়নি—ধোয়া তোলা আছে—পরে একটু থামিয়া বলিল—তোরা আজকাল ধান ভানচিস্ নে ?...

নিবারণের মা বলিল—এই বাদলায় কি ধান শুকোয় মা-ঠাক্‌রোণ...খাবার বলে দু'টোখানি রেখে দিইচি অমনি—

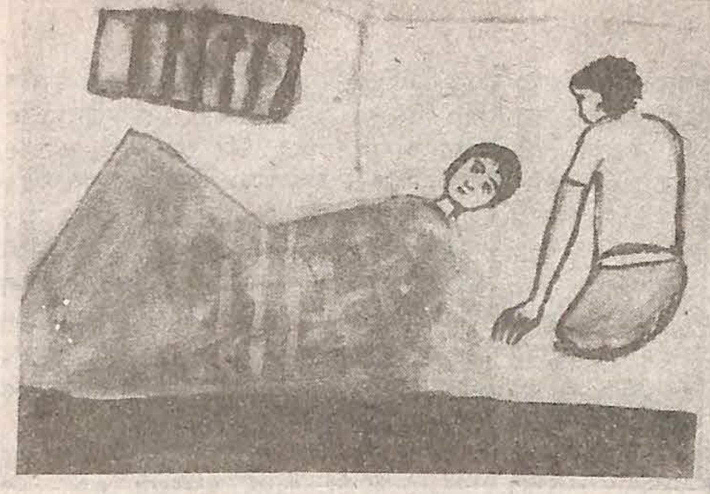
সর্বজয়া বলিল—এক কাজ কর্ না—তাই গিয়ে আমায় আধকাঠাখানেক আজ দিয়ে যাবি ?...একটু সরিয়া আসিয়া মিনতির সুরে বলিল—বৃষ্টির জন্যে বাজার থেকে চাল আনবার লোক পাচ্ছিনে—টাকা নিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চি, তা কেউ যদি রাজি হয় ? বড় মুস্কিলে পড়িচি মা—

নিবারণের মা স্বীকার হইয়া গেল, বলিল—আসবো এখন নিয়ে, কিন্তু সে ভেটেল ধানের চালির ভাত কি আপনারা খেতে পারবেন মা-ঠাক্‌রোন ?...বড্ড মোটা—

নিমছাল-সিদ্ধ দুর্গা আর খাইতে পারে না। তাহার অসুখ একভাবেই আছে। ঔষধ নাই, পথ্য নাই, ডাক্তার নাই, বৈদ্য নাই। বলে—এক পয়সার বিস্কুট আনিয়ে দেবে মা, নোন্‌তা মুখে বেশ লাগে।...সাবু তাই জোটে না, তার বিস্কুট!

বিকাল হইতে আবার ভয়ানক বৃষ্টি নামিল। বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ও যেন বেশি করিয়া আসে—ঘোর বর্ষণমুখর, নির্জন, জলে থৈ থৈ, হু হু পূবে হাওয়া বওয়া, মেঘে অন্ধকারে একাকার ভাদ্রসন্ধ্যা। আবার সেইরকম কালো কালো পেঁজা তুলোর মত মেঘ উড়িয়া চলিয়াছে...বৃষ্টির শব্দে কান পাতা যায় না—দরজা জানালা দিয়া ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্‌টার সঙ্গে বৃষ্টির ছাট্ হু হু করিয়া ঢোকে—ছেঁড়া থলে, ছেঁড়া কাপড় গোঁজা ভাঙা কপাটের আড়ালের সাধ্য কি যে ঝড়ের ভীম আক্রমণের মুখে দাঁড়ায়!

বেশী রাত্রে সকলে ঘুমাইলে বেশি বৃষ্টি নামিল। সর্বজয়ার ঘুম আসে না—সে বিছানায় উঠিয়া বসে। বাহিরে শুধু একটানা হুস্ হুস্ জলের শব্দ ; ক্রুদ্ধ দৈত্যের মত গর্জমান একটানা গোঁ-গোঁ রবে ঝড়ের দমকা বাড়ীতে বাধিতেছে।...জীর্ণ কোঠাখানা এক



একবারের দম্‌কায় যেন থরথর করিয়া কাঁপে···ভয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে লইয়া সে নিঃসহায় ! মনে মনে বলে—ঠাকুর, আমি মরি তাতে খেতি নেই—এদের কি করি ? এই রাত্তিরে যাই বা কোথায় ?···মনে মনে বসিয়া বসিয়া ভাবে—আচ্ছা যদি কোঠা পড়ে, তবে দালানের দেয়ালটা বোধ হয় আগে পড়বে—যেমন শব্দ হবে অমনি পান্‌চালার দোর দিয়ে এদের টেনে বার করে নেবো—

সে যেন আর বসিয়া থাকিতে পারে না—আজ কয়দিন সে ওলশাক কচুশাক সিদ্ধ করিয়া খাইয়া দিন কাটাইতেছে—নিজে উপবাসের পর উপবাস দিয়া ছেলেমেয়েকে যাহা কিছু সামান্য খাদ্য ছিল খাওয়াইতেছে···শরীর ভাবনায় অনাহারে দুর্বল, মাথার মধ্যে কেমন করে !

ঝড়ের গোঁ-গোঁ শব্দ, অনেক রাত্রে ঝড় বড় বাড়িল। বাহিরে কি ঝট্‌কা আসিল ! উপায় ! একবার বড় একটা দম্‌কায় ভয় পাইয়া সে ঝড়ের গতিক বুঝিবার জন্য সন্তর্পণে দালানের দুয়ার খুলিয়া বাহিরের রোয়াকে মুখ বাড়াইল···বৃষ্টির ছাটে কাপড় চুল সব ভিজিয়া গেল—হু হু একটানা হাওয়ার শব্দে বৃষ্টিপতনের শব্দ ঢাকিয়া গিয়াছে—বাহিরে কিছু দেখা যায় না—অন্ধকারে মেঘে আকাশে বাতাসে গাছপালায় সব একাকার !···ঝড়বৃষ্টির শব্দে আর কিছু শোনা যায় না।

আতঙ্কে সর্বজয়া দোর বন্ধ করিয়া দিল—আচ্ছা যদি এখন একটা কিছু ঘরে ঢোকে ? মানুষ কি অন্য কোনো জানোয়ার ? চারিদিকে ঘন বাঁশবন, জঙ্গল, লোকজনের বসতি নাই—মাগো !···জলের ছাটে ঘর ভাসিয়া যাইতেছে···হাত দিয়া দেখিল ঘুমন্ত অপুর গা জলে ভিজিয়া ন্যাতা হইয়া যাইতেছে···সে কি করে ? আর কত রাত আছে ? সে বিছানা হাতড়াইয়া দেশলাই খুঁজিয়া কেরোসিনের ডিবাটা জ্বালে। ডাকে—ও অপু, ওঠ্ তো ? জল পড়চে···অপু, শুনচিস্, ও অপু ! ওঠ্ দিকি···দুর্গাকে বলে—পাশ ফিরে শো তো দুগ্‌গা। বড্ড জল পড়চে—একটু সরে পাশ ফের্ দিকি—

অপু উঠিয়া বসিয়া ঘুমচোখে চারিদিকে চায়—পরে আবার শুইয়া পড়ে। হুড়ুম করিয়া বিষম কি শব্দ হয়, সর্বজয়া তাড়াতাড়ি আবার দুয়ার খুলিয়া বাহিরের দিকে উঁকি মারিয়া দেখিল—বাঁশবাগানের দিকটা ফাঁকা ফাঁকা দেখাইতেছে—রান্নঘরের দেওয়াল পড়িয়া গিয়াছে !···তাহার বুক কাঁপিয়া ওঠে—এইবার যদি পুরানো কোঠাটা ! কে আছে, কাহাকে সে এখন ডাকে ? মনে মনে বলে—হে ঠাকুর, আজকের রাতটা কোনোরকমে কাটিয়ে দাও, হে ঠাকুর, ওদের মুখের দিকে তাকাও—

তখনও ভাল করিয়া ভোর হয় নাই, ঝড় থামিয়া গিয়াছে কিন্তু বৃষ্টি তখনও অল্প অল্প পড়িতেছে।

পাড়ার নীলমণি মুখুয্যের স্ত্রী গোহালে গরুর অবস্থা দেখিতে আসিতেছেন, এমন সময় খিড়কীদোরে বার বার ধাক্কা শুনিয়া দোর খুলিয়া বিস্ময়ের স্বরে বলিলেন—নতুন বৌ !···সর্বজয়া ব্যস্তভাবে বলিল—ন'দি, একবার বট্ঠাকুরকে ডাকো !···একবার শিগ্‌গির আমাদের বাড়ীতে আসতে বলো—দুগ্‌গা কেমন কর্‌চে।

নীলমণি মুখুয্যের স্ত্রী আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—দুগ্‌গা ! কেন, কি হয়েছে দুগ্‌গার ?···সর্বজয়া বলিল—ক'দিন থেকে তো জ্বর হচ্ছিল—হচ্চে আবার যাচ্চে—ম্যালেরিয়া জ্বর, কাল সন্দে থেকে জ্বর বড্ড বেশি—তার উপর কাল রাত্রে কি রকম কাণ্ড তো জানই—একবার শিগ্‌গির বট্ঠাকুরকে—

তাহার বিস্রস্ত কেশ ও রাত-জাগা রাঙা রাঙা চোখের কেমন দিশাহারা চাহনি দেখিয়া নীলমণি মুখুয্যের স্ত্রী বলিলেন—ভয় কি বৌ ?—দাঁড়াও আমি এখুনি ডেকে দিচ্ছি—চল আমিও যাচ্ছি—কাল আবার রাত্তিরে গোয়ালের চালাখানা পড়ে গেল—বাবাঃ, কাল রাত্তিরের মত কাণ্ড আমি তো কখনো দেখিনি—শেষরাত্রে সব উঠে গরুটরু সরিয়ে রেখে আবার শুয়েচে কিনা। দাঁড়াও আমি ডাকি—

একটু পরে নীলমণি মুখুয্যে, তাঁর বড় ছেলে ফণি, স্ত্রী ও দুই মেয়ে সকলে অপুদের বাড়ী আসিলেন। রাত্রের অন্ধকারে সেই দৈত্যটা যেন সারা গ্রামখানা দলিত, পিষ্ট, মথিত করিয়া দিয়া আকাশ-পথে অন্তর্হিত হইয়াছে—ভাঙা গাছের ডাল, পাতা, চালের খড়, কাঁচা বাঁশপাতা, বাঁশের কঞ্চিতে পথ ঢাকিয়া গিয়াছে—ঝড়ে বাঁশ নুইয়া পথ আটকাইয়া রাখিয়াছে। ফণি বলিল—দেখেচেন বাবা কাণ্ডখানা ? সেই নবাবগঞ্জের পাকারাস্তা থেকে বিলিতি চট্‌কা গাছটার পাতা উড়িয়ে এনেচে !··· নীলমণি মুখুয্যের ছোট ছেলে একটা মরা চড়ুই পাখী বাঁশপাতার ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিল।

দুর্গার বিছানার পাশে অপু বসিয়া আছে—নীলমণি মুখুয্যে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—কি হয়েছে বাবা অপু—অপুর মুখে উদ্বেগের চিহ্ন। বলিল, দিদি কি সব বক্‌ছিল জেঠামশায়।

নীলমণি বিছানার পাশে বসিয়া বলিলেন—দেখি হাতখানা !···জ্বরটা একটু বেশি, আচ্ছা কোনো ভয় নেই—ফণি, তুমি একবার চট করে নবাবগঞ্জ চলে যাও দিকি শরৎ ডাক্তারের কাছে—একেবারে ডেকে নিয়ে আস্‌বে। পরে তিনি ডাকিলেন—দুর্গা, ও দুর্গা ! দুর্গার অঘোর আচ্ছন্ন ভাব, সাড়া শব্দ নাই। নীলমণি বলিলেন, এঃ ঘরদোরের অবস্থা বড্ড খারাপ ! জল পড়ে কাল রাত্রে ভেসে গিয়েছে···তা বৌমার লজ্জার কারণই বা কি—আমাদের ওখানে না হয় উঠ্‌লেই হোত ! হরিটারও কাণ্ডজ্ঞান আর হোল না এ জীবনে—এই অবস্থায় এই রকম ঘরদোর সারানোর একটা ব্যবস্থা না করে কি যে করচে, তাও জানিনে—চিরকালটা ওর সমান গেল—

তাঁহার স্ত্রী বলিলেন—ঘর সারাবে কি, খাবার নেই ঘরে, নৈলে কি এরকম আতান্তরে ফেলে কেউ বিদেশে যায় ? আহা, রোগা মেয়েটা কাল সারারাত ভিজেচে—একটু জল গরম করতে দাও—এই জানালাটা খুলে দাও তো ফণি।

একটু বেলায় নবাবগঞ্জ হইতে শরৎ ডাক্তার আসিলেন—দেখিয়া শুনিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। বলিয়া গেলেন যে, বিশেষ ভয়ের কারণ নাই, জ্বর বেশি হইয়াছে, মাথায় জলপটি নিয়মিতভাবে দেওয়ার বন্দোবস্ত করিবেন। হরিহর কোথায় আছে জানা নাই—তবুও তাহার পূর্ব ঠিকানায় তাহাকে একখানি পত্র দেওয়া হইল।

পরদিন ঝড়বৃষ্টি থামিয়া গেল—আকাশের মেঘ কাটিতে সুরু করিল। নীলমণি মুখুয্যে নিয়মিত দু'বেলা দেখাশোনা করিতে লাগিলেন। ঝড়বৃষ্টি থামিবার পরদিন হইতেই দুর্গার জ্বর আবার বড় বাড়িল। শরৎ ডাক্তার সুবিধা বুঝিলেন না। হরিহরকে আর একখানা পত্র দেওয়া হইল।

অপু তাহার দিদির মাথার কাছে বসিয়া জলপটি দিতেছিল। দিদিকে দু'একবার ডাকিল—ও দিদি শুনছিস, কেমন আছিস, ও দিদি। দুর্গার কেমন আচ্ছন্ন ভাব। ঠোঁট নড়িতেছে,—কি যেন আপন মনে বলিতেছে, ঘোর ঘোর। অপু মুখের কাছে কান লইয়া গিয়া দু'একবার চেষ্টা করিয়াও কিছু বুঝিতে পারিল না।

বৈকালের দিকে জ্বর ছাড়িয়া গেল। দুর্গা আবার চোখ মেলিয়া চাহিতে পারিল এতক্ষণ পরে। ভারী দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, চিঁ চিঁ করিয়া কথা বলিতেছে, ভাল করিয়া না শুনিলে বোঝা যায় না কি বলিতেছে।

মা গৃহকার্যে উঠিয়া গেলে অপু দিদির কাছে বসিয়া রহিল। দুর্গা চোখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—বেলা কত রে?

অপু বলিল—বেলা এখনও অনেক আছে—রদ্দুর উঠেচে আজ, দেখছিস দিদি। এখনও আমাদের নারকেল গাছের মাথায় রদ্দুর রয়েছে—

খানিকক্ষণ দুইজনেই কোনো কথা বলিল না। অনেক দিন পরে রৌদ্র উঠাতে অপুর ভারি আহ্লাদ হইয়াছে। সে জানালার বাহিরে রৌদ্রালোকিত গাছটার মাথায় চাহিয়া রহিল।

খানিকটা পরে দুর্গা বলিল—শোন্ অপু—একটা কথা শোন্—

কি রে দিদি? পরে সে দিদির মুখের আরও কাছে মুখ লইয়া গেল।

—আমায় একদিন তুই রেলগাড়ি দেখাবি?

—দেখাবো এখন—তুই সেরে উঠলে বাবাকে বলে আমরা সব একদিন গঙ্গা নাইতে যাবো রেলগাড়ী করে...

* * * *

সারা দিন রাত্রি কাটিয়া গেল। ঝড়বৃষ্টি কোনও কালে হইয়াছিল মনে হয় না। চারিধারে দারুণ শরতের রৌদ্র।

সকাল দশটার সময় নীলমণি মুখুয্যে অনেকদিন পরে নদীতে স্নান করিতে যাইবেন বলিয়া তেল মাখিতে বসিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রীর উত্তেজিত সুর তাঁর কানে গেল—ওগো, এসো তো একবার এদিকে শিগ্গির—অপুদের বাড়ীর দিক্ থেকে যেন একটা কান্নার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে—

ব্যাপারটা কি দেখিতে সকলে ছুটিয়া গেলেন। সর্বজয়া মেয়ের মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিতেছে—ও দুগ্গা, চা' দিকি—ও মা, ভাল করে চা' দিকি—ও দুগ্গা—

নীলমণি মুখুয্যে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—কি হয়েচে—সরো, সরো, সরো দিকি—আহাঃ, কি সব বাতাসটা বন্ধ করে দাঁড়াও!

সর্বজয়া ভাশুর সম্পর্কের প্রবীণ প্রতিবেশীর ঘরের মধ্যে উপস্থিতি ভুলিয়া গিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—ওগো কি হোল, মেয়ে আমার অমন করচে কেন?

দুর্গা আর চাহিল না।

আকাশের নীল আস্তরণ ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে অনন্তের হাতছানি আসে—পৃথিবীর বুক হইতে ছেলেমেয়েরা চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া গিয়া অনন্ত নীলিমার মধ্যে ডুবিয়া নিজেদের হারাইয়া ফেলে—পরিচিত ও গতানুগতিক পথের বহুদূরপারে কোন্ পথহীন পথে—দুর্গার অশান্ত, চঞ্চল প্রাণের বেলায় জীবনের সেই সর্বাপেক্ষা বড় অজানার ডাক আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

তখন আবার শরৎ ডাক্তারকে ডাকা হইল—তিনি বলিলেন—ম্যালেরিয়ার শেষ স্টেজটা আর কি—খুব জ্বরের পর যেমন বিরাম হয়েছে আর অমনি হার্টফেল করেছে-ঠিক এরকম একটা case হয়ে গেল সেদিন দশঘরায়—

আধঘণ্টার মধ্যে পাড়ার লোকে উঠান ভাঙিয়া পড়িল।



১৭

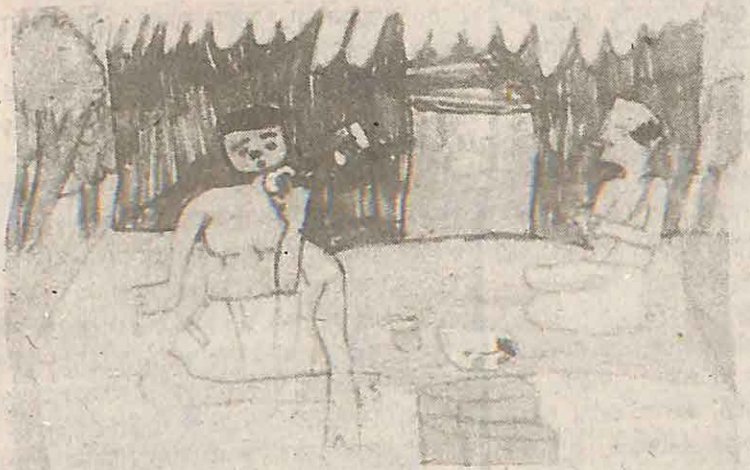
দেখিতে দেখিতে দিন কাটিয়া গেল। শীতকালও শেষ হইতে চলিয়াছে।

হরিহর পূজার পূর্বে বাড়ী ফিরিয়াছে। বাড়ীর চিঠি সে পায় নাই। অনেক ঘুরিয়া, অনেক উপবাস ও কষ্ট-স্বীকারের পর গোয়াড়ীর কাছে একটা বাড়ীতে পূজাপাঠ করিবার চাকুরী যোগাড় করিয়াছিল। নতুন চাকুরী, ছুটি পাওয়ার কথা নয়, তবুও নতুন মনিব ভাল বলিয়াই পনের দিনের ছুটি ও দশ টাকা প্রণামী মিলিয়াছিল। হরিহর অনেক আশায় মেয়ের জন্য শাড়ী ও ছেলের জন্য নতুন বই লইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু বাড়ীতে পা দিয়াই মেয়ের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তাহার আর চাকুরী করিতে যাওয়ার উৎসাহ রহিল না।

অথচ দিনও আর চলে না।

দুর্গার মৃত্যুর পর হইতেই সর্বজয়া অনবরত স্বামীকে এ-গ্রাম হইতে উঠিয়া যাইবার জন্য তাগিদ দিয়া আসিতেছিল, হরিহরও নানাস্থানে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করে নাই। কিন্তু কোন স্থানেই কোনো সুবিধা হয় নাই। সে-আশা সর্বজয়া আজকাল একরূপ ছাড়িয়াই দিয়াছে। মধ্যে গত শীতকালে হরিহরের জ্ঞাতি-ভ্রাতা নীলমণি রায়ের বিধবা স্ত্রী এখানে আসিয়াছেন ও নিজের ভিটা জঙ্গলাবৃত হইয়া যাওয়াতে ভুবন মুখুজ্যের বাড়ীতে উঠিয়াছেন। হরিহর নিজের বাড়ীতে বৌদিদিকে আনিয়া রাখিবার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইয়াছিল, কিন্তু নীলমণি রায়ের স্ত্রী রাজী হন নাই। এখানে বর্তমানে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে মেয়ে অতসী ও ছোট ছেলে সুনীল। বড় ছেলে সুরেশ কলিকাতায় স্কুলে পড়ে, গ্রীষ্মের বন্ধের পূর্বে এখানে আসিতে পারিবে না। অতসীর বয়স বছর চৌদ্দ, সুনীলের বয়স আট বৎসর। সুনীল দেখিতে তত ভাল নয়, কিন্তু অতসী বেশ সুশ্রী, তবে খুব সুন্দরী বলা চলে না। তাহা হইলেও বরাবর ইহারা লাহোরে কাটাইয়াছে—নীলমণি রায় সেখানে কমিসারিয়েটে চাকুরী করিতেন—সেখানেই ইহাদের জন্ম এবং সেখানেই লালিত-পালিত, কাজেই পশ্চিমপ্রদেশ-সুলভ নিটোল স্বাস্থ্য ইহাদের প্রতি অঙ্গে।

ইহারা এখানে প্রথম আসিলে সর্বজয়া বড়মানুষ জায়ের সঙ্গে মেশামিশি করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল। সুনীলের মা নগদে ও কোম্পানীর কাগজে দশ হাজার টাকার মালিক, একথা জানিয়া জায়ের প্রতি সম্ভ্রমে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায়, গায়ে পড়িয়া আলাপ জমাইবার চেষ্টা কম করে নাই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সর্বজয়া নির্বোধ হইলেও বুঝিতে পারিল যে সুনীলের মা তাহাকে ততটা আমল দিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার স্বামী চিরকাল বড় চাকুরী করিয়া আসিয়াছেন, তিনি ও তাঁহার ছেলেমেয়ে অন্যভাবে জীবন যাপনে অভ্যস্ত। সুরু হইতেই তিনি জ্ঞাতি-পরিবার



হরিহরদের সঙ্গে এমন একটা ব্যবধান রাখিয়া চলিতে লাগিলেন যে, সর্বজয়া আপনি হটিয়া আসিতে বাধ্য হইল। কথায়, ব্যবহারে, কাজে, খুঁটিনাটি সব ব্যাপারেই তিনি জানাইয়া দিতে লাগিলেন যে, সর্বজয়া কোনো রকমেই তাঁহাদের সঙ্গে সমানে সমানে মিশিবার যোগ্য নহে। তাঁহাদের কথাবার্তায়, পোষাক-পরিচ্ছদে, চালচলনে এই ভাবটা অনবরত প্রকাশ পায় যে, তাঁহারা অবস্থাপন্ন ঘর। ছেলেমেয়ে সর্বদা ফিট্‌ফাট্ সাজিয়া আছে, কাপড় এতটুকু ময়লা হইতে পায় না, চুল সর্বদা আঁচড়ানো, অতসীর গলায় হার, হাতে সোনার চুড়ি, কানে সোনার দুল, একপ্রস্থ চা ও খাবার না খাইয়া সকালে কেহ কোথাও বাহির হয় না, সঙ্গে পশ্চিমা চাকর আছে, সে-ই সব গৃহকর্ম করে,—মোটের উপর, সব বিষয়েই সর্বজয়াদের দরিদ্র সংসারের চালচলন হইতে উহাদের ব্যাপারে বহু পার্থক্য।

সুনীলের মা নিজের ছেলেকে গ্রামের কোনো ছেলের সঙ্গেই বড় একটা মিশিতে দেন না, অপুর সঙ্গেও নয়—পাছে পাড়াগাঁয়ের এইসব অশিক্ষিত, অসভ্য ছেলেপিলেদের দলে মিশিয়া তাঁহার ছেলেমেয়ে খারাপ হইয়া যায়। তিনি এ গ্রামে বাস করিবার জন্য আসেন নাই, জরীপের সময় নিজেদের বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে আসাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ভুবন মুখুয্যেরা ইঁহাদের কিছু জমা রাখেন, সেই খাতিরে পশ্চিম কোঠায় দু'খানা ঘর ইঁহাদের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন, রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়াও ইঁহাদের পৃথক হয়। ভুবন মুখুয্যেদের সঙ্গে ব্যবহারে সুনীলের মায়ের কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না; কারণ ভুবন মুখুয্যের পয়সা আছে, কিন্তু সর্বজয়াকে তিনি একেবারে মানুষের মধ্যেই গণ্য করেন না।

দোলের সময় নীলমণি রায়ের বড় ছেলে সুরেশ কলিকাতা হইতে আসিয়া প্রায় দিন দশেক বাড়ী রহিল। সুরেশ অপুরই বয়সী, ইংরাজী স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। দেখিতে খুব ফর্সা নয়, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। নিয়মিত ব্যায়াম করে বলিয়া শরীর বেশ বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবান। অপুর অপেক্ষা এক বৎসর মাত্র বয়স বেশী হইলেও আকৃতি ও গঠনে পনেরো ষোল বৎসরের ছেলের মত দেখায়। সুরেশও এপাড়ায় ছেলেদের সঙ্গে বড় একটা মেশে না। ওপাড়ার গাঙ্গুলী-বাড়ীর রমানাথ গাঙ্গুলীর ভাগ্নে তাহার সহপাঠী, গাঙ্গুলী-বাড়ী রামনবমী দোলের খুব উৎসব হয়, সেই উপলক্ষ্যে সেও মামার বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছে—সুরেশ অধিকাংশ সময় সেখানেই কাটায়, গাঁয়ের অন্য কোন ছেলে মিশিবার যোগ্য বলিয়া সেও বোধ হয় বিবেচনা করে না।

যে পোড়ো ভিটাটা জঙ্গলাবৃত হইয়া বাড়ীর পাশে পড়িয়া থাকিতে সে জ্ঞান অবধি দেখিতেছে, সেই ভিটার লোক ইহারা—সে হিসাবে ইহাদিগের প্রতি

অপুর একটা বিচিত্র আকর্ষণ। তাহার সমবয়সী সুরেশ কলিকাতায় পড়ে—ছুটিতে বাড়ী আসিলে তাহার সহিত আলাপ করিবার জন্য অনেকদিন হইতেই সে প্রতীক্ষায় ছিল। কিন্তু সুরেশ আসিয়া তাহার সহিত তেমন মিশিল না, তাছাড়া সুরেশের চালচলন ও কথাবার্তার ধরন এমন যে, সে যেন প্রতি পদেই দেখাইতে চায়, গ্রামের ছেলেদের চেয়ে সে অনেক বেশী উঁচু। সমবয়সী হইলেও মুখচোরা অপু তাহাতে আরও ভয় পাইয়া কাছে ঘেঁষে না।

অপু এখনও পর্যন্ত স্কুলে যায় নাই, সুরেশ তাহাকে লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিয়াছে, আমি বাড়ীতে বাবার কাছে পড়ি। দোলের দিন গাঙ্গুলীদের পুকুরে বাঁধাঘাটে জলপাইতলায় বসিয়া সুরেশ গ্রামের ছেলেদিগকে দিগ্বিজয়ী নৈয়ায়িক পণ্ডিতের ভঙ্গিতে এ-প্রশ্ন ও-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিল। অপুকে বলিল—বল তো ইণ্ডিয়ার বাউণ্ডারী কি? জিওগ্রাফী জানো?

অপু বলিতে পারে নাই। সুরেশ আবার জিজ্ঞাসা করিল, অঙ্ক কি কষেচ? ডেসিমল ফ্রাক্‌শন কষ্‌তে পারো?

অপু অতশত জানে না। না জানুক, তাহারও সেই টিনের বাক্সটাতে বুঝি কম বই আছে? একখানা নিত্যকর্ম পদ্ধতি, একখানা পুরানো প্রাকৃতিক ভূগোল, একখানা শুভঙ্করী, পাতা-ছেঁড়া বীরাঙ্গনা কাব্য একখানা, মায়ের সেই মহাভারত—এইসব। সে ঐসব বই পড়িয়াছে,—অনেকবার পড়া হইয়া গেলেও আবার পড়ে। তাহার বাবা প্রায়ই এখান-ওখান হইতে চাহিয়া চিন্তিয়া বই আনিয়া দেয়,—ছেলে খুব লেখাপড়া শিখিবে, পণ্ডিত হইবে, তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে, এ-বিষয়ে বিকারের রোগীর মত তাহার একটা অদম্য, অপ্রশমনীয় পিপাসা। কিন্তু তাহার পয়সা নাই, দূরের স্কুলের বোর্ডিং-এ রাখিয়া দিবার মত সঙ্গতির একান্ত অভাব, নিজেও খুব বেশী লেখাপড়া জানে না। তবুও যতক্ষণ সে বাড়ী থাকে, নিজের কাছে বসাইয়া ছেলেটাকে এটা ওটা পড়ায়, নানা গল্প করে, ছেলেকে অঙ্ক শিখাইবার জন্য নিজে একখানা শুভঙ্করীর সাহায্যে বাল্যের অধীত বিস্মৃত বিদ্যা পুনরায় ঝালাইয়া তুলিয়া তবে ছেলেকে অঙ্ক কষায়। যাহাতেই মনে করে ছেলের জ্ঞান হইবে, সেইটাই হয় ছেলেকে পড়িতে দেয়, নতুবা পড়িয়া শোনায়। সে বহুদিন হইতে, 'বঙ্গবাসী'র গ্রাহক, অনেক দিনের পুরানো 'বঙ্গবাসী' তাহাদের ঘরে জমা আছে; ছেলে বড় হইলে পড়িবে, এজন্য হরিহর সেগুলিকে সযত্নে বাণ্ডিল বাঁধিয়া তুলিয়া রাখিয়া দিয়াছিল, এখন সেগুলি কাজে লাগিতেছে। মূল্য দিতে না পারায় নূতন কাগজ আর তাহাদের আসে না, কাগজওয়ালা কাগজ দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ছেলে যে এই 'বঙ্গবাসী' কাগজখানার জন্য কিরূপ পাগল, শনিবার দিনটা খেলাধূলা ফেলিয়া কেমন করিয়া সে যে ভুবন মুখুয্যের চণ্ডীমণ্ডপে ডাকবাক্সটার কাছে পিওনের প্রত্যাশায় হাঁ করিয়া বসিয়া থাকে—হরিহর তাহা খুব জানে বলিয়া ছেলের আদরের জিনিসটা যোগাইতে না পারিয়া তাহার বুকের ভিতর বেদনায় টন্‌টন্ করে।

অপু তবুও পুরাতন 'বঙ্গবাসী' পড়িয়া অনেক গল্প শিখিয়াছে। পটুর কাছে বলে—লিউকা ও রাফেল, মার্টিনিক দ্বীপের অগ্ন্যুৎপাত, সোনাকরা যাদুকরের গল্প, আর কত কথা! কিন্তু স্কুলের লেখাপড়া তাহার কিছুই হয় না। মোটে ভাগ পর্যন্ত অঙ্ক জানে, ইতিহাস নয় ব্যাকরণ নয়, জ্যামিতি-পরিমিতির নাম শোনে নাই, ইংরাজির দৌড় ফার্স্ট বুকের ঘোড়ার পাতা।

ছেলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহার মায়ের একটু অন্যরূপ ধারণা। সর্বজয়া পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। ছেলে স্কুলে পড়িয়া মানুষ হইবে এ উচ্চ আশা তাহার নাই। তাহার পরিচিত মহলে কেহ কখনো স্কুলের মুখ দেখে নাই। তাহাদের যেসব শিষ্যবাড়ী আছে, ছেলে আর কিছুদিন পরে সে-সব ঘরে যাতায়াত করিবে, সেগুলি বজায় রাখিবে, ইহাই তাহার বড় আশা। আরও একটা আশা সর্বজয়া রাখে। গ্রামের পুরোহিত দীনু ভট্টাচার্য বৃদ্ধ হইয়াছেন। ছেলেরাও কেহ উপযুক্ত নয়। রাণীর মা, গোকুলের বৌ, গাঙ্গুলী-বাড়ীর বড়বধূ সকলেই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহারা ইহার পর অপুকে দিয়া কাজকর্ম করাইবেন, দীনু ভট্টাচার্যের অবর্তমানে তাঁহার গাঁজাখোর পুত্র ভোম্বলের পরিবর্তে নিষ্পাপ, সরল ও সুশ্রী এই ছেলেটি গ্রামের মনসা-পূজায় লক্ষ্মীপূজায় তাহাদের আয়োজনের সঙ্গী হইয়া থাকিবে, গ্রামের মেয়েরা এই চায়। অপুকে সকলেই ভালবাসে। ঘাটে পথে প্রতিবেশিনীদের মুখে এ-ইচ্ছা প্রকাশ করিতে সর্বজয়া অনেকবার শুনিয়াছে, এবং এইটাই বর্তমানে তাহার সব চেয়ে



উচ্চ আশা। সে গরীব ঘরের মেয়ে, গরীব ঘরের বধূ, ইহা ছাড়া অন্য কোনো উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ধারণা তাহার নাই। এই যদি ঘটে তাহা হইলেই শেষ রাত্রের স্বপ্নকে সে হাতের মুঠোয় পায়।

একদিন একথা ভুবন মুখুয্যের বাড়ীতে উঠিয়াছিল। দুপুরের পর সেখানে তাসের আড্ডায় পাড়ার অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সর্বজয়া সকলের মন যোগাইবার ভাবে বলিল—এই বড় খুড়ী আছেন, ঠাকুমা আছেন, মেজদি আছেন, এঁদের যদি দয়া হয় তবে অপুর আমার সামনের ফাল্গুনে পৈতেটা দিয়ে নিলে গাঁয়ের পূজোটাতে সে হাত দিতে পারে। ওর আমার তাহলে ভাবনা কি? আট-দশ ঘর শিষ্য-বাড়ী আছে, আর মা সিদ্ধেশ্বরীর ইচ্ছায় গাঙ্গুলী-বাড়ীর পূজোটা যদি বাঁধা হয়ে যায় তাহলেই—

ভুবন মুখুয্যের বাড়ীর বাহিরে আসিয়া সর্বজয়া ছেলেকে বলিল—শোন্ একটা কথা-পরে চুপি চুপি বলিল—তোর জেঠীমার কাছে গিয়ে বলিস্ না যে জেঠীমা আমার জুতো নেই, আমায় একজোড়া জুতো দাও না কিনে—

অপু বলিল, কেন মা?

বলিস্ না, বড়লোক ওরা, চাইলে হয়তো ভাল একজোড়া জুতো দেবে এখন—দেখিসনি যেমন সুরেশের পায়ে আছে? তোর পায়ে ওই রকম লাল জুতো বেশ মানায়—

অপু লাজুক মুখে বলিল—আমার বড় লজ্জা করে মা, আমি বলতে পারবো না—কি হয়তো ভাববে—আমি—

সর্বজয়া বলিল—তা এতে আবার লজ্জার কি! আপনার জন—বলিস্ না, তাতে কি?

হুঁ...উ—আমি বল্‌তে পার্‌বো না মা। আমি কথা বল্‌তে পারিনে জেঠীমার সাম্‌নে—

সর্বজয়া রাগ করিয়া বলিল—তা পারবে কেন? তোমার যত বিদ্যে সব ঘরের কোণে—খালি পায়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছো, আজ দু'বছর পায়ে জুতো নেই, সে ভালো। বড় লোক, চাইলে হয়তো দিয়ে দিত কিনে—তা তোমার মুখ দিয়ে তো বাক্যি বেরুবে না, মুখচোরার রাজা—

* * * *

পূর্ণিমার দিন রাণীদের বাড়ী সত্যনারায়ণের পূজার প্রসাদ আনতে অপু সেখানে গেল। রাণী তাহাকে ডাক দিয়া হাসিমুখে বলিল—আমাদের বাড়ী তো আগে আগে কত আস্‌তিস্, আজকাল আসিস্ নে কেন রে?

কেন আসবো না রাণুদি?—আসি তো।

রাণী অভিমানের সুরে বলিল, হ্যাঁ, আসিস, ছাই আসিস্। আমি তোর কথা কত ভাবি! তুই ভাবিস্ আমাদের কথা?

না বৈ কি ? বা রে—মাকে জিগ্যেস করে দেখো দিকি ?

এ ছাড়া অন্য কোনো সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ তাহার যোগাইল না। রাণী তাহাকে সেখানে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া নিজে গিয়া তাহার জন্য ফল প্রসাদ ও সন্দেশ লইয়া আসিয়া হাতে দিল। হাসিয়া বলিল, থালা শুদ্ধ নিয়ে যা, আমি কাল গিয়ে খুড়ীমার কাছ থেকে নিয়ে আসবো—

রাণীর মুখের হাসিতে তাহার উপর একটা পরম নির্ভরতার ভাব আসিল অপুর। রাণুদি কি সুন্দর দেখিতে হইয়াছে আজকাল, রাণুদির মত সুন্দরী এ পর্যন্ত অন্য কোনো মেয়ে সে দেখে নাই। অতসীদি সর্বদা বেশ ফিট্‌ফাট্ থাকে বটে, কিন্তু দেখিতে রাণুদির কাছে লাগে না। তাহা ছাড়া অপু জানে, এ গ্রামের মেয়েদের মধ্যে রাণুদির মত মন কোনো মেয়ের নয়। দিদির পরেই যদি সে কাহাকেও ভালবাসে তো সে রাণুদি। রাণুদিও যে তাহার দিকে টানে, তাহা কি আর অপু জানে না ?

সে থালা তুলিয়া চলিয়া যাইবার সময় একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—রাণুদি, তোমাদের এই পশ্চিমের ঘরের আলমারীতে যে বইগুলো আছে সতুদা পড়তে দেয় না। একখানা দেবে পড়তে ? পড়েই দিয়ে যাবো।

রাণী বলিল—কোন্ বই আমি তো জানিনে, দাঁড়া আমি দেখ্‌চি—

সতু প্রথমে কিছুতেই রাজী হয় না, অবশেষে বলিল—আচ্ছা, পড়তে দিই যদি এক কাজ করিস্ ? আমাদের মাঠের পুকুরে রোজ মাছ চুরি যাচ্ছে—জেঠামশায় আমাকে বলেছেন, সেখানে গিয়ে দুপুরবেলা চৌকি দিতে,—আমার সেখানে একা একা ভাল লাগে না, যদি যাস্ আমার বদলে তবে বই পড়তে দেবো—

রাণী প্রতিবাদ করিয়া বলিল, বেশ তো! ও ছেলেমানুয সেই বনের মধ্যে বসে মাছ চৌকি দেবে বৈ কি। তুমি বুড়ো ছেলে পারো না, আর ও যাবে ? যাও তোমার বই দিতে হবে না, আমি বাবার কাছে চেয়ে দেবো—

অপু কিন্তু রাজী হইল। রাণীর বাবা ভুবন মুখুয্যে বিদেশে থাকেন, তাঁহার আসিবার অনেক দেরী, অথচ এই বইগুলোর উপর তাহার বড় লোভ। এগুলি পড়িবার লোভে সে কতদিন লুব্ধচিত্তে পশ্চিমের ঘরটায় যাতায়াত করিয়াছে। দু'-একখানা একটু আধটু পড়িয়াছেও। কিন্তু সতু নিজে তো পড়েই না, তাহাকেও পড়িতে দেয় না। নায়কের ঠিক সঙ্কটময় মুহূর্তটিতেই হাত হইতে বই কাড়িয়া লইয়া বলে—রেখে দে অপু, এ সব ছোট কাকার বই, ছিঁড়ে যাবে, দে।...

অপু হাতে স্বর্গ পাইয়া গেল।

প্রতিদিন দুপুরবেলা সে আলমারী হইতে বাছিয়া বাছিয়া এক একখানি করিয়া বই সতুর নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া যায় ও বাঁশবনের ছায়ায় কতকগুলো শেওড়াগাছের কাঁচা ডাল পাতিয়া তাহার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া একমনে পড়ে। বই অনেক আছে, একখানি করিয়া সে ধরে, একবার আরম্ভ করিলে আর ছাড়িতে পারা যায় না—চোখ টাটাইয়া ওঠে, পুকুর-ধারের নির্জন বাঁশবনের ছায়া ইতিমধ্যে কখন দীর্ঘ হইয়া মজা পুকুরটার পাটা-শেওলার দামে নামিয়া আসে, তার খেয়ালই থাকে না কোন্ দিক দিয়া বেলা গেল।

বই শেষ করিতে করিতে অপুর চোখ জলে ঝাপ্‌সা হইয়া আসে। গলায় কি যেন আটকাইয়া যায়। আকাশের দিকে চোখ চাহিয়া সে খানিকক্ষণ কি ভাবে—আনন্দে, বিস্ময়ে তাহার দুই কান দিয়া যেন আগুন বাহির হইতে থাকে—পরে রুদ্ধনিঃশ্বাসে পরবর্তী বইয়ে মন দেয়। সন্ধ্যা হইয়া যায়, চারিধারে ছায়া দীর্ঘ হইয়া আসে, মাথার উপর বাঁশঝাড়ে কত কি পাখীর ডাক সুরু হয়, উঠি উঠি করিয়াও বইয়ের পাতার এক ইঞ্চি ওপরে চোখ রাখিয়া পড়িতে থাকে যতক্ষণ অক্ষর দেখা যায়।

এরকম বই তো সে কখনো পড়ে নাই। কোথায় লাগে সীতার বনবাস আর ডুবালের গল্প !

বাড়ী আসিলে তাহাকে মা বকে—এমন হাব্‌লা ছেলেও তুই ! পরের মাছ চৌকি দিস্ গিয়ে সেই একলা বনের মধ্যে বসে একখানা বই পড়বার লোভে ? আচ্ছা বোকা পেয়েছে তোকে—

কিন্তু বোকা অপুর লাভ যেদিক দিয়া আসে, তাহার মায়ের সেদিকের কোন ধারণাই নাই। আজকাল সে একখানা বই পাইয়াছে, মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত ও রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা। ...উইঢিপি, বৈঁচিবনের প্রেক্ষাপটে নিস্তব্ধ দুপুরের মায়ায় দৃশ্যের



পর দৃশ্য পরিবর্তিত হইয়া চলে—জেলেখা নদীর উপর বসিয়া আহত নরেনকে শুশ্রূষা করিত, আওরঙ্গজেবের দরবারে নিজেকে পাঁচহাজারী মনসবদারের মধ্যে স্থান পাইতে দেখিয়া শিবাজী রাগে ফুলিয়া ভাবিতেন—শিবাজী পাঁচহাজারী ? এক বার পুণায় যাও তো, শিবাজীর ফৌজে কত পাঁচহাজারী মনসবদার আছে একবার গুনিয়া আসিবে !

রাজবারার মরুপর্বতে, দিল্লীর আগ্রার রঙমহাল শিস্‌মহালে তাহার সারা দিনমান কাটে—এ কোন্ জগৎ যেখানে শুধু জ্যোৎস্না, তলোয়ার খেলা, সুন্দর মুখের বন্ধুত্ব, আহেরিয়া-উৎসবে দীর্ঘ বর্শা হাতে ঘোড়ায় চড়িয়া পাহাড় মাঠ পার হইয়া ছোটা।

বীরের যাহা সাধ্য, রাজপুতের যাহা সাধ্য, মানুষের যাহা সাধ্য, প্রতাপসিংহ তাহা করিয়াছিলেন। হল্‌দীঘাটের পার্বত্যবর্ত্মের প্রতি পাষাণফলকে তাহার কাহিনী লেখা আছে। দেওয়ারের রণক্ষেত্রের দ্বাদশ সহস্র রাজপুতের হৃদয়-রক্তে তাহার কাহিনী লেখা আছে।

বহুদিন পরেও প্রাচীন মোগল যোদ্ধগণ অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে পৌত্র-পৌত্রীগণের নিকট বসিয়া হল্‌দীঘাটের অদ্ভুত বীরত্বের কথা বলিত।

অদৃশ্যহস্ত-নিক্ষিপ্ত একটি বর্শা আসিল—অপু এই গ্রামের চিরশ্যাম বনভূমির ছায়ায়, লতাপাতার নিবিড়তায়, ভিজা মাটির গন্ধে মানুষ হইয়াছে—তবুও সে জানে রাজপুতানার ভীল প্রদেশের বা আরাবল্লী-মেবারের প্রত্যেকটি স্থান ; নাহারা মগ্‌রোর অপূর্ব বন্যসৌন্দর্য সে ভাল করিয়াই চেনে। পর্বত হইতে অবতরণশীল শস্ত্রপাণি তেজসিংহের মূর্তি কি সুন্দর মনে হয়।

"সেই চপ্পন প্রদেশে অনেকদিন অবধি সেই ভীল গ্রামের নির্জন কন্দরে ও উন্নত শিখরে রজনী দ্বিপ্রহরের সময় একটি রমণী-কণ্ঠ-নিঃসৃত গীত শ্রুত হইত। অতি প্রত্যুষে নির্জন প্রান্তরে, পথিকগণ কখন কখন একটি রমণীর পাণ্ডুর মুখ ও চঞ্চল নয়ন দেখিতে পাইত, লোকে বলিত কোন বিশ্রামশূন্যা উদ্বিগ্না বনদেবী হইবে।"...সেই গানের অস্পষ্ট করুণ মূর্চ্ছনা যেন অপুদের বাঁশবাগানের পিছন হইতে ভাসিয়া আসে !...

কমলমীর, সূর্যগড়ের যুদ্ধ, সেনাপতি শাহাবাজ খাঁ, সুন্দরী নূরজাহান, পুষ্পকুমারী, বন্য ভীল প্রদেশ, বীর বালক চন্দনসিংহ...দূর, সুদূর কল্পনা। তবু কত নিকট, কত বাস্তব মনে হয়।—রাজবারার মরুভূমি আর নীল আরাবল্লীর উন্নত পর্বতের শিখরে শিখরে চেনার বৃক্ষের ফুল ফুটিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে, দেবী মিবার-লক্ষ্মীর অলক্তরক্ত পদচিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে বুনাস ও বীর নদীর তটভূমির শিলাখণ্ডে, ঝরণার উপরাশির উপরে, বাজ্‌রা ও জওয়ার ক্ষেতে ও মোউল বনে।...

চিতোর রক্ষা হইল না। রাণা অমরসিংহ বাদশাহের সম্মান গ্রহণ করিলেন। সর্বহারা পিতা প্রতাপসিংহ, যিনি পঁচিশ বৎসর ধরিয়া বনে পর্বতে, ভীলের পাল লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনি ব্যথাক্ষুব্ধ চিত্তে কোথা হইতে দেখিয়াছিলেন এসব ?—

চোখের জলে পুকুর, উইঢিবি, বৈঁচিবন—সব ঝাপ্সা হইয়া আসে।

সেদিন দুপুরে তাহার বাবা একটা মোড়ক দেখাইয়া হাসিমুখে বলিল—দ্যাখো তো বাবা খোকা, কি বলো দিকি ?

অপু তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠিয়া বসিল—উৎসাহের সুরে বলিল—খবরের কাগজ ? না বাবা ?

সেদিন রামকবচ লিখিয়া দিয়া বেহারী ঘোষের শাশুড়ীর নিকট সে তিনটি টাকা পাইয়াছে, স্ত্রীকে গোপন করিয়া হরিহর তারই মধ্যে দু'টাকা খবরের কাগজের দাম পাঠাইয়া দিয়াছিল, স্ত্রী জানিতে পারিলে অন্য পাঁচটা অভাবের গ্রাস হইতে টাকা দুইটাকে বাঁচানো যাইত না।

অপু বাবার হাত হইতে তাড়াতাড়ি কাগজের মোড়কটা লইয়া খুলিয়া ফেলে। হাঁ—খবরের কাগজ বটে। সেই বড় বড় অক্ষরে 'বঙ্গবাসী' কথাটা লেখা, সেই নতুন কাগজের গন্ধটা, সেই ছাপা, সেই সব—যাহার জন্য বৎসর খানেক পূর্বে সে অধীর আগ্রহে তীর্থের কাকের মত ভুবন মুখুয্যেদের চণ্ডীমণ্ডপের ডাকবাক্সটার কাছে পিওনের অপেক্ষায় প্রতি শনিবার হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিত। খবরের কাগজ! খবরের কাগজ! কি সব নতুন খবর না জানি দিয়াছে! কি অজানা সব কথা লেখা আছে ইহার বড় বড় পাতায়!

হরিহরের মনে হয় দুইটি টাকার বিনিময়ে ছেলের মুখে যে আনন্দের হাসি সে ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তাহার তুলনায় কোন্ বন্ধকী মাক্ড়ী খালাসের আত্মপ্রসাদ বেশী হইত ?

অপু দেখাইয়া বলে—দ্যাখো বাবা, একজন 'বিলাতযাত্রীর চিঠি' বেরিয়েছে, আজ থেকেই নতুন বেরুলো, খুব সময়ে আমাদের কাগজটা এসেচে—না বাবা ?

তবুও তাহার মনে দুঃখ থাকিয়া যায় যে, গত বছর কাগজখানা হঠাৎ উহারা বন্ধ করিয়া দেওয়াতে জাপানী মাকড়সাসুরের গল্পটার শেষভাগ তাহার পড়া হয় নাই, রাইকো রাজসভায় যাওয়ার পর তাহার যে কি ঘটিল তাহা সে জানিতে পারে নাই।

একদিন রাণী বলিল—তোর খাতায় কি লিখ্চিস রে!

অপু বিস্ময়ের সুরে বলিল—কোন্ খাতায় ? তুমি কি করে—

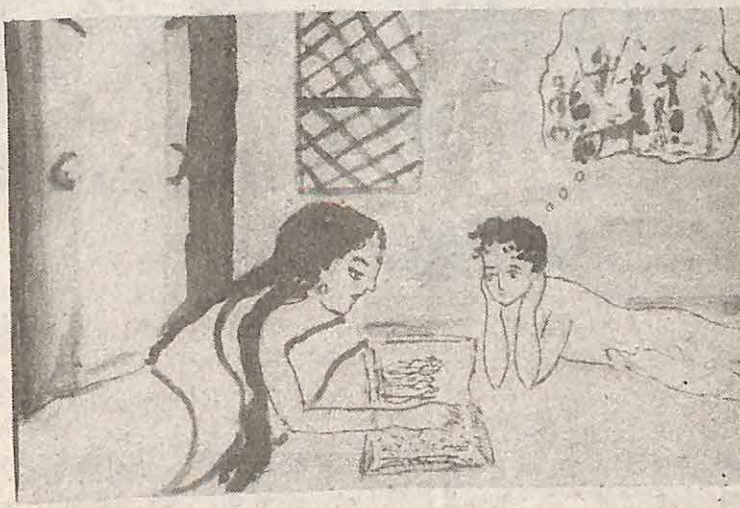
—আমি তোদের বাড়ী সেদিন দুপুরে যাইনি বুঝি ? তুই ছিলিনে—খুড়ীমার সঙ্গে কতক্ষণ বসে কথা বোল্লাম—কেন, খুড়ীমা তোকে বলেনি ? তাই দেখলাম তোর বইয়ের দপ্তরে তোর সেই রাঙা খাতাখানায় কি সব লিখিচিস্—আমার নাম রয়েছে, আর কি দেবীসিং না কি—

অপু লজ্জায় লাল হইয়া বলিল—ও একটা গল্প—

—কি গল্প রে ? আমায় কিন্তু পড়ে শোনাতে হবে—

পরদিন রাণী একখানা ছোট্ট বাঁধান খাতা অপুর হাতে দিয়া বলিল, এতে তুই আমাকে একটা গল্প লিখে দিস্—একটা বেশ ভাল দেখে—দিবি তো ? অতসী বলছিল, তুই আবার লিখ্তে পারিস্ নাকি! লিখে দে, আমি অতসীকে দেখাবো—

অপু রাত্রে বসিয়া খাতা লেখে। মাকে বলে—আর একটা পলা তেল দাও না মা ? এইটুকু লিখে রাখি আজ। তাহার মা বলে—আজ রাত্তিরে আর পড়ে না—মোটে দু'পলা তেল আছে, কাল আবার রাঁধ্বো কি দিয়ে ? এই এখানে রাঁধ্চি, এই আলোতে বসে পড়। অপু ঝগড়া করে। মা বকে—এঃ, ছেলের রাত্তির হোলে যত পড়ার চাড়—সারাদিন চুলের টিকি দেখবার যো নেই—সকালে করিস্ কি ? যা তেল দেবো না। অবশেষে অপু উনুনের পাড়ে কাঠের আগুনের আলোয় খাতাখানা আনিয়া বসে। সর্বজয়া ভাবে—অপু আর একটু বড় হোলে আমি ওকে ভাল দেখে বিয়ে দেবো—এ ভিটেতে নতুন পাকাবাড়ী উঠবে—আসছে বছর ওর পৈতেটা দিয়ে নি, তারপর গাঙ্গুলী-বাড়ীর পূজোটা যদি বাঁধা হয়ে যায়—



চার পাঁচ দিন পরে সে রাণীর হাতে খাতা ফিরাইয়া দিল। রাণী আগ্রহের সহিত খাতা খুলিতে খুলিতে বলিল— লিখেচিস্। অপু হাসি হাসি মুখে বলিল—দ্যাখো না খুলে ? রাণী দেখিয়া খুশির সুরে বলিল—ওঃ অনেক লিখেচিস যে রে! দাঁড়া অতসীকে ডেকে দেখাই—

অতসী দেখিয়া বলিল—অপু লিখেচে না আরো কিছু—ইস্!...এ-সব বই দেখে লেখা—

অপু প্রতিবাদের সুরে বলিল—ইঃ, বই দেখে বৈ কি! আমি তো গল্প বানাই—পটুকে জিজ্ঞেসা করো দিকি অতসীদি! ওকে বিকেলে গাঙের ধারে বসে বসে কত বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলিনে বুঝি ?

রাণী বলিল—না ভাই, ও-ই লিখেচে আমি জানি। ও ওই রকম লেখে। খাসা যাত্রার পালা লিখেছিল খাতাতে, আমায় পড়ে শোনালে। পরে অপুকে বলিল—নাম লিখে দিস্নি তোর ? নাম লিখে দে—

অপু এবার একটু অপ্রতিভের সুরে বলিল যে, গল্পটা তাহার শেষ হয় নাই, হইলেই নাম লিখিয়া দিবে এখন। সচিত্র যৌবনে-যোগিনী নাটকের ধরণে গল্পটা আরম্ভ করিলেও শেষটা কিরূপ হইবে সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে নাই, অথচ দীর্ঘ দিন কাছে খাতা থাকিলে রাণুদি, বিশেষ করিয়া অতসীদি পাছে তাহার কবি প্রতিভা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়ে, কাজেই অর্ধসমাপ্ত অবস্থাতেই সেখানা সে ফেরৎ দিয়াছে।

১৮



লেখাপড়া বড় একটা তাহার হয় না, সে এই সবই করিয়া বেড়ায়—ফলার খাওয়া, ছাঁদা বাঁধা, বাপের সঙ্গে শিষ্য বাড়ী যাওয়া, মাছধরা...পটু এসব বিষয়ে অপুর সঙ্গী। আজকাল সে আরও বড় হইয়াছে। মাথাতে লম্বা হইয়াছে, সব সময় অপু-দার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ায়, ও-পাড়া হইতে এ-পাড়ায় আসে শুধু অপু-দার সঙ্গে খেলিতে, আর কাহারও সঙ্গে সে বড় একটা মেশে না, তাহাকে বাঁচাইতে গিয়া অপু-দা যে জেলের ছেলেদের হাতে মার খাইয়াছিল সেকথা সে এখনও ভোলে নাই।

মাছ ধরিবার সখ অপুর অত্যন্ত বেশী। সোনাডাঙা মাঠের নীচে ইছামতীর ধারে কাঁচিকাটা খালের মুখে ছিপে খুব মাছ ওঠে। প্রায়ই সে এইখানটিতে গিয়া নদীতীরে একটা বড় ছাতিম গাছের তলায় মাছ ধরিতে বসে। স্থানটা তাহার ভারী ভালো লাগে, একেবারে নির্জন, দু'ধারে নদীর পাড়ে কত কি গাছপালা নদীর জলে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, ওপারে ঘন সবুজ উলুবন, মাঝে মাঝে লতাদোলানো কদম, শিমুল গাছ, বেগুনী রঙের বনকলমী ফুলে ছাওয়া ঝোপ, দূরে মাধবপুর গ্রামের বাঁশবন, পাখীর ডাকে বনের ছায়ায় উলুবনের শ্যামলতায় মেশামেশি স্নিগ্ধ নির্জনতা। সেই ছেলেবেলায় প্রথম কুঠীর মাঠে আসার দিনটি হইতে এই মাঠ-বন-নদীর কি মোহ যে তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে, ছিপ ফেলিয়া ছাতিম গাছের ছায়ায় বসিয়া চারিদিকে চাহিতেই তাহার মন অপূর্ব পুলকে ভরিয়া ওঠে। মাছ হোক বা না হোক, যখনই ঘন বৈকালের ছায়া মাঠের ধারের খেজুরঝোপের ডাঁসা খেজুরের গন্ধে ভরপুর হইয়া উঠে, স্নিগ্ধ বাতাসে চারিধার হইতে বৌ-কথা-কও, পাপিয়ার ডাক ভাসিয়া আসে, ডালে ডালে অভ্র-আবীর ছড়াইয়া সূর্যদেব সোনাডাঙার মাঠের সেই ঠ্যাঙাড়ে বটগাছটার আড়ালে হেলিয়া পড়েন, নদীর জল কালো হইয়া যায়, গাঙশালিকের দল কলরব করিতে করিতে বাসায় ফেরে, তখনই তাহার মন খুশি হইয়া ওঠে, পুলক-ভরা চোখে সে চারিদিকে দেখে : মনে হয় মাছ না পাওয়া গেলেও রোজ রোজ সে এইখানটিতে আসিয়া বসিবে, ঠিক এই বড় ছাতিম গাছের তলাটাতে।

মাছ প্রায়ই হয় না, শরের ফাৎনা স্থির জলে দণ্ডের পর দণ্ড নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপশিখার মত অটল। একস্থানে অতক্ষণ বসিয়া থাকিবার ধৈর্য তাহার থাকে না, সে এদিকে-ওদিকে ছটফট করিয়া বেড়ায়, ঝোপের মধ্যে পাখীর বাসা খোঁজে, ফিরিয়া আসিয়া হয়ত চোখে পড়ে ফাৎনা একটু একটু ঠুক্‌রাইতেছে। ছিপ তুলিয়া বলে, দূর! ঝেঁয়া মাছের ঝাঁক লেগেচে, এখানে কিছু হবে না। পরে সেখান হইতে ছিপ তুলিয়া একটু দূরে শেওলা-দামের পাশে ছিপ তুলিয়া ফেলে। জলটার গভীর কালো রঙে মনে হয় রুই

কাৎলা মাছ এখনি ছিপে লাগে আর কি ! ভ্রম ঘুচিতে বেশী দেরী হয় না, শরের ফাৎনা নির্বিকল্প-সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

এক একদিন সে কোনো একখানা বই সঙ্গে করিয়া আনিয়া বসে।

ছিপ ফেলিয়া বই খুলিয়া পড়ে। সুরেশের কাছে সে একখানা পুরাতন ক্লাসের ছবিওয়ালা ইংরাজী বই ও তাহার অর্থপুস্তক চাহিয়া লইয়াছে। ইংরাজী সে বুঝিতে পারে না, অর্থপুস্তক দেখিয়া গল্পের বাংলাটা বুঝিয়া লয় ও ইংরাজী বইখানিতে ছবি দেখে। দূরদেশের কথা ও সকল রকম মহত্ত্বের কাহিনী ছেলেবেলা হইতেই তাহার মনকে বড় দোলা দেয়, এই বইখানাতে সে-ধরণের অনেকগুলি গল্প আছে—কোথাকার মুক্ত প্রান্তরে একজন ভ্রমণকারী বিষম তুষার-ঝটিকার মধ্যে পড়িয়া পথ হারাইয়া চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে শীতে প্রাণ হারায়, অজানা মহাসমুদ্রে পাড়ি দিয়া ক্রিস্টোফার কলম্বাস কিরূপে আমেরিকা আবিষ্কার করিলেন—এমন সব গল্প। যে-দু'টি ইংরাজ বালক-বালিকা সমুদ্রধারের শৈলগাত্রে গাংচিল পাখীর বাসা হইতে ডিম সংগ্রহ করিতে গিয়া বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছিল, যে সাহসিনী বালিকা প্রাস্কোভিয়া লপুলফ্ নির্বাসিত পিতার নির্বাসনদণ্ড প্রত্যাহার করাইবার আশায় জনহীন তুষারাবৃত প্রান্তরের পথে সুদূর সাইবেরিয়া হইতে একা বাহির হইয়াছিল, তাহাদের যেন সে দেখিলেই চিনিতে পারে। সার ফিলিপ সিডনীর ছোট্ট গল্পটুকু পড়িয়া তাহার চোখ জলে ভরিয়া যায়। সুরেশকে গিয়া জিজ্ঞাসা করে—সুরেশ-দা, এই গল্পটা জানো তুমি ? বড় করে বলো না !

সুরেশ বলে—ও জুট্‌ফেনের যুদ্ধের কথা—

অপু অবাক হইয়া বলে—কি নাম সুরেশ-দা ? জুট্‌ফেন। কোথায় সে ? সুরেশ ঐটুকুর বেশী আর বলিতে পারে না।

মাসখানেক পরে একদিন।

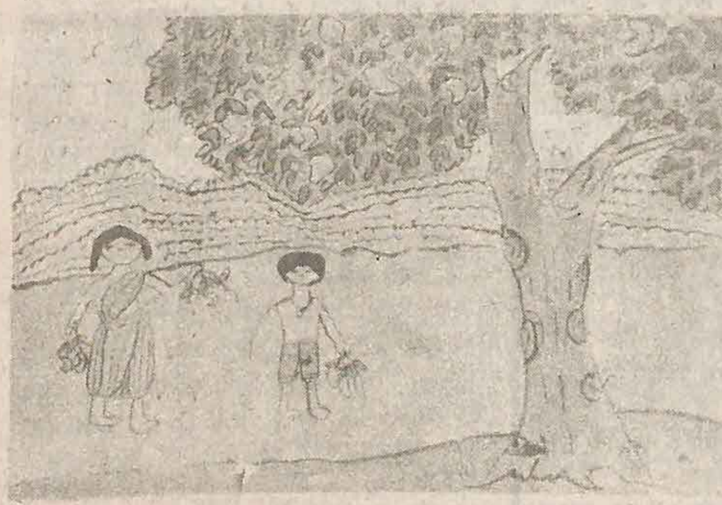
মাছ ধরিতে গিয়া একটা সরপুঁটি মাছ কি করিয়া তাহার ছিপে উঠিয়া গেল।

লোভ পাইয়া সে-জায়গাটি আর অপু ছাড়ে না—গাছের ডালপালা ভাঙিয়া আনিয়া বিছাইয়া বসে।

ক্রমে বেলা যায়, নদীর ধারের মাঠে আবার সেই অপূর্ব নীরবতা, ওপারের দেয়াড়ের মাঠের পারে সুদূর-প্রসারী সবুজ উলুবনে, কাশঝোপে, কদম-শিমূল গাছের মাথায় আবার তাহার শৈশব-পুলকের শুভমুহূর্তের অতি পরিচিত, পুরাতন সাথী, বৈকালের মিলাইয়া যাওয়া শেষ-রোদ···

বঙ্গবাসীতে 'বিলাতযাত্রীর চিঠি'র মধ্যেপড়া সেই সুন্দর গল্পটি তাহার মনে পড়ে।

সে সুরেশ-দাদার ইংরেজী ম্যাপে ভূমধ্যসাগর



কোথায় দেখিয়াছে, তারই ওপারে ফ্রান্স দেশ সে জানে ! কতকাল আগে ফ্রান্স দেশের বুকে তখন বৈদেশিক সৈন্যবাহিনী চাপিয়া বসিয়াছে, দেশ বিপন্ন, রাজা শক্তিহীন, চারিদিকে অরাজকতা লুঠতরাজ ! জাতির এই ঘোর অপমানের দিনে, লোরেন প্রদেশের অন্তঃপাতী এক ক্ষুদ্র গ্রামে এক দরিদ্র কৃষকদুহিতা পিতার মেষপাল চরাইতে যায় আর মেষের দল ইতস্ততঃ ছাড়িয়া দিয়া নিভৃত পল্লীপ্রান্তরে তৃণভূমির উপর বসিয়া সুনীল নয়ন-দু'টি আকাশের পানে তুলিয়া নির্জনে দেশের দুর্দশার কথা চিন্তা করে। দিনের পর দিন এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহার নিষ্পাপ কুমারী-মনে উদয় হইল, কে তাহাকে বলিতেছে, তুমি ফ্রান্সের রক্ষাকর্ত্রী, তুমি গিয়া রাজসৈন্য জড় কর, অস্ত্র ধর, জাতির পরিত্রাণের ভার তোমার হাতে ! দেবী মেরী তাহার উৎসাহদাত্রী, দূর স্বর্গ হইতে তাঁহার আহ্বান আসে দিনের পর দিন। তারপর নবতেজোদৃপ্ত ফরাসী সৈন্যবাহিনী কি করিয়া শত্রুদলকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিল, কি করিয়া ভাবময়ী কুমারী নিজে অস্ত্র ধরিয়া দেশের রাজাকে সিংহাসনে বসাইল, তারপর অজ্ঞানান্ধ লোকে কি করিয়া তাহাকে ডাইনি অপবাদে জীবন্ত পুড়াইয়া মারিল এ-সকল কথাই সে আজ পড়িয়াছে।

এই বৈকাল বেলাটাতে, এই শান্ত নদীর ধারে গল্পটি ভাবিতে ভাবিতে কি অপূর্ব ভাবেই তাহার মন পূর্ণ হইয়া যায় ওই কুমারীর যুদ্ধের কথা, জয়ের কথা, অন্য সব কথা তত সে ভাবে না—কিন্তু যে-ছবিটি তাহার বার বার মনে আসে, তাহা শুধু নির্জন প্রান্তরে চিন্তারতা বালিকা আর চারিধারে যদৃচ্ছবিচরণশীল মেষদল,নিম্নে শ্যাম তৃণভূমি, মাথার উপর মুক্ত নীল আকাশ। একদিকে দুর্ধর্ষ বৈদেশিক শত্রু, নিষ্ঠুরতা, জয়লালসার দর্প, রক্তস্রোত,—অপরদিকে এক সরলা, দিব্যভাবময়ী, নীলনয়না পল্লী-বালিকা। ছবিটি তাহার প্রবর্ধমান বালক-মনকে মুগ্ধ করিয়া দেয়।

আরও ছবি মনে আসে। কতদূরে নীল সমুদ্রে ঘেরা মটিনিক দ্বীপ...আখের ক্ষেত, মাথার উপর নীল আকাশ—বহু—বহু দূর—শুধু নীল আকাশ আর নীল সমুদ্র !...শুধু নীল নীল !...আরও কত কি, তাহা বুঝানো যায় না—বলা যায় না।

ছিপ গুটাইয়া সে বাড়ীর দিকে যাইবার যোগাড় করে। নদীর ধারে ধারে নতশীর্ষ বাবলা ও সাঁইবাবলা বন নদীর স্নিগ্ধ কালো জলে ফুলের ভার ঝরাইয়া দিতেছে—সোনাডাঙা মাঠের মাঝে ঠ্যাঙাড়ে বটগাছটার আড়ালে প্রকাণ্ড রক্তবর্ণ সোনার মত সূর্য হেলিয়া পড়িয়াছে, যেন কোন্ দেবশিশু তরল আগুন ফাঁপাইয়া প্রকাণ্ড আগুনের বুদ্বুদটাকে খেলাচ্ছলে ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল, সুদূর স্বর্গ হইতে এইমাত্র সেটা পৃথিবীর মাঠে বনে নামিয়া পড়িতেছে।

পিছন হইতে কে তাহার চোখ টিপিয়া ধরিল। সে জোর করিয়া হাত দিয়া ছাড়াইতেই পটু খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া সামনে আসিয়া বলিল—তোকে খুঁজে খুঁজে কোথাও পাইনে অপু-দা, তারপর ভাবলাম তুই ঠিক মাছ ধরতে এসেচিস্, তাই এলাম—মাছ হয় নি ? একটাও না ? চল্ বরং একখানা নৌকো খুলে নিয়ে বেড়িয়ে আসি—যাবি ?

কদমতলার সায়েবের ঘাটে অনেক দূরদেশ হইতে নৌকা আসে—গোলপাতা বোঝাই, ধান বোঝাই, ঝিনুক বোঝাই নৌকা সারি সারি বাঁধা। নদীতে জেলেদের ঝিনুক-তোলা নৌকায় বড় জাল ফেলিয়াছে, এ-সময় প্রতিবৎসর ইহারা দক্ষিণ হইতে ঝিনুক তুলিতে আসে, মাঝ-নদীতে নৌকায় নৌকায় জোড়া দিয়া দাঁড় করিয়া রাখিয়াছে অপু ডাঙ্গায় বসিয়া দেখিতেছিল একজন কালোমত লোক বার বার ডুব দিয়া ঝিনুক খুঁজিতেছে ও অল্পক্ষণ পরে পরে নৌকার পাশে উঠিয়া হাতের থলি হইতে দু'একখানা কুড়ানো ঝিনুক বালি-কাদার রাশি হইতে ছাঁকিয়া নৌকার খোলে ছুঁড়িয়া ফেলিতেছে। অপু খুশির সহিত পটুকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—দেখছিস পটু, কতক্ষণ ডুব দিয়ে থাকে ! আয় গুণে দেখি এক,দুই ক'রে—পারিস্ তুই অতক্ষণ থাকতে ?

নদীর দূর্বাঘাস মোড়া তীরটি ঢালু হইয়া জলের কিনারা পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে, এখানে-ওখানে বোঝাই নৌকার খোঁটা পোতা, নোঙর ফেলা। কত দেশ হইতে আসিয়াছে, কত বড় নদী খাল পার হইয়া বড় বড় নোনা গাঙের জোয়ার-ভাঁটা খাইয়া বেড়ায়, অপুর ইচ্ছা করে মাঝিদের কাছে বসিয়া সে-সব দেশের গল্প শোনে। তাহার কেবল নদীতে নদীতে, সমুদ্রে সমুদ্রে বেড়াইতে ইচ্ছা হয়, আর কিছু সে চায় না। সুরেশের বইখানাতে নানা দেশের নাবিকদের কথা পড়িয়া



অবধি ঐ ইচ্ছা তাহার মনে প্রবল ! পটুও সেই নৌকার কাছে গিয়া দর করে—ও মাঝি, এই গোলপাতা একপটি কি দর ? তোমার এই ধানের নৌকো কোথাকার, ও মাঝি ?...ঝালকাটির ? সে কোন্ দিকে, এখান থেকে কত দূর ?

পটু বলিল—অপু-দা, চল্ তেঁতুলতলার ঘাটে একখানা ডিঙি দেখি—একটু বেড়িয়ে আসি অপু-দা—

দু'জনে তেঁতুলতলার ঘাট হইতে একখানা ছোট্ট ডিঙি খুলিয়া লইয়া তাহাকে এক ঠেলা দিয়া ডিঙির উপর চড়িয়া বসিল। নদীজলের ঠাণ্ডা আর্দ্র গন্ধ উঠিতেছে, কলমীশাকের উপর জলপিপি বসিয়া আছে, চরের ধারে ধারে চাষীরা পটোলক্ষেত নিড়াইতেছে, কেহ ঘাস কাটিয়া আঁটিয়া বাঁধিতেছে, চালতেপোতার বাঁকে তীরবর্তী ঘন ঝোপে গাঙশালিকের দল কলরব করিতেছে, পড়ন্ত বেলার পূব আকাশের গায়ে নানারঙের মেঘস্তূপ।

পটু বলিল—অপু-দা, একটা গান কর না। সেই সেদিনের গানটা।

অপু বলিল—সেটা না। বাবার কাছে সুর শিখে নিয়েচি একটা খুব ভাল গানের। সেইটে গাইবো, আর এটু ওদিকে গিয়ে কিন্তু ভাই, এখানে ডাঙায় ওই সব লোক রয়েচে—এখানে না—

তুই ভারী লাজুক অপু-দা—কোথায় লোক রয়েছে—কতদূরে, আর তোর গান গাইতে—দূর; ধর্ সেইটে—

খানিকটা গিয়া অপু গান সুরু করে। পটু বাখারীর চটাখানা তুলিয়া লইয়া নৌকার গলুইয়ে চুপ করিয়া হাত তুলিয়া বসিয়া একমনে শোনে, বাহিবার আবশ্যক হয় না, স্রোতে আপনা-আপনি ভাসিয়া ডিঙিখানা ঘুরিতে ঘুরিতে লা ভাঙার বড় বাঁকের দিকে চলে। অপুর গান শেষ হইলে পটু একটা গান ধরিল। অপু এবার বাহিতেছিল, নৌকা কম দূরে আসে নাই—হঠাৎ পটু ঈশানকোণের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ও অপু-দা, কি রকম মেঘ উঠেচে দেখেছিস্ ? এখুনি ঝড় এলো বলে ! নৌকো ফেরাবি ?

অপু বলিল—হোক্‌গে ঝড়, ঝড়েই তো ভালো, চল্ আরও যাই। কথা বলিতে বলিতে ঘন কালো মেঘখানা মাধবপুরের মাঠের দিক হইতে উঠিয়া সারা আকাশ, মাঠ, নদীজল ছাইয়া ফেলিল। পটু উৎসুক চোখে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। অনেকদূরে একটা সোঁ সোঁ রব উঠিল, একটা অস্পষ্ট গোলমালের সঙ্গে অনেক পাখীর কলরব শোনা গেল, ঠাণ্ডা হাওয়া বহিল, ভিজা মাটির গন্ধ ভাসিয়া আসিল, পাখাওয়ালা আকন্দের বীজ মাঠের দিক হইতে অজস্র উড়িয়া আসিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে গাছপালার মাথা লুটাইয়া, দোলাইয়া, ভাঙিয়া ভীষণ কালবৈশাখীর ঝড়

উঠিল।

নদীর জল ঘন কালো হইয়া উঠিল, তীরের সাঁইবাবলা ও বড় বড় ছাতিম গাছের ডালপালা ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইল, সাদা বকের দল কালো আকাশের নীচে দীর্ঘসারি বাঁধিয়া উড়িয়া পলাইল। অপুর বুক ফুলিয়া উঠিল, উৎসাহে উত্তেজনায় সে হাল ছাড়িয়া চারিধারে চাহিয়া ঝড়ের কাণ্ড দেখিতে লাগিল, পটু কোঁচার কাপড় খুলিয়া ঝড়ের মুখে পালের মত উড়াইয়া দিতেই বাতাস বাধিয়া সেখানা ফুলিয়া উঠিল। পটু বলিল—বড্ড মুখোড় বাতাস অপু-দা, সাম্‌নে আর নৌকা যাবে না—যদি উল্টে যায় ? ভাগ্যিস সুনীলকে সঙ্গে করে আনিনি!

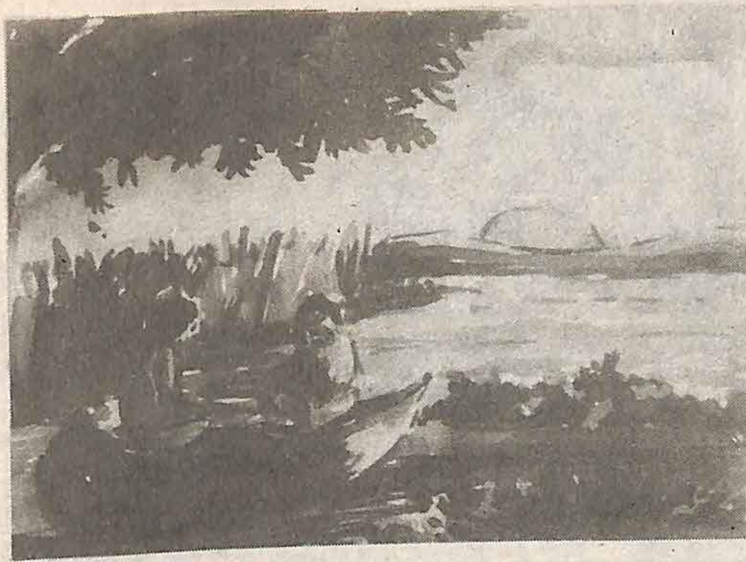
অপু কিন্তু পটুর কথা শুনিতেছিল না, সেদিকে তাহার কান ছিল না, মনও ছিল না। সে নৌকার গলুইয়ে বসিয়া একদৃষ্টে সম্মুখের ঝটিকাক্ষুব্ধ নদী ও আকাশের দিকে চাহিয়া ছিল। তাহার চারিধারে কালো নদীর জল, উড়ন্ত বকের দল, ঝোড়ো মেঘের রাশি, দক্ষিণ দেশের মাঝিদের ঝিনুকের স্তূপগুলো, স্রোতে ভাসমান কচুরীপানার দাম সব মুছিয়া যায়! নিজেকে সে 'বঙ্গবাসী' কাগজের সেই বিলাতযাত্রী কল্পনা করে!—কলিকাতা হইতে তাহার জাহাজ ছাড়িয়াছে—বঙ্গোপসাগরের মোহানায় সাগরদ্বীপ পিছনে ফেলিয়া, সমুদ্র-মাঝের কত অজানা দ্বীপ পার হইয়া, সিংহল-উপকূলের শ্যামসুন্দর নারিকেলবনশ্রী দেখিতে দেখিতে, কত অপূর্ব দেশের নীলপাহাড় দূর চক্রবালে রাখিয়া, সূর্যাস্তের রাঙা আলোয় অভিষিক্ত হইয়া, নূতন দেশের নব নব পরিবর্তনের মধ্য দিয়া সে চলিয়াছে···চলিয়াছে!

এই ইছামতীর জলের মত কালো, গভীর, ক্ষুব্ধ, দূরের সে অদেখা সমুদ্রবক্ষ, এইরকম সবুজ বনঝোপ আরব সমুদ্রের সে দ্বীপটিতেও। সেখানে এইরকম সন্ধ্যায় গাছের তলায় বসিয়া এডেন বন্দরে সেই বিলাতযাত্রী লোকটির মত সেও রূপসী আরবী মেয়ের হাত হইতে এক গ্লাস জল চাহিয়া লইয়া খাইবে—চাল্‌তেপোতার বাঁকের দিকে চাহিলে খবরের কাগজে বর্ণিত জাহাজের পিছনের সেই উড়নশীল জলচর পক্ষীর ঝাঁককে সে একেবারে স্পষ্ট দেখিতে পায় যেন!···

সে ওই সব জায়গায় যাইবে, ওই সব দেখিবে, বিলাত যাইবে, জাপানে যাইবে, বাণিজ্যযাত্রা করিবে, বড় সওদাগর হইবে, অনবরত দেশবিদেশে সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরিবে, বড় বড় বিপদের মুখে পড়িবে, চীনসমুদ্রের মধ্যে আজকার এই মনমাতানো কালবৈশাখীর ঝড়ের মত বিষম ঝড়ে তাহার জাহাজ ডুবু ডুবু হইলে 'আমার অপূর্ব ভ্রমণ'-এ পঠিত নাবিকদলের মত সেও জালি-বোটে করিয়া সমুদ্রের ডুবো পাহাড়ের গায়ে-লাগা গুগ্‌লী-শামুক পুড়াইয়া খাইতে খাইতে অকূল দরিয়া পাড়ি দিবে। ওই তুঁতে রঙের মেঘের পাহাড় যেখানে মাধবপুর গ্রামের বাঁশবনের মাথায় খানিকটা আগে ঝুঁকিয়া ছিল,—ওরই ওপারে সেই সব নীল সমুদ্র, অজানা বেলাভূমি, নারিকেলকুঞ্জ, আগ্নেয়গিরি, তুষারবর্ষী প্রান্তর, জেলেখা, সরযূ, গ্রেস ডার্লিং, জুটফেন, গাংচিল পাখীর-ডিম-আহরণরত সেইসব সুশ্রী ইংরাজ বালক-বালিকা, সোনাকরা যাদুকর বটগার, নির্জন প্রান্তরে চিন্তারতা লোরেনের সেই নীলনয়না পল্লীবালা জোয়ান্—তাহার টিনের বাক্সের বই ক'খানা রাণু-দিদিদের বাড়ীর বইগুলি, সুরেশ-দাদার কাছে চাহিয়া লওয়া বইখানা, পুরাতন 'বঙ্গবাসী' কাগজগুলো ওই সব দেশের কথাই তাহাকে বলে—সে-সব দেশে কোথায় যেন সকলে তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে—সেখান হইতে তাহারও ডাক আসিলে একদিন, সেও যাইবে!

একথা তাহার মনে হয় না—সে কোথায় যাইবে ? কে তাহাকে লইয়া যাইবে ? কি করিয়া তাহার যাওয়া সম্ভব হইবে ? আর দিনকতক পরে বাড়ী বাড়ী ঠাকুর-পূজা করিয়া যাহাকে সংসার চালাইতে হইবে, রাত্রে যাহার পড়িবার তেলের জন্য মায়ের কাছে বকুনি খাইতে হয়, এত বয়স পর্যন্ত যে স্কুলের মুখ দেখিল না, ভাল কাপড় ভাল জিনিস যে কাহাকে বলে জানে না—সেই মূর্খ, অখ্যাত, সহায়সম্পদহীন পল্লীবালককে বৃহত্তর জীবনের আনন্দযজ্ঞে কে আহ্বান করিতে যাইবে ?

এসব প্রশ্ন জাগিলেও হয়ত তাহার তরুণ-কল্পনার রথবেগ, তাহার আশা-ভরা জীবন-পথের দুর্বার মোহ, সকল ভয় সকল সংশয়কে জয় করিত—কিন্তু এসকল কথা তাহার মনে ওঠে না। শুধু মনে হয় বড় হইলেই সব হইবে, অগ্রসর হইলেই সকল সুযোগ-সুবিধা পথের মাঝে কুড়াইয়া পাইবে···এখন

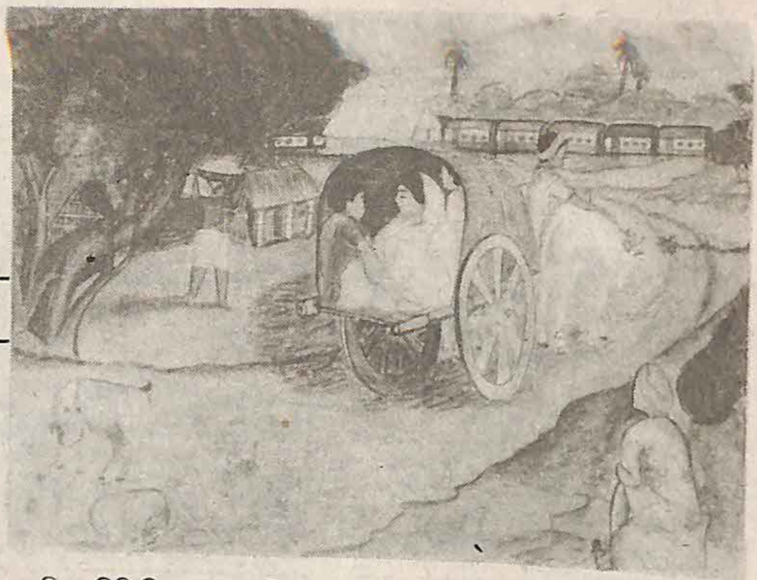


শুধু বড় হইবার অপেক্ষা মাত্র। সে বড় হইলেই সুযোগ্ পাইবে, দিক দিক হইতে তাহার সাদর আমন্ত্রণ আসিবে,—সে জগৎ-জানার, মানুষ-চেনার দিগ্বিজয়ে যাইবে।

রঙীন ভবিষ্যজীবন স্বপ্নে ভোর হইয়া তাহার বাকী পথটুকু কাটিয়া যায়। বৃষ্টি আর পড়ে না, ঝড়ে কালো মেঘের রাশি উড়াইয়া আকাশ পরিষ্কার করিয়া দিতেছিল। তেঁতুলতলার ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া পটুর আগে আগে সে বাঁশবনের পথে উল্লাসে শিস্ দিতে দিতে বাড়ীর দিকে চলে।

সেও তাহার মা ও দিদির মত স্বপ্ন দেখিতে শিখিয়াছে!

১৯



বৈশাখ মাসের প্রথমে হরিহর নিশ্চিন্দিপুর হইতে বাস উঠাইবার ব্যবস্থা সব ঠিক করিয়া ফেলিল। যে-সব জিনিসপত্র সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া চলিবে না, সেগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া নানা খুচরা দেনা শোধ করিয়া দিল। সেকেলে কাঁঠালকাঠের বড় তক্তপোষ, সিন্দুক, পিঁড়ি ঘরে অনেকগুলি ছিল, খবর পাইয়া ওপাড়া হইতে পর্যন্ত খরিদ্দার আসিয়া সস্তাদরে কিনিয়া লইয়া গেল।

গ্রামের মুরুব্বিরা আসিয়া হরিহরকে বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিশ্চিন্দিপুরে দুগ্ধ ও মৎস্য যে কত সস্তা বা কত অল্প খরচে এখানে সংসার চলে, সে বিষয়ে একটা তুলনামূলক তালিকাও মুখে মুখে দাখিল করিয়া দিলেন। কেবল রাজকৃষ্ণ সান্যাল স্ত্রীর সাবিত্রীব্রত উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর বলিলেন—বাপু, আছেই বা কি দেশে যে থাকতে বোল্‌বো—তা ছাড়া এক জায়গায় কাদায় গুণ পুঁতে থাকাও কোনো কাজের নয়, এ আমি নিজেকে দিয়ে বুঝি— মন ছোট হয়েথাকে,মনের বাড় বন্ধ হয়ে যায়। দেখি, এবার তো ইচ্ছে আছে একবার চন্দ্রনাথটা সেরে আস্‌বো যদি ভগবান দিন দেন—

রাণী কথাটা শুনিয়া অপুদের বাড়ী আসিল। অপুকে বলিল—হ্যাঁরে অপু, তোরা না কি এ-গাঁ ছেড়ে চলে যাবি ? সত্যি ?

অপু বলিল—সত্যি—রাণুদি, জিগ্যেস্ করো মাকে—

তবুও রাণী বিশ্বাস করে না। শেষে সর্বজয়ার মুখে সব শুনিয়া রাণী অবাক হইয়া গেল ! অপুকে বাহিরের উঠানে ডাকিয়া বলিল, কবে যাবি রে ?

—সাম্‌নের বুধবারের পরের বুধবারে—

—আসবি নে আর কখনো ?

রাণীর চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল; বলিল—তুই যে বলিস্ নিশ্চিন্দিপুর আমাদের বড় ভাল গাঁ, এমন নদী এমন মাঠ কোথাও নেই—সে গাঁ ছেড়ে তুই যাবি কি করে ?

অপু বলিল—আমি কি কর্‌বো, আমি তো আর বলিনি যাবার কথা ! বাবার সেখানে বাস করবার মন, এখানে আমাদের চলে না যে ! আমার লেখা খাতাটা তোমাকে দিয়ে যাবো রাণুদি, বড় হোলে হয়তো আবার দেখা হবে—

রাণী বলিল,—আমার খাতাতে গল্পটাও তো শেষ কোরে দিলি নে, খাতায় নামসইও কোরে দিলি নে, তুই বেশ ছেলে তো অপু !

চোখের জল চাপিয়া রাণী দ্রুতপদে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। অপু বুঝিতে পারে না রাণুদি মিছামিছি কেন রাগ করে ! সে কি নিজের ইচ্ছায় দেশ ছাড়িয়া যাইতেছে ?

স্নানের ঘাটে পটুর সঙ্গে অপুর কত কথা হইল।

পটুও কথাটা জানিত না, অপুর মুখে সব কথা শুনিয়া তাহার মনটা বেজায় দমিয়া গেল! ম্লানমুখে বলিল,—তোর জন্যে নিজে জলে নেবে কত কষ্টে সেওলা সারিয়ে ফুট্ কাট্‌লাম, একদিনও মাছ ধরবি নে তাতে ?

চড়কের পরদিন জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হইতে লাগিল। কাল দুপুরে আহারাদির পর রওনা হইতে হইবে।

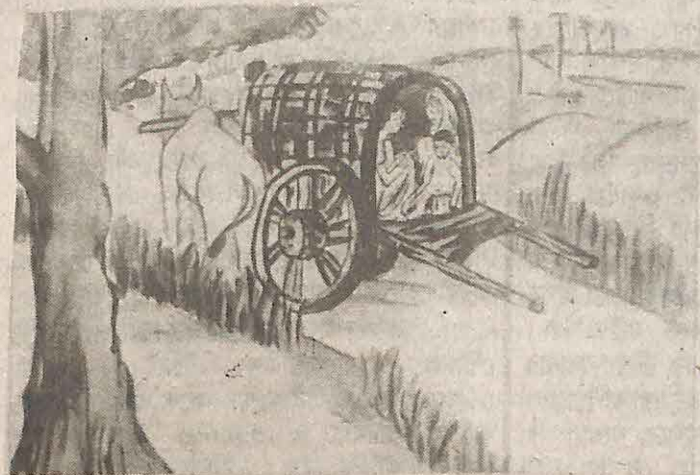
সন্ধ্যার সময় রান্নাঘরের দাওয়ায় তাহার মা তাহাকে গরম গরম পরোটা ভাজিয়া দিতেছিল। এতদিন নতুন দেশে যাইবার জন্য তাহার যে উৎসাহটা ছিল, যতই যাওয়ার দিন কাছে আসিয়া পড়িতেছে, ততই আসন্নবিরহের গভীর বেদনায় তাহার মনের সুরটি করুণ হইয়া বাজিতেছে।

এই তাহাদের বাড়ী ঘর, ওই বাঁশবন, সল্‌তে-খাগীর আম-বাগানটা, নদীর ধার, দিদির সঙ্গে চড়ুইভাতি করার ওই জায়গাটা—এ-সব সে কত ভালবাসে! ওই অমন নারিকেল গাছ কি তাহারা যেখানে যাইতেছে সেখানে আছে ? জ্ঞান হইয়া পর্যন্ত এই নারিকেল গাছ সে এখানে দেখিতেছে, জ্যোৎস্নারাত্রে পাতাগুলি কি সুন্দর দেখায়! সুমুখ জ্যোৎস্নারাত্রে এই দাওয়ায় বসিয়া জ্যোৎস্না-ঝরা নারিকেলশাখার দিকে চাহিয়া কত দিন দিদির সঙ্গে সে দশ-পঁচিশ খেলিয়াছে, কতবার মনে হইয়াছে কি সুন্দর দেশ তাহাদের এই নিশ্চিন্দিপুর। যেখানে যাইতেছে, সেখানে কি রান্নাঘরের দাওয়ার পাশে বনের ধারে নারিকেল গাছ আছে ? সেখানে কি সে মাছ ধরিতে পারিবে, আম কুড়াইতে পারিবে, নৌকা বাহিতে পারিবে, রেল রেল খেলিতে পারিবে ? কদমতলার সায়েবের ঘাটের মত ঘাট কি সে দেশে আছে ? রাণুদি ? সেবনাডাঙার মাঠ আছে ? এই তো বেশ ছিল তাহারা, কেন এসব মিছামিছি ছাড়িয়া যাওয়া ?

দুপুর একটু গড়াইয়া গেলে হীরু গাড়োয়ানের গরুর গাড়ী রওনা হইল। সকালের দিকে আকাশে একটু একটু মেঘ ছিল বটে, কিন্তু বেলা দশটার পূর্বেই সেটুকু কাটিয়া গিয়া পরিপূর্ণ, প্রখর, বৈশাখী মধ্যাহ্নের রৌদ্র গাছপালায় পথে মাঠে যেন অগ্নিবৃষ্টি করিতেছে। পটু গাড়ীর পিছনে পিছনে অনেক দূর পর্যন্ত আসিতেছিল, বলিল—অপু-দা, এবার বারোয়ারীতে ভাল যাত্রাদলের বায়না হয়েছে, তুই শুনতে পেলিনে এবার—

অপু বলিল—তুই পালার কাগজ একখানা বেশী ক'রে নিবি, আমায় পাঠিয়ে দিবি—

আবার সেই চড়কের মাঠের ধার দিয়া রাস্তা। মেলার চিহ্নস্বরূপ সারা মাঠটায় ডাবের খোলা গড়াগড়ি যাইতেছে, কাহারা মাঠের একপাশে রাঁধিয়া খাইয়াছে, আগুনে কালো মাটির ঢেলা ও একপাশে



কালিমাখা নূতন হাঁড়ি পড়িয়া আছে। হরিহর চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, তাহার যেন কেমন কেমন ঠেকিতেছিল। কাজটা কি ভাল হইল ? কতদিনের পৈতৃক ভিটা ! ওই পাশের পোড়ো ভিটাতে সে-সব ধুমধাম একেবারে শেষ হইয়া গিয়াছিলই তো, যা-ও বা মাটির প্রদীপ টিম্‌টিম্ করিতেছিল, আজ সন্ধ্যা হইতে চিরদিনের জন্য নিবিয়া গেল। পিতা রামচাঁদ তর্কালঙ্কার স্বর্গ হইতে দেখিয়া কি মনে করিবেন !

গ্রামের শেষ বাড়ী হইতেছে আতুরী বুড়ীর সেই দোচালা ঘরখানা, যতক্ষণ দেখা গেল অপু হাঁ করিয়া সেদিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পরই একটা বড় খেজুর-বাগানের পাশ দিয়া গাড়ী একেবারে আষাঢু যাইবার বাঁধা রাস্তার উপর উঠিল। গ্রাম শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বজয়ার মনে হইল, যা কিছু দারিদ্র্য, যা কিছু হীনতা, যা কিছু দীনতা, যা কিছু অপমান সব রহিল পিছনে পড়িয়া, এখন সাম্‌নে শুধু নতুন সংসার, নতুন জীবনযাত্রা, নব স্বচ্ছলতা !...

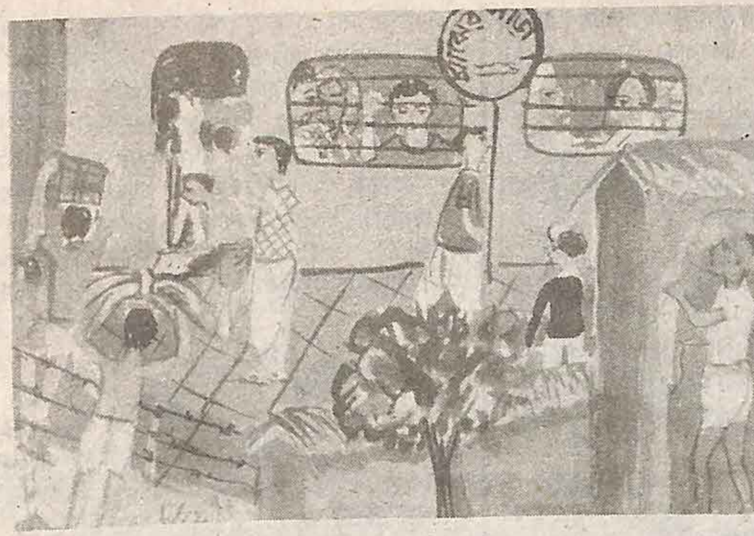
ক্রমে রৌদ্র পড়িল। গাড়ী তখন সোনাডাঙা মাঠের মধ্য দিয়া যাইতেছিল।—সোনাডাঙার মাঠ এই অঞ্চলের সকলের বড় মাঠ। এখানে ওখানে বনঝোপ, শিমূল বাবলা গাছ ; খেজুর গাছে খেজুর কাঁদি ঝুলিতেছে, সোঁদালি ফুলের ঝাড় দুলিতেছে, চারিধারে বৌ-কথা-কও পাপিয়ার ডাক। দূরপ্রসারী মাঠের উপর তিসির ফুলের রঙের মত গাঢ় নীল আকাশ উপুড় হইয়া পড়িয়াছে, দৃষ্টি কোথাও বাধে না, ঘন সবুজ ঘাসে মোড়া উঁচু-নীচু মাঠের মধ্যে কোথাও আবাদ নাই, শুধু গাছপালা বনঝোপের প্রাচুর্য আর বিশাল মাঠটার শ্যামপ্রসার, সম্মুখে কাঁচা মাটির চওড়া পথটা গৃহত্যাগী উদাস বাউলের মত দূর হইতে দূরে আপন মনে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। একটু দূরে গিয়া বারাসে-মধুখালির বিল পড়িল। কোন্ প্রাচীনকালের নদী শুকাইয়া গিয়া জীবনের যাত্রাপথে পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, সেই অন্তর্হিত নদীর বিশাল খাতটা এখন পদ্মফুলে ভরা বিল। অপু গাড়ীতে বসিয়া মাঠ ও চারিধারের অপূর্ব আকাশের রঙটা দেখিতে দেখিতে যাইতেছিল। বেলাশেষের স্বপ্নপুটে আবার কত কি শৈশব-কল্পনার আসা-যাওয়া ! এই তো সে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়াছে। এখন হয়তো কোথায় কতদূরে চলিবে, যাও তার সবে আরম্ভ হইল, এইবার হয়তো সে-সব দেশ, স্বপ্নে-দেখা সে অপূর্ব জীবন।...

হরিহর দূরের একটা গ্রাম আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ওই হোল ধঞ্চে-পলাশগাছি, ওরই ওপাশে নাটাবেড়ে—ওইখানে বনবিবির দরগা-তলায় শ্রাবণ মাসে ভারী মেলা হয়, এমন সস্তা কুমড়ো আর কোথাও মেলে না।

আষাঢু বাজারের নীচে খেয়ায় বেত্রবতী পার হইবার সময় আজ চাঁদ উঠিল, জ্যোৎস্নার আলোয় জল চিক্ চিক্ করিতেছিল। আষাঢুর হাট, কয়েকজন হাটুরে লোক কলরব করিতে করিতে ওপার হইতে খেয়া নৌকায় এপারে আসিতেছে। অপুদের গাড়ীশুদ্ধ পার হইয়া ওপারে উঠিল। অপু বাবাকে বলিয়া আষাঢুর বাজার দেখিতে নামিল। ছোট বাজার, সারি সারি ঝাঁপতোলা দোকান, সেক্‌রার দোকানে ঠুকঠাক্ শুনা যাইতেছে, একটা খেজুরগুড়ের আড়তের সাম্‌নে বহু গরুর গাড়ীর ভীড়। মাঝেরপাড়া স্টেশন এখনও প্রায় চারিক্রোশ, রাস্তা কাঁচা হইলেও বেশ চওড়া, দুধারে নীলকুঠীর সাহেবদের আমলে রোপিত বট, অশ্বত্থ, তুঁতগাছ। বৈশাখ মাসের প্রথমে পথিপার্শ্বের বট, অশ্বত্থের ডালের মধ্যে কোথায় কোকিল ডাকিয়া ডাকিয়া সারা হইতেছে, সারা পথটা প্রাচীন বটের সারির ঝুরি দোলানো। কচি পাতার রাশি জ্যোৎস্না লাগিয়া স্বচ্ছ দেখাইতেছে।

বাংলার বসন্ত, চৈত্র-বৈশাখের মাঠে, বনে বাগানে, যেখানে সেখানে, কোকিলের এলোমেলো ডাকে, নবপল্লব নাগকেশর গাছের অজস্র ফুলের ভারে, বনফুলের গন্ধভরা জ্যোৎস্নাস্নিগ্ধ দক্ষিণ হাওয়ায় উল্লাসে আনন্দে নৃত্য সুরু করিয়াছে। এরূপ অপরূপ বসন্তদৃশ্য অপু জীবনে এই প্রথম দেখিল। এই অল্প বয়সেই তাহার মনে বাংলার মাঠ, নদী, নিরালা বনপ্রান্তরের সুমুখ জ্যোৎস্না-রাত্রির যে মায়ারূপ অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, তাহার উত্তরকালের শিল্পীজীবনের কল্পনামুহূর্তগুলি মাধুর্যে ও প্রেরণায় ভরিয়া তুলিবার তাহাই ছিল শ্রেষ্ঠ উপাদান।

রাত্রি প্রায় দশটার সময় স্টেশনে আসিয়া গাড়ী পৌঁছিল। আজ অনেকক্ষণ হইতেই কখন গাড়ী স্টেশনে পৌঁছাইবে সে আশায় অপু বসিয়া ছিল, গাড়ী থামিতেই নামিয়া সে একদৌড়ে গিয়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে হাজির হইল। সন্ধ্যা সাড়ে আটটার ট্রেন



অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিয়াছে সারা রাত্রির মধ্যে ট্রেন নাই। ঐ হীরু গাড়োয়ানের গরু দুইটার জন্য এরূপ ঘটিল, নতুবা সে এখনি ট্রেন দেখিতে পাইত। প্ল্যাটফর্মে এক রাশ তামাকের গাঁট সাজানো—দু'জন রেলের লোক একটা লোহার বাক্সের মত দেখিতে অথচ খুব লম্বা ডাণ্ডাওয়ালা কলে তামাকের গাঁট চাপাইয়া কি করিতেছে। জ্যোৎস্না পড়িয়া রেলের পথটি চিক্ চিক্ করিতেছে। ওদিকে রেল-লাইনের ধারে একটা উঁচু খুঁটির গায়ে দু'টা লাল আলো, এদিকে আবার ঠিক সেই রকম দু'টা লাল আলো। স্টেশনের ঘরে টেবিলের উপর চৌপায়া তেলের লণ্ঠন জ্বলিতেছে। একরাশ বাঁধানো খাতাপত্র। অপু দরজার কাছে গিয়া খানিকটা দাঁড়াইয়া দেখিল, একটা ছোট্ট খড়মের বউলের মত জিনিস টিপিয়া স্টেশন বাবু খট খট শব্দ করিতেছে।

ইষ্টিশান! ইষ্টিশান!···বেশী দেরী নয়, কাল সকালেই সে রেলের গাড়ী শুধু যে দেখিবে তাহা নয়, চড়িবেও!···

প্ল্যাটফর্ম হইতে নড়িতে তাহার মন সরিতেছিল না। কিন্তু তাহার বাবা ডাকিতে আসিল। খড়মের বউলের মত জিনিসটাই নাকি টেলিগ্রাফের কল, তাহার বাবা বলিল।

অপু ফিরিয়া দেখিল স্টেশনের পুকুর-ধারে রাঁধিয়া খাইবার যোগাড় হইতেছে। আর-একখানি গাড়ী পূর্ব হইতেই সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল। আরোহীর মধ্যে আঠারো উনিশ বৎসরের একটি বৌ ও একটি যুবক। অপু শুনিল, বৌটি হবিবপুরের বিশ্বাসদের বাড়ীর ভাইয়ের সঙ্গে বাপের বাড়ী যাইতেছে। তাহার মায়ের সঙ্গে বৌটির খুব ভাব হইয়া গিয়াছে। তাহার মা খিচুড়ীর চাল ডাল ধুইতেছে, বৌটি আলু ছাড়াইতেছে। রান্না একত্র হইবে।

সকাল সাড়ে সাতটায় ট্রেন আসিল। অপু হাঁ করিয়া অনেকক্ষণ হইতে গাড়ী দেখিবার জন্য প্ল্যাটফর্মের ধারে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার বাবা বলিল,—খোকা, অত ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থেকো না, সরে এসো এদিকে। একজন খালাসীও লোকজনদের হঠাইয়া দিতেছিল।

হবিবপুরের বৌটি ঘোম্‌টা খুলিয়া কৌতূহলের সহিত প্রবেশমান ট্রেনখানার দিকে চাহিয়া ছিল।

গাড়ীতে হৈ হৈ করিয়া মোট-ঘাট সব উঠানো হইল। কাঠের বেঞ্চি সব মুখোমুখি করিয়া পাতা। গাড়ীর মেঝেটা যেন সিমেন্টের বলিয়া মনে হইল। ঠিক যেন ঘর একখানা, জানালা দরজা সব হুবহু। এই ভারী গাড়ীখানা, যাহা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা যে আবার চলিবে, সে বিশ্বাস অপুর হইতেছিল না। কি জানি হয় তো নাও চলিতে পারে ; হয় তো উহারা এখনই বলিতে পারে, ওগো তোমরা সব নামিয়া যাও,

আমাদের গাড়ী আজ আর চলিবে না। তারের বেড়ার এদিকে একজন লোক একবোঝা উলুঘাস মাথায় করিয়া ট্রেনখানার চলিয়া যাওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল, অপুর মনে হইল লোকটা কৃপার পাত্র! আজিকার দিনে যে গাড়ী চড়িল না, সে বাঁচিয়া থাকিবে কি করিয়া? হীরু গাড়োয়ান ফটকের বাহিরে দাঁড়াইয়া গাড়ীর দিকে চাহিয়া আছে।

গাড়ী চলিল। অদ্ভুত অপূর্ব দুলুনি! দেখিতে দেখিতে মাঝেরপাড়া স্টেশন, লোকজন, তামাকের গাঁট, হাঁ-করিয়া-দাঁড়াইয়া-থাকা হীরু গাড়োয়ান, সকলকে পিছনে ফেলিয়া গাড়ী বাহিরের উলুখড়ের মাঠে আসিয়া পড়িল। গাছপালাগুলা সট্‌সট্ করিয়া দু'দিকের জানালার পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া পলাইতেছে—কি বেগ! এরই নাম রেলগাড়ী! উঃ, মাঠখানা যেন ঘুরাইয়া ফেলিতেছে? ঝোপঝাপ, গাছপালা, উলুখড়ের ছাউনি, চাষীদের ছোটখাটো ঘর সব একাকার করিয়া দিতেছে!

মাঝেরপাড়া স্টেশনের ডিস্‌ট্যান্ট্ সিগন্যাল্‌খানাও ক্রমে মিলাইয়া যাইতেছে!...

অনেক দিন আগের সে দিনটা!

সে ও দিদি যেদিন দু'জনে বাছুর খুঁজিতে খুঁজিতে মাঠ জলা ভাঙিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে রেলের রাস্তা দেখিতে ছুটিয়া গিয়াছিল সেদিন—আর আজ!

ঐ যেখানে আকাশের তলে আষাঢু দুর্গাপুরের বাঁধা সড়কের গাছের সারি ক্রমশঃ দূর হইতে দূরে গিয়া পড়িতেছে, ওবই ওদিকে যেখানে তাহাদের গাঁয়ের পথ বাঁকিয়া আসিয়া সোনাডাঙা মাঠের মধ্যে উঠিয়াছে, সেখানে পথের ঠিক সেই মোড়টিতে গ্রামের প্রান্তের বুড়া জামতলাটায় তাহার দিদি যেন ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া তাহাদের রেলগাড়ীর দিকে চাহিয়া আছে!

তাহাকে কেহ লইয়া আসে নাই, সবাই ফেলিয়া আসিয়াছে!...দিদি মারা গেলেও তাহার অদৃশ্য স্নেহস্পর্শ ছিল নিশ্চিন্দিপুরের ভাঙা কোঠাবাড়ীর প্রতি গৃহ-কোণে—আজ কিন্তু সত্যসত্যই দিদির সহিত চিরকালের মত ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল!

তাহার যেন মনে হয় দিদিকে আর কেহ ভালবাসিত না, মা নয়, কেউ নয়, কেহই তাহাকে ছাড়িয়া আসিতে দুঃখিত নয়।

হঠাৎ অপুর মন এক বিচিত্র অনুভূতিতে ভরিয়া গেল। তাহা দুঃখ নয়, শোক নয়, বিরহ নয়, তাহা কি সে জানে না। কত কি মনে আসিল অল্প এক মুহূর্তের মধ্যে...আতুরী ডাইনি...নদীর ঘাট...তাহাদের কোঠাবাড়ীটা...চাল্‌তেতলার পথ...রাণুদি...কত বৈকাল, কত দুপুর...কতদিনের কত হাসিখেলা...পটু...দিদির মুখ...দিদির কত না-মেটা সাধ...

দিদি এখনও একদৃষ্টে চাহিয়া আছে...

পরক্ষণেই তাহার মনের মধ্যের অনেক ভাষা চোখের জলে আত্মপ্রকাশ করিয়া যেন এই কথাই বার বার বলিতে চাহিল—আমি যাইনি দিদি, আমি তোকে ভুলিনি, ইচ্ছে করে ফেলেও আসিনি—ওরা আমায় নিয়ে যাচ্ছে—

সত্যই সে ভুলে নাই।...

উত্তরজীবনে নীলকুন্তলা সাগরমেখলা ধরণীর সঙ্গে তাহার খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়াছিল। কিন্তু যখনই গতির পলকে তাহার সারাদেশ শিহরিয়া উঠিতে থাকিত, সমুদ্রগামী জাহাজের ডেক হইতে প্রতিমুহূর্তে নীল আকাশের নব নব মায়ারূপ চোখে পড়িত, হয়তো দ্রাক্ষাকুঞ্জবেষ্টিত কোন নীল পর্বতসানু সমুদ্রের বিলীন চক্রবাল-সীমায় দূর হইতে দূরে ক্ষীণ হইয়া পড়িত, দূরের অস্পষ্ট আবছায়া-দেখিতে-পাওয়া বেলাভূমি এক প্রতিভাশালী সুরস্রষ্টার প্রতিভার দানের মত মহামধুর কুহকের সৃষ্টি করিত তাহার ভাবময় মনে—তখনই, এই সব সময়েই, তাহার মনে পড়িত এক ঘনবর্ষার রাতে, অবিশ্রান্ত বৃষ্টির শব্দের মধ্যে এক পুরানো কোঠার অন্ধকার ঘরে, রোগশয্যাগ্রস্ত এক পাড়াগাঁয়ের গরীব ঘরের মেয়ের কথা—

অপু, সেরে উঠলে আমায় একদিন রেলগাড়ী দেখাবি?...

মাঝেরপাড়া স্টেশনের ডিস্‌ট্যান্ট্ সিগন্যাল্‌খানা দেখিতে দেখিতে কতদূরে অস্পষ্ট হইতে হইতে শেষে মিলাইয়া গেল।





প্রতিযোগিতায় প্রথম
কেয়া চট্টোপাধ্যায়



বিশেষ প্রথম
রাজসী সোম



১। কেয়া চট্টোপাধ্যায়ের ছবি
২। রাজসী সোমের ছবি

১২.

১. নরোত্তম দাস কে ? তার সঙ্গে অপুর কথোপকথন ও প্রীতি-সম্পর্কের পরিচয় দাও।
২. অপুদের চড়ুইভাতির বর্ণনা দাও।
৩. চড়ুইভাতির শেষ পর্বে অপুর আশঙ্কা ছিল কেন ? কিভাবে সে ওকাজে জড়িয়ে পড়েছিল ?

১৩.

১. গ্রামের চড়ক-পূজার বর্ণনা দাও।
২. যাত্রার দিনে অপুর মনে অভিমান ও আনন্দের ঘটনাগুলি বর্ণনা কর।
৩. যাত্রাদলকে নিয়ে অপুদের বাড়ির কে কেমন ভেবেছিল ?

১৪.

১. অপুর যাত্রা শোনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর। যাত্রা শোনার পর অপুর মনে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ?
২. অজয়ের সঙ্গে কিভাবে অপুর পরিচয় হল ? কিভাবে তাদের ভাব গাঢ় হল ?
৩. যাত্রা দল নিয়ে অপুর কল্পনা বর্ণনা কর।

১৫.

১. সর্বজয়া তাদের সংসার সম্পর্কে কি স্বপ্ন দেখত ? এমন স্বপ্ন দেখার পিছনে কি কারণ ছিল ?
২. জর মুখে দুর্গা কি আবদার করেছিল ? সে কোন কোন চিন্তার মধ্য দিয়ে জরকে উপেক্ষা করতে চাইছিল ?
৩. বুড়ো মুসলমান কি জিনিস নিয়ে এসেছিল ? এ ব্যাপারে দুর্গার অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।
৪. বাবার অনুপস্থিতিতে অপু কি করে বেড়াত ? তার হাতের লেখা, লেখার ব্যাপারে আগ্রহ ও মায়ের সঙ্গে বিবাদের ঘটনা বর্ণনা কর।
৫. অপুর নাটক লেখার কাহিনী বল ? ঐ নাটক সম্পর্কে কি আপত্তির কথা বলা যায় ? লেখক কি যুক্তিতে ঐ আপত্তি দূর করেছেন ?
৬. চরিতাবলী কার লেখা ? বইটি কিভাবে সংগ্রহ হয়েছিল ? ঐ বই অপুকে কিভাবে অনুপ্রাণিত করত ?

১৬.

১. হরিহরের সংবাদ না আশার দিনগুলি কিভাবে কাটছিল, তা বর্ণনা কর।
২. নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে বর্ষার বিবরণ দাও। সর্বজয়া কাপড়ের তলা থেকে কি দেখিয়েছিল ? তা অবলম্বন করে অসুস্থ দুর্গা কি ভাবছিল ?
৪. বৃষ্টির রাতে অপু, সর্বজয়া ও দুর্গা কে কি করেছিল ?
৫. দুর্গার অসুস্থ অবস্থায় তাদের দিন কেমন করে কাটছিল ?
৬. অনন্তের হাতছানি কি ? কিভাবে তা দুর্গার কাছে পৌছেছিল ? ডাক্তার তার কি ব্যাখ্যা দিলেন ?

১৭.

১. হরিহর কিরূপে দুর্গার মৃত্যু সংবাদ পান ? এতে তার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ?

২. নীলমণি রায় কে ? তার স্ত্রী কেন শীতকালে এসেছিলেন ? সর্বজয়ার সঙ্গে তিনি কি ব্যবহার করেন ?

৩. হরিহরের মনে অপুর লেখাপড়া শেখাবার বাসনা ছিল কতখানি ? এজন্য তিনি কি কি করেছিলেন ?

৪. অপুর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার মা কি আশা পোষণ করতেন ? তার আশা এবং হরিহরের আশার মধ্যে পার্থক্য কেন ছিল ?

৫. সতুর কাছ থেকে অপু কি সর্তে বই পড়ার সুযোগ আদায় করেছিল ? এজন্য তার মা তাকে কি বলত ? সত্যিই কি তার মায়ের হিসাব ঠিক ?

৬. 'অপু হাতে স্বর্গ পাইয়া গেল'—স্বর্গই বা কি ?

৭. অপু কোথায় বসে কিভাবে বই পড়ত ? তার পড়া যে কোন একটি বই সম্পর্কে বল এবং সে বই সম্পর্কে তার কল্পনা বল।

৮. অপুকে কে একটি ছোট্ট বাঁধান খাতা দিয়েছিল ? সে সেই খাতায় কি লিখে দিতে বলেছিল ? এই লেখা নিয়ে কে কি মন্তব্য করেছিল ?

১৮.

১. অপুর মাছ ধরার কাহিনী বল।

২. পন্টু কেন অপুকে ভালবাসত ? দুজনে কি অভিযান করেছিল ? এ অভিযানের পিছনে অপুকে কি কি বই অনুপ্রেরণা দিয়েছিল ?

৩. ফিলিপ সিডনি ও ফ্রান্সের কৃষক দুহিতার গল্প বল।

৪. নৌকা অভিযানে অপুর চিন্তার পরিচয় দাও।

১৯.

১. নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে যাবার কথা রাণু বিশ্বাস করে নি কেন ? সে কি কি বলে অপুর ওপর অভিমান প্রকাশ করেছিল ?

২. অপুর প্রথম রেল স্টেশন দেখার অনুভূতি বর্ণনা কর।

৩. অপুদের গরুর গাড়ি করে যাত্রা বর্ণনা কর।

৪. অপু কিভাবে স্টেশনে রাত কাটায় ? কখন কি ভাবে সে গাড়িতে চড়ে ছিল ?

৫. নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে যেতে অপুর কি কি চিন্তা জেগেছিল ?

প্রশ্নাবলী

১.

১. হরিহর রায় কোন গ্রামে বাস করতেন ? গ্রামের কোন দিকে তার বাড়ি ছিল ? তার সংসার কিভাবে চলত ?
২. ইন্দির ঠাকুরাণী কে ? তার পূর্ব-ইতিহাস সংক্ষেপে বল।
৩. দু-একটি ঘটনা বর্ণনা করে খুকীর সঙ্গে ইন্দির ঠাকুরাণীর আন্তরিক সম্পর্কের পরিচয় দাও।
৪. হরিহর রায়ের প্রথম জীবনের কাহিনী বর্ণনা কর।

২.

১. ভাই-এর জন্মের সংবাদ খুকী কিভাবে পেয়েছিল ? সেই সংবাদ পেয়ে খুকীর মনের ভাব কেমন হয়েছিল তা নিজের ভাষার বল।
২. কিভাবে এবং কি উপলক্ষ্যে ইন্দির ঠাকুরাণী আবার হরিহরের সংসারে ফিরে আসেন ? খুকী সম্পর্কে হরি পালিতের বৌ কি বলেছিল ?
৩. দশমাসের খোকার কীর্ত্তিগুলি বর্ণনা কর।
৪. ছোট্ট খোকাকে নিয়ে সর্বজয়ার আনন্দ, আশঙ্কা ও বিব্রত হওয়ার বর্ণনা দাও।

৩.

১. ইন্দির ঠাকুরাণীর শেষ গৃহত্যাগের কারণ বর্ণনা কর। তাকে কে বাধা দিয়েছিল ? সর্বজয়া কি বলেছিল ?
২. ইন্দির ঠাকুরাণীর মৃত্যু দৃশ্য বর্ণনা কর।

৪.

১. নীলকণ্ঠ পাখি দেখতে খোকা কোথায় গেছিল ? সেদিন সে কি কি বিস্ময়ের বস্তু দেখেছিল ?
২. নবীন পালিত মাছ সম্পর্কে যে গল্প বলেন, তা নিজের ভাষায় বল এবং তোমার বুদ্ধিমত শেষ কর।
৩. অপুর যাবতীয় সম্পত্তি কিসে থাকত ? তার সম্পত্তির বিবরণ দাও।
৪. দুর্গা ও অপুর আম কুড়ানোর গল্পটি নিজের ভাষায় বল।
৫. রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী অপুর মনে কি স্বর তুলত ?

৫.

১. অসুস্থতার পর অপু কিভাবে প্রথম অন্ন পথ্য করল ?
২. সকাল-দুপুর দুর্গা কি করে বেড়াত ? এ ব্যাপারে তার মা তাকে কেমন বকাঝকা করত, তা কোন একদিনের ঘটনা বলে বোঝাও।

৬.

১. ঝড়ের বিকালে ভুবন মুখুজ্জেদের বাড়ির বাগানে অপু-দুর্গার আম কুড়ানোর ঘটনাটা বর্ণনা কর।

২. আম-কুড়াতে গিয়ে অপু-দুর্গা কেমন করে দুর্বিপাকে পড়েছিল ? বাড়ি ফিরে সেদিন কি ঘটল ?

৭.

১. অপুর প্রথম দিনের পাঠাশালা যাত্রার কথা বল।

২. অপুর পাঠশালা কখন কোথায় বসত ? তার সঙ্গীসাথীদের বর্ণনা দাও।

৩. দিনু পালিত ও রাজকৃষ্ণ সান্যালের পরিচয় দাও। তাদের কথা অপুর মনে কি প্রতিক্রিয়া তুলত ?

৪. 'একদিন পাঠশালায় এমন একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহা তাহার জীবনের একটি নতুন অভিজ্ঞতা।'—ঘটনাটি কি ? ও অভিজ্ঞতাটি বর্ণনা কর।

৮.

১ আতুরী বুড়ি কে ? তার সম্পর্কে প্রচলিত গল্পটি কি ? অপু কবে কিভাবে তার সাক্ষাৎ পায় ? কিভাবে পালিয়ে এসেছিল ?

২ 'আমি আসবো না তোমাদের বাড়ি, কখ্খনো আসব না', কে কাকে কখন বলেছিল ? তারপর কি হ'ল ?

৯.

১. অপুর বাইরে যাবার দৌড় কতদূর পর্যন্ত ছিল ? কোন বার কি উপলক্ষ্যে সে এই সীমা অতিক্রম করেছিল ? এই দিনের আগে তার মনের অবস্থা কেমন ছিল ?

২. অপুর রেল লাইন দেখার অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

৩. লক্ষ্মণ মহাজনের ছোট ভাই এর বৌ-এর সঙ্গে কিভাবে অপুর পরিচয় হল ? তাদের বাড়িতে অপুর কি কি অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তার বর্ণনা দাও।

৪. অমলাদের সঙ্গে কিভাবে অপুর পরিচয় হ'ল ? কিভাবে অমলা অপুর মন জুড়ে বসল ? কেন অমলার প্রতি অভিমান নিয়ে সে ফিরে এল ?

৫. স্বরূপ চক্রবর্ত্তী কোথায় কার দেখা পেয়েছিলেন ? তিনি কি বলেছিলেন ? অপু এ সম্পর্কে কি ভাবত ?

১০.

১. বাঁকা কঞ্চি নিয়ে অপুর কল্পনার বর্ণনা কর। কঞ্চি সংক্রান্ত ঘটনাটা বল।

২ কঞ্চির কথা কাউকে বলতে নিষেধ কেন করত অপু ? এর মধ্যে তার মনের কি কি পরিচয় পাওয়া যায়।

১১.

১. অপু কেন শকুনের ডিম সংগ্রহ করতে চাইছিল ? কেমন করে সেই ডিম সংগ্রহ হয়েছিল ? তার পরিণতি কি হয় ?

২. 'সর্ব-দর্শন সংগ্রহ' অপু কোথা থেকে পেয়েছিল ? এ দর্শন তাকে যে ঘটনায় টেনে নিয়ে গেছিল, তা বর্ণনা কর।

অভিধানিকা

১.

উত্তর প্রান্তে—উত্তর সীমায়।

ক্রমশূন্যায়মান—ক্রমে যা শূন্য হয়ে যাচ্ছে, যা খালি হয়ে আসছে।

কালেভদ্রে—কখনও সখনও, এক আধবার ; প্রায় নয়।

নববিবাহিতা পত্নী—নতুন বিয়ে করা বৌ।

বে-মেরামতি—যা সারান হয় না।

পেঁটিরা—বেতের বোনা বাক্স জাতীয় জিনিস।

পুনরাবৃত্তি—আবার বলা।

ধৈর্য্যশীল—ধৈর্য্যওয়ালা, যে তাড়াহুড়ো করে না।

প্রতীক্ষা—অপেক্ষা।

পাদপূরণ—শূন্যস্থান পূরণ করা।

২.

অপটু—উপযুক্ত নয়।

মন্দ সন্দ—অল্প অল্প।

কত সন্ধ্যাদিন—কত সন্ধ্যা, কত দিন।

পাড়ার লোক ভাঙ্গিয়া আসে—যেন পাড়ার বসতি তুলে দিয়ে সব লোক চলে আসে।

দিনমানে—দিনের বেলা।

আর-জন্মে—পূর্বজন্মে, আগেকার জন্মে।

কাঠরা—কাঠ দিয়ে ঘেরা জায়গা।

ফৌজদারী—খুন-জখম, মারপিট ইত্যাদি সংক্রান্ত।

দুর্বোধ্য ভাষায়—আসলে খোকা ভাষাই শেখেনি।

শেয়ালে নিয়ে গেল—আগে বাঙলাদেশে দরিদ্র বাড়ির বহু ছেলেমেয়েকেই শেয়ালে নিয়ে যেত।

রিক্ত হাতে—খালি হাতে। বদলে কিছু না দিয়ে।

৩.

অমায়িক ভাব—বিনয়ীভাব।

অপর্যাপ্ত—খুব কম। কিন্তু এখানে অর্থ প্রচুর। পর্যাপ্তের চেয়েও বেশি।

চতুর্গুণ—চারগুণ।

অকল্যাণ—অমঙ্গল। দুপুরবেলা না খেয়ে গেলে গৃহস্থের অমঙ্গল হয় বলে অনেকের মত সর্বজয়ার বিশ্বাস।

কুচক্কুরে—কুচক্র গড়বার মত কুটিল মন। কুচুটে।

ভির্‌মি লেগেছে—অজ্ঞান হয়ে গেছে।

ফ্যাল ফ্যাল করিয়া—অর্থহীন দৃষ্টিতে।

অবসান—শেষ, সমাপ্ত।

৪.

জমা দেওয়া—অর্থের বিনিময়ে শুধু চাষ ও ফসল ভোগ করবার অধিকার দেওয়া।

অবাধগতি—যে যেখানে সেখানে খুশিমত যাতায়াত করে।

মুক্তপ্রাণ—সে সাংসারিক লাভের তোয়াক্কা রাখে না।

মৎস্য শিকারের—মাছ ধরার।

অনেককেলে—অনেক দিনের।

গহিন জল—গভীর জল।

মুক্ত হাতে ছড়ান—কোন হিসাব বা বিচার না করে ছিটিয়ে দেওয়া।

কার্পণ্য—কৃপণতা, কিপ্টেমি।

নিকটবর্ত্তী—কাছাকাছির।

লুব্ধদৃষ্টিতে—লোভীর মত চোখে।

নিবৃত্ত—নিরস্ত, থামতে হল।

কুপথ্যের জিনিস—যা খাওয়া উচিত নয় তা।

কষ্টসাধ্য—কষ্টকর।

সমুদয়—সমস্ত।

অব্যর্থ—যা ব্যর্থ হয় না।

বিগত কৌতূহল—যার সম্পর্কে কৌতূহল শেষ হয়েছে।

সতর্কতা মিশ্রিত—কেউ যেন না জেনে ফেলে সেজন্য সজাগ ও সাবধানী ভঙ্গিতে।

জরাবো—শব্দটা সম্ভবতঃ জারাব। অর্থ, কোন উপকরণ দিয়ে কোন কিছু মজিয়ে নেওয়া। নুন তেল দিলে আম তাই হয়। নুন তেল আমের জারে জরিয়েও নেওয়া হয়। সেই সূত্রে 'জরানো' শব্দটাই চালু।

হাবা ছেলে—বোকা ছেলে। চালাক চতুর নয়।

পিত্রালয়ে—বাপের বাড়িতে।

জঙ্গলাবৃত্ত—জঙ্গলে ঢাকা।

গোগ্রাসে—গরুর মত গ্রাসে, অর্থাৎ তাড়াতাড়ি। গরু প্রথমবারে না-চিবিয়েই কোনক্রমে গিলে ফেলে, পরে রোমন্থন করে।

সচেতনতা-সূচক—সে যে জানে, তা বুঝবার মত।

আসান—মুক্তি, অব্যাহতি, সাশ্রয়।

অর্ধ-পথেই—মাঝ পথেই।

দণ্ডবৎ—প্রণাম করা।

নিরুৎসাহভাবে—উৎসাহহীন অবস্থায়।

কাশীদাসী—কাশীরাম দাস রচিত।

৫.

ঘরকন্নার—গৃহস্থালীর।

কানে নাও—শোন এবং মান।

ছিষ্টির কাজ—সমস্ত কাজ।

ফরমাজ—আদেশ, নির্দ্দেশ।

সবুর—অপেক্ষা।

নখদর্পণে—প্রত্যক্ষ, চোখের সামনে ভাসছে।

সরঞ্জাম—জিনিসপত্র।

উদ্ধার কর—এখানে 'অব্যাহতি দেওয়া' বোঝাচ্ছে।

ছিরি—শ্রী।

৬.

অনুপাতে—পরিমাণ মত।

মন মরা—উৎসাহ-হীন।

বৃহত্তর—আরও বড়।

কৃত্রিম—মেকি, ছদ্ম।

শাপে বর—খারাপ হতে গিয়ে ভাল হওয়া।

হিংসুক—হিংসুটে।

ভরসা হারা—অসহায়।

অনবরত—অবিরাম, একটানা।

দুর্ভেদ্য—যা ভেদ করা যায় না এমন।

ঘনায়মান—ঘনিয়ে আসা।

নিবিড় কৃষ্ণ—গাঢ় কাল।

আওতায়—প্রভাবে, এখানে ছায়ায়।

নাছোড়বান্দা—যে ছেড়ে দেবার পাত্র নয়।

মুষলধারে—যখন বৃষ্টির ফোঁটাগুলো মস্ত বড়—যেন মুষলের মত।

মগডালে—সবচেয়ে উঁচু ডালে।

ঝটিকাবিক্ষুব্ধ—ঝড়ে আলোড়িত।

ব্যাঙডাকানি জল—যেমন জল হলে ব্যাঙ ডাকে। অর্থাৎ প্রচুর বৃষ্টি।

আপাদমস্তক—মাথা থেকে পা পর্যন্ত।

হস্তস্থিত—হাতে থাকা।

৭.

উপকরণ-বাহুল্য—বেশি উপকরণ।

বেপরোয়া—পরোয়া না করে।

সদ্যনিদ্রোত্থিত—সবে ঘুম থেকে ওঠা।

পুনরায়—আবার।

অদৃশ্য হইয়া গেল—আর দেখা গেল না।

সৈন্ধব লবণ—পাহাড়ী লবণ।

বিক্রয়রত—বিক্রি করতে ব্যস্ত।

নাট্যশালা—থিয়েটার হল।

আনীত—নিয়ে আসা।

দাশুরায়—দাশরথি রায়, বিখ্যাত কবিয়াল।

দেশভ্রমণ-বাতিকগ্রস্ত—দেশ-ভ্রমণের অভ্যাস আছে।

সর্বস্বান্ত—সর্বস্ব অস্ত ; সব শেষ।

প্রত্যাগমন—ফিরে আসা।

দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা—আকালের দিনে খিধে থাকে বেশি।

সুখ-স্পর্শ—ছুঁলে আরাম লাগে।

শ্রুতিলিখন—শুনে শুনে লেখা।

শব্দ-সঙ্গীত—শব্দে গঠিত সঙ্গীত।

কুহেলি-ঘেরা—কুয়াশাময়।

শিখরদেশ—চূড়া।

সঞ্চারমান—যা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

৮.

সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে—শেষ হয়েছে।
দেবেনি—দেব খন।
কুহকে—মোহে, আকর্ষণে।
দৃষ্টি-নিবদ্ধ—চোখ আটকান।
আড়ষ্টকণ্ঠে—ভয় মিশ্রিত গলায়।
দিশাহারা—দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্যের মত।
ক্রুদ্ধদৃষ্টি—রেগে যাওয়া চোখের চাহনি।
অত্যধিক—খুব বেশী।
আর্তরব—ভীত স্বর।
স্তূপাকার—স্তূপের আকারে জড়ো করা।
নির্গম পথ—বেরুবার পথ।
নির্বাক—রুদ্ধবাক, চুপ।
তাসের ঘর—দেখতে সুন্দর কিন্তু যা সহজেই ভেঙ্গে যায়।
ভূমিসাৎ—ধূলোসই, ভেঙে পড়া।
মেঘান্ধকার—মেঘে ঘনিয়ে আসা অন্ধকার।
সংগৃহীত—সংগ্রহ করা।
অদেষ্টে—অদৃষ্টে, ভাগ্যে।
আত্মহারা—নিজেকে ভুলে, ভালমন্দ বিবেচনা না করে।
প্রতিহিংসার আনন্দে—প্রতিহিংসা গ্রহণ করে কেউ যেমন আনন্দ পায়।
খোসামোদ—সাধাসাধি।
আত্মসম্মান জ্ঞানশূন্য—নিজের প্রতি সম্মানজ্ঞানহীন।

৯.

বনরেখা—সবুজবনের রেখা।
বিশ্বগ্রাসী—বিশ্বকে গ্রাস করবার মত।
নবীনতা—নতুনত্ব।
চক্রবালে—গোল দিগন্তরেখায়।
বর্ণচ্ছটা—বর্ণের ছটা।
গন্তব্যস্থান—পৌঁছবার জায়গা।
অবস্থাপন্ন—ধনী।
জারিজুরি—শক্তি-সামর্থ্য।
সংকুচিত—নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া।
বটঠাকুর—ভাসুর।
লাজুকতা—লজ্জার ভাব।

রক্তারক্তি—রক্তে মাখামাখি।
ত্রিসীমানায়—কাছাকাছি।
স্বপ্ন-কামনার—স্বপ্ন ও কামনার।
লুব্ধ—লোভী, লোভাতুর।
সদ্যতৈয়ারী—সবে তৈরী হয়েছে এমন।
অপ্রত্যাশিত—আশার বাইরের।
বিস্তর—অনেক।
গুপ্ত—গোপন।
সর্বোচ্চ—সবচেয়ে উঁচু।
দোদুল্যমান—দুলে বেড়াচ্ছে এমন।
অপারগ—অক্ষম, ব্যর্থ।
গর্বদৃপ্ত—গর্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে যে।
মৃত্যুপাণ্ডুর—মৃত্যু ঘনিয়ে আসায় বিবর্ণ।
আর্দ্র—ভিজে।
অফুরন্ত—যা শেষ হয় না।
বর্ষা সতেজ—বর্ষা পেয়ে তেজময়।
প্রান্তবর্তী—কিনারায়।
দস্তুরমত—রীতিমত।
গৃহ-বিবাগী—গৃহের প্রতি মন নেই যার।
আজন্মসাথী—জন্ম থেকে সাথী যে।
বহুরূপী—নানারূপ যার, যে বারবার রূপ বদল করে।
অক্ষয়—যা ক্ষয় হয় না।
কবচকুণ্ডল—যা রক্ষা করে।
সিঞ্চন—জল আনা বা ছিটান
কুসুমিত—ফুলে ভরা।
মৃগয়া—শিকারযাত্রা।
বীরাঙ্গনা কাব্য—মাইকেল মধুসূদন দত্তের লেখা। বাঙলা সাহিত্যের একমাত্র পত্র-কাব্য।
ভগ্নউরু—যার উরু ভেঙ্গে গেছে।
অনাবিষ্কৃত—যা আবিষ্কার করা হয় নি।
প্রবর্ধমান—যা ক্রমেই বেড়ে উঠছে।
অজ্ঞাতনামা—নাম-না-জানা।
দপ্তর—পুঁথিপত্রের ভাণ্ডার।
শুভঙ্করী আর্যা—শুভঙ্কর রচিত ছড়া। ঐ ছড়া আসলে মুখে মুখে কঠিন অঙ্ক কষবার নিয়ম।

অপ্রত্যাশিত—যা আশা করা হয় নি।
জালবুনানি—জালের মত বুনে তোলা, আলো আঁধারিতে ভরা।
বিপন্নমুখে—ভয় ও বিড়ম্বনাভরা মুখে।
শিশিরার্দ্র—শিশিরে ভেজা।
বেণুবনশীর্ষে—বাঁশগাছের মাথায়।
বিস্মৃতা—ভুলে যাওয়া।
পুলিনাশালিনী—গাছে ভরা তীর সম্পন্ন।
নিশুতি—গভীর রাতের নির্জনতা।

১০.

শিহরিয়া—কেঁপে।
পরিপূর্ণতা—নিটোলতা, সম্পূর্ণতা, অখণ্ডতা।
পারতপক্ষে—সাধ্যমত।
জনসমাগমপূর্ণ—লোক যাতায়াতে ভরা।
জনহীন—নির্জন।

১১.

তেপান্তর—আসল শব্দটা ত্রি-প্রান্তর। বোঝায় বহু বিস্তৃত বিশাল মাঠ। রূপকথায় ব্যবহৃত।
অনুপস্থিতিতে—না থাকার সময়।
বিন্দুবিসর্গও—একটু।
বিবর্ণ—রং জলে যাওয়া।
ঊর্ধ্বশ্বাসে—দ্রুতবেগে।
শূন্যমার্গে—আকাশপথে।
পারিশ্রমিক—মজুরি।
সাংসারিক বিষয়ে—বাস্তববোধে।
হুঁশিয়ার—সাবধানী।

১২.

বাবাজি—বৈষ্ণব সন্তদের বাবাজি বলা হ'ত।
গৌরবর্ণ—ফর্সা রং।
দিব্যকান্তি—সুন্দর চেহারা, দেবতার মত গড়ন।
সদানন্দ—সর্বদাই যিনি আনন্দিত থাকেন।
মুখচোরা—লাজুক।
শান্তদর্শন—দেখতে শান্ত।
নিঃসংকোচে—সংকোচশূন্য অবস্থায়, কোন বাধা বোধ না করে।
স্বজাতীয়—নিজের জাতের।
বয়োবৃদ্ধতার—বেশি বয়সের জন্য।
সতীর্থ—সহপাঠী, এখানে সমবয়সী।
প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা—একখানি বৈষ্ণব তত্ত্ব গ্রন্থ।
অনাড়ম্বর—কোন রকম বাড়াবাড়ি নেই, সহজ।
অন্তঃসলিলা—ফল্গুনদী। যার ওপরে কিছু দেখা যায় না, তলায় জল বয়ে যায় যার।
সহচর্যের—সঙ্গের।
জঙ্গলাকীর্ণ—জঙ্গলে ভরা।
সংকুচিতভাবে—নিজেদের গুটিয়ে রেখে।
লাভজনক—লাভের মত।
দ্বিধামিশ্রিত—দুরকম ভাব জড়ান। হ্যাঁ-না মেশান।
বিসর্পিত—আঁকা-বাঁকা।
তুষারমৌলি—বরফে ঢাকা।
গিরিসঙ্কট—দুই পাহাড়ের মাঝের খাদ।
সংগ্রহীত—জোগাড় করা।
পুনর্বার—আবার।
বামালসুদ্ধ—চোরাই জিনিসশুদ্ধ।

১৩.

গোষ্ঠবিহার—শ্রীকৃষ্ণ গোদল এবং সঙ্গীদের নিয়ে মাঠে গেছেন গরু চরাতেন—একেই বলে গোষ্ঠ বিহার।
ঘনীভূত—ঘনিয়ে আসা।
উত্তীর্ণ হইয়া গেল—পার হয়ে গেল।
স্নানাহার—স্নান ও আহার।
বন্যাস্রোত—বন্যার জলের ধারা।
অভূতপূর্ব—যা আগে ঘটেনি।
আনুপূর্বিক—আগাগোড়া।
তর্কলঙ্কার—তর্কালঙ্কার, সংস্কৃত জানা পণ্ডিতের উপাধি।

১৪.

রাজ্যচ্যুত—রাজ্যহারা।
হাতিয়ারবন্ধ—অস্ত্র-শস্ত্র সহ।
রথযাত্রার ভিড়—রথযাত্রার যেমন ভীড় হয়, তেমন ভীড়।
যাত্রার একটো—যাত্রার এ্যাক্টিং (acting); যাত্রার অভিনয়।

বাহাদুরী লইবে—প্রশংসা নেবে।
উচ্ছ্বসিত—উছলে ওঠা ভাব।
আশ্বাস—আশা মিশ্রিত সান্ত্বনা।
সাধ্য সাধনা—সাধাসাধি।
জন্মাবধি—জন্ম থেকে।
নিরস্ত—থামান।

১৫.

সুখ্যাতি—প্রশংসা।
কুয়াসাচ্ছন্ন—কুয়াসায় ঢাকা।
বাস্তবতার—কল্পনাশূন্যতার।
দুগ্ধবতী—দুধ দেয় যে।
পূর্বলক্ষণ—আগেকার ইঙ্গিত।
শিকেয় উঠল— বন্ধ হয়ে গেল।
অপ্রতিভ—অপ্রস্তুত, হতবুদ্ধি, একই সঙ্গে বিব্রত ও লজ্জিত।
পুনর্জীবন প্রাপ্তি—আবার জীবন ফিরে পাওয়া।
স্তিমিতদীপ—মিটমিটে আলোর প্রদীপ।
ময়ূর নিনাদিত—ময়ূরের ডাকে ভরা।
যামিনী—রাত্রি, যাম-ময়ী।
অজ্ঞাতসারে—অজান্তে।
সঞ্চরণশীল—যা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

১৬.

ফুল-কাঁসা—সম্পূর্ণ কাঁসা, নিখাদ কাঁসা।
ঘনীভূত বর্ষা—গাঢ় বর্ষা।
দেবাসুরের—দেবতা ও অসুরদের।
মহা সংগ্রাম—প্রবল যুদ্ধ।
অবিশ্রান্ত—অবিরাম, অক্লান্ত।
বরোজ—যেখানে পানের চাষ হয়।
গর্জমান—গর্জন করে চলেছে যে।
সন্তর্পণে—সাবধানে।
ন্যাতা—খুবই নরম, জলভেজা মেঝে মোছা কাপড়ের মত।
বিস্রস্ত—এলোমেলো।
দলিত—পায়ে মাড়ান।
পিষ্ট—চটকান।
আতান্তরে—দুরবস্থায়।

গৃহকার্যে—বাড়ির কাজে।
রৌদ্রালোকিত—সূর্যের কিরণে উজ্জ্বল।
গতানুগতিক—প্রচলিত ধারার অনুবর্তী, একঘেয়ে।

১৭.

কষ্ট-স্বীকারের পর—কষ্টকর অবস্থা কাটাবার পর।
মনিব—মালিক।
অনবরত—অবিরাম।
কোম্পানীর কাগজে—কোন কোম্পানীর শেয়ারে লগ্নী করা টাকার সার্টিফিকেটে।
ব্যবধান—পার্থক্য।
বলিষ্ঠ—বলবান।
অধিকাংশ—বেশিরভাগ।
নৈয়ায়িক—ন্যায়বিষয়ক।
বাউণ্ডারী—সীমারেখা।
জিওগ্রাফি—ভূগোল।
ডেসিম্যাল ফ্রেকশন—দশমিক ভগ্নাংশ।
অদম্য—যা দমন করা যায় না।
অপ্রশমনীয়—যা প্রশমন করা যায় না, কমান যায় না।
সঙ্গতির—সংস্থানের।
'বঙ্গবাসী'—সেকালের একটি বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা।
সন্তোষজনক—সন্তুষ্ট হবার মত।
ইতস্ততঃ—এদিক ওদিক।
চৌকি—পাহারা।
লুব্ধচিত্তে—লোভী মনে।
রুদ্ধনিশ্বাসে—দম বন্ধ করে।
প্রেক্ষাপটে—প্রদর্শনপট, Scene.
রাজবারার—রাজস্থানের।
আহেরিয়া-উৎসব—নববর্ষ উৎসব।
বন্যসৌন্দর্য—বুনো সুদৃশ্যতা।
অবতরণশীল—যে নেমে আসছে।
বিশ্রামশূন্যা—যে নারীর বিশ্রাম নেই।
অলক্তরক্ত—অলতায় রাঙা।
অপ্রতিভের—অপ্রস্তুত।

সন্দিহান—সন্দেহযুক্ত।
অর্ধসমাপ্ত—অর্দ্ধেক লেখা শেষ।

১৮.

অত্যন্ত—খুব।
অভ্র-আবীর—ঝকমকে লাল।
নিবাত—বাতাসশূন্য।
নিষ্কম্প—স্থির।
তুষার-ঝটিক—বরফের ঝড়ে।
অরাজকতা—নিয়মশৃঙ্খলাশূন্যতা।
রক্ষাকর্ত্রী—যে নারী রক্ষা করছেন।
উৎসাহদাত্রী—যে উৎসাহ দিচ্ছে।
নবতেজোদৃপ্ত—নতুন শক্তিতে বলীয়ান।
অজ্ঞানান্ধ—অজ্ঞানতা দ্বারা অন্ধ।
যদৃচ্ছবিচরণশীল—যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াচ্ছে যে মেঘের দল।
দিব্যভাবময়ী—অলৌকিক ভাবে ভরা।
আবশ্যক—প্রয়োজনীয়।
ঈশানকোণ—উত্তরপূর্ব কোণ।
মনমাতানো—মনমেতে ওঠে যাতে।
আহরণরত—সংগ্রহ করছে যারা।
ভবিষ্যজীবন—ভাবী জীবন।

১৯.

মরুব্বিরা—মাতব্বরের, বয়স্করা।
নিবৃত্ত—নিরস্ত।
ফুটকাটা—বরশি ফেলবার জন্য জায়গা পরিস্কার করা।
অসন্ন বিরহের—ঘনিয়ে আসা বিচ্ছেদের
দূরপ্রসারী—বহুদূর ছড়ান।
পথিপার্শ্বে—পথের পাশে।
আরোহী—যাত্রী। আরোহণ করেছে যে।
দ্রাক্ষাকুঞ্জবেষ্টিত—আঙ্গুর কুঞ্জে ভরা।
রোগশয্যাগত—অসুস্থ অবস্থায় বিছানায় শোয়া।



বিভূতিভূষনের এই অসামান্য রচনার ছোটদের সংস্করণটিকে সত্যিকারের ছোটদের মনের মতো সাজিয়ে প্রকাশ করার পরিকল্পনায় আমরা আহ্বান করেছিলাম একটি প্রতিযোগিতা। প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি সাড়া দিয়ে আমাদের অভিভূত করে দেয় শিশু ও কিশোর শিল্পীরা। তাদের পাঠানো সমস্ত ছবি থেকে নির্বাচিত ছবি নিয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করি আমরা। প্রদর্শিত সেই সব ছবি থেকে বাছাই করে সাজানো হলো এই নতুন সংস্করণটিকে। বাংলা গ্রন্থপ্রকাশনার জগতে এটি একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। ছোটদের হাতে ছোটদের নিজেদের আঁকা ছবিতে সাজানো এই বইটি তুলে দিতে পেরে প্রকাশক হিসেবে আমরা আনন্দিত।